জনমত
৯৭ তম বর্ষ ১৪২৮
DELHI
JAIPUR
INDIA
MUMBAI
HYDERABAD
BANGALORE
শারদ অর্ঘ্য

স্বর্গীয় জ্যোতীশচন্দ্র সান্যাল প্রতিষ্ঠিত

জনমত

প্রতিষ্ঠাকাল ১৯২৪ বাংলা ১৩৩১

শারদ অর্ঘ্য ১৪২৮

মূল্য ঃ একশত টাকা মাত্র

৯৭ বৎসরের উত্তরবঙ্গের প্রাচীনতম
বাংলা সাপ্তাহিক জনমত পত্রিকা ও শারদ সংখ্যায়
যারা একসময় সম্পাদক ছিলেন —

*জ্যোতীশচন্দ্র সান্যাল (আইনজীবি)
*সত্যেন্দ্রনাথ মৌলিক (আইনজীবি)
*কুমুদিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী (আইনজীবি)
*ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল (চিকিৎসক)
*মুকুলেশ চন্দ্র সান্যাল (সাংবাদিক)
শ্রী সুধীর কুমার ভট্টাচার্য্য (সাংবাদিক)

প্রধান সম্পাদক এবং পত্রিকার সত্ত্বাধিকারী
শ্রী তপেশ সান্যাল

সম্পাদক
শ্রী রামঅবতার শর্মা

প্রকাশনা ও মুদ্রণে ঃ
রমা সান্যাল,
জলপাইগুড়ি বীণা প্রিন্টিং ওয়ার্কর্স লিঃ
জলপাইগুড়ি, ফোন- ২৩০২৫০

মুদ্রণ সহযোগিতায় ঃ
অলিভ অফ্‌সেট,
ভাটিয়া বিল্ডিং, জলপাইগুড়ি, ৯৩৪৩৩১১৩৪৪

সম্পাদকীয় –

"অসির থেকে মসি বড়। (Pen is mightier than Sword)" মসি শুকিয়ে ছিপি বন্ধ। ৫০০ দিন অতিক্রান্ত, শিক্ষাঙ্গন বন্ধ। কিন্তু অসি ঝলছে উঠছে রাজ্যের সর্বত্র। চারিদিকে অশান্তি অনিশ্চয়তা জীবন-জীবিকার চরম সংকট। এ এক ঘোরতর দুঃসময়।

দুঃসময় বয়ে এনেছে করোণা অতিমারী। কত মানুষ চলে গেল না ফেরার দেশে। করোণা প্রতিরোধে নানা বিধি-নিষেধ – লকডাউন, নৈশ কারফু। তার জন্য শিক্ষাঙ্গন বন্ধ। সরস্বতীর বন্দনা বন্ধ। কিন্তু আনলক সুরা, লাগামহীন অসির ঝলকানী। তাও ভালো কোভিড আবহের মধ্যে রাজ্যে কোটি কোটি মা, দিদি, বোনেরা লক্ষ্মীর ভান্ডারের আবেদন করতে দুয়ারে সরকারের শিবিরে বাঁধ ভাঙ্গা ঢেউয়ের মত ঝাপিয়ে পড়েছে। তার মধ্যে নির্বাচন, উপনির্বাচন।

এই আবহে মা আসছেন। দশভুজা মার আবির্ভাব মর্ত্তলোকে নেমে আসবে আনন্দ। মা আসছে বায়ে লক্ষ্মী, ডানে সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ সব সন্তান নিয়ে। সিংহ বাহিনী মা, অসুর দলনী মা সব অশুভ শক্তিকে পরাভুত করবেই।

লক্ষ্মী লাভ হবে বাংলার মায়েদের বোনেদের। মা সরস্বতীও নিশ্চয়ই মুখ তুলে চাইবে ভক্ত কূলের দিকে। তা না হলে 'মসি' কে বাঁচাবে কে?

এবারে শারদীয়ার একান্ত প্রার্থনা মাগো জাগাও 'মসি'র প্লাবণ, ভেসে যাক্ দুর্বৃত্তের 'অসি'। শান্ত হোক মর্ত ভূমি। সাবেকী রূপের মাগো দশপ্রহরণ ধারিণী "ফিরিয়ে দাও সেই সাবেকী জমানা করোণা মুক্তি, সন্ত্রাস হানাহানি মুক্ত শান্ত স্নিগ্ধ মর্ত্তভূমি। যেখানে মা সরস্বতীর বীণার ঝংকার 'মসি'র জয়ধ্বনী প্লাবিত করবে আকাশ বাতাস।

"ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়" বঙ্গভূমি আবার উঠুক জেগে। হে মাতা 'বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন এক হউক এক হউক।' দূর হোক যত হানাহানি, অশুভ সন্ত্রাস। কলকল্ললিত হয়ে উঠুক শিক্ষাঙ্গণ, গ্রন্থাগার। প্রমাণিত হোক অসির চেয়ে 'মসি'ই বড়। এই আশীষ কর মাগো। এটাই মানবের প্রার্থনা, মর্তলোকের আবেদন, দূর্গতিনাশিনী মায়ের কাছে জনমত পরিবারের করজোড়ে সেই আকুতি।

—: সূচীপত্র :—

প্রবন্ধ–

কাল্পনিক সংলাপ –

কবিতা –

গল্প –

উত্তরবঙ্গে জাতীয় চেতনা বিকাশের প্রেক্ষাপট

আনন্দগোপাল ঘোষ

জাতীয় চেতনার যে জোয়ার আমরা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেখতে পাই, তার জন্ম হয়েছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে। এর অর্থ এই নয় যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলনের পূর্ব পর্বে আমাদের মধ্যে জাতীয় চেতনা ছিল না। জাতীয় চেতনা অবশ্যই ছিল, তবে তা রাজনৈতিক অর্থে ছিল না, আধ্যাত্মিক ও ভৌগোলিক অর্থে ছিল। আসলে ইউরোপের 'নেশন' বা 'জাতি' আমাদের জাতি ভাবনার চেয়ে আলাদা ছিল। এই স্বকীয়তাকে মেনে নিয়েও নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে উপনিবেশিক শাসন পর্বে আমাদের দেশে যে জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটেছিল তার মূলে ছিল পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা। এই পাশ্চাত্য শিক্ষা আজকের উত্তরবঙ্গ কথিত অঞ্চলে কলকাতা ও কলকাতা সন্নিহিত অঞ্চল থেকে অন্ততঃ অর্ধ শতক পরে শুরু হয়েছিল। তার কারণ এই অঞ্চলে ইংরেজ কোম্পানীর শাসন প্রায় এক শতাব্দী পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই জন্য উত্তরবঙ্গ ভূখন্ডে পাশ্চাত্য শিক্ষায়তন ও পাশ্চাত্য জাত নবজাগরণের ঢেউ ও অনেক পরে এসেছিল।

আজকের উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে মালদহ অঞ্চল সর্বাগ্রে ইংরেজ কোম্পানীর শাসনাধীনে ও বাণিজ্যবলয়ে এসেছিল। তাই লক্ষ্য করা যায় যে উত্তরবঙ্গের প্রথম সরকারী বিদ্যালয় মালদহে স্থাপিত হয়েছিল ১৮৫৮ সালে। ঠিক সিপাহী বিদ্রোহের মধ্য পর্বে। দার্জিলিং ইংরেজ কোম্পানীর অধীনে এসেছিল ১৮৩৫ সালে। কিন্তু দার্জিলিং ছিল জনবিরল অঞ্চল। তাই সেখানে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন পড়েনি আদি পর্বে। দার্জিলিঙে মিশনারী সংস্থা সমূহ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তা অনেক পরের কথা। তবে সমতলের উত্তরবঙ্গে মালদহ সরকারী বিদ্যালয়ই প্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষায়তন। এর পরেই দেশীয় রাজ্য কোচবিহারে ১৮৬১ সালে কর্ণেল জেনকিন্সের নামে একটি সরকারী বালক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। এগুলো সবই সরকারী ও বালকদের শিক্ষার বিদ্যালয়। বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল আরও এক দশক পরে। সেটিও স্বাভাবিক ভাবেই প্রথমে মালদহেই স্থাপিত হয়েছিল ১৮৭০ সালে। বার্লো গার্লস স্কুল। এর পরেই জলপাইগুড়িতে ১৮৭১ সালে। এটি অবশ্য প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল বালিকাদের শিক্ষার জন্য। কোচবিহার রাজ্য ১৮৮১ সালে বালিকাদের শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। এটিই পরবর্তীকালে সুনীতি একাডেমী পরিচিত পেয়েছে। এই হচ্ছে বিদ্যালয় শিক্ষার চিত্র। বিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্বে এই অবস্থার অবশ্য পরিবর্তন ঘটেছিল। ১৯০৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের তালিকাটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

দার্জিলিং- ৫, রাজশাহী- ৭, দিনাজপুর- ১, রংপুর- ৭, জলপাইগুড়ি- ১,

পাবনা- ১৯, মালদহ- ৩, কোচবিহার- ৪ মোট = ৪৭

উপরের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ৪৭টি বিদ্যালয়ের মধ্যে বর্তমান উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে পড়েছিল মাত্র ১৩টি। কলকাতা থেকে এমনিতেই উত্তরবঙ্গ সামগ্রিক ভাবে পিছিয়ে ছিল। বর্তমান উত্তরবঙ্গ আরো পিছিয়ে ছিল। আরো অনেক প্রশ্ন এসে যায়। সেটি হলো এই ১৩টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫টি দার্জিলিং এবং ৪টি দেশীয় রাজ্য কোচবিহারে ছিল। অর্থাৎ অবশিষ্ট ৪টি বিদ্যালয় ছিল জলপাইগুড়ি, মালদহ ও দিনাজপুরে। এটি ঠিক যে কোচবিহার দেশীয় রাজ্য ছিল। এ জন্য রাজারা শিক্ষার প্রসারে উৎসাহী ছিলেন। দার্জিলিঙে বিদ্যায়তন বেশী হওয়ার মূলে ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় মিশনারী সংস্থা, ইংরেজ চা-কর ও ইংরেজ প্রশাসকদের ঘনিষ্ঠ ভূমিকা ছিল। এরা নিজেদের স্বার্থেই দার্জিলিঙে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। কারণ ইংরেজদের সপরিবারে বসবাসের পক্ষে দার্জিলিঙের আবহাওয়াই ছিল সবচেয়ে উপযোগী।

এবারে উচ্চশিক্ষার প্রশ্নে আসছি। ১৯০০ সালে সমগ্র উত্তরবঙ্গে ডিগ্রী স্তরের কলেজ ছিল মাত্র দুটি। রাজশাহী গভর্নমেন্ট কলেজ ও কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ। ফাস্ট আর্টস (আই.এ) স্তরের কলেজ ছিল তিনটি - দার্জিলিঙে দুটি ও রংপুরে একটি। আবার দার্জিলিং ও কোচবিহারকে বাদ দিলে দেখা যাবে বর্তমান উত্তরবঙ্গে কোনো কলেজই ছিল না। বিভাগীয় শহর, চা শিল্পপতিদের শহর জলপাইগুড়িতে কলেজ স্থাপিত হয়েছিল ১৯৪২ সালে আর মালদহে ১৯৪৪ সালে। তবে জলপাইগুড়ির অধিকাংশ ছাত্ররা কোচবিহারে ও রাজশাহীতে পড়তে যেতেন। কিছু কলকাতাতে যেতেন। কারণ এখানে সম্পন্ন লোকের সংখ্যা বঙ্গদেশের মফঃস্বলে জেলাগুলি থেকে অনেক বেশী ছিল। অনেকেই হিন্দু কলেজ (প্রেসিডেন্সি কলেজ), সংস্কৃত কলেজ, রিপন কলেজ, পড়াশুনা করেছেন। আবার অনেকে এই সব কলেজে পড়াশুনা করে উত্তরবঙ্গে চাকুরী নিয়ে এসেছিলেন। যেমন মাইকেল মধুসূদন দত্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু গৌর দাস বসাক, হুগলি কলেজের হরচন্দ্র ঘোষ, কিশোরী চাঁদ মিত্র, শ্যামাচরণ সরকার - এরা সব জাতীয় চেতনার বীজও সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। সামগ্রীক ভাবে উচ্চশিক্ষা দেরীতে হওয়ার জন্য জাতীয় চেতনার প্রক্রিয়াও পরে শুরু হয়েছিল। তবে কলকাতার সমাজ জীবনে যে প্রশ্নগুলি নিয়ে বিতর্ক ও ঝড়ের সূত্রপাত ঘটেছিল, সেগুলির আঁচ কিন্তু উত্তরবঙ্গেও লেগেছিল একই সময়ে। অর্থাৎ সমাজ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ পিছিয়ে ছিল, তা কিন্তু বলতে পারছি না। যেমন সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ, সহবাস সম্মতি আইন প্রস্তাব প্রভৃতির পক্ষে ও বিপক্ষে এখানেও তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক শিক্ষিত সমাজ এই সব জটিল ও স্পর্শকাতর সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন। আবার এই শিক্ষিত সমাজেরই একটি অংশ এই সামাজিক প্রথাগুলির স্বপক্ষে প্রচারে নেমেছিলেন। দূরের বঙ্গ উত্তরবঙ্গেও পাশ্চাত্য শিক্ষিত

সমাজে ও বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। সেদিনের সেই আলোড়ন অনুভবের, বিতর্কের নয়। আমরা এই প্রসঙ্গে দুএকটি কথা নিবেদন করছি।

উনিশ শতকরে সমাজ সংস্কার আন্দোলনগুলির মধ্যে যে বিষয়টি বেশী বিতর্কের ঝড় তুলেছিল তাহলো সতীদাহ প্রথা। এই অমানবিক প্রথাটি বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল কলকাতা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলগুলির হুগলি, বর্ধমান, হাওড়া। মূলতঃ এই অমানবিক প্রথাটি বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল কলকাতা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলগুলির হুগলি, বর্ধমান, হাওড়া। মূলতঃ এটিই বর্ণ বিভাজিত হিন্দু সমাজের বর্ণাভিমানীদের মূল ভূখন্ড ছিল। উনিশ শতকের কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত এই কুপ্রথার কথা মনে রেখেই রচনা করেছিলেন :

শতেক বিধবা হয় / একের মরণ

উত্তরবঙ্গ কথিত অঞ্চল মূলতঃ অবর্ণ হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল। তাই এখানে সতীদাহ প্রথা ছিল একেবারেই সীমিত আকারে। মোটে তিনটি সতীদাহের খবর পেয়েছি আমরা। একটি কোচবিহার রাজপরিবারের, একটি দিনাজপুরে রাজ পরিবারের এবং একটি দিনাজপুরের অবর্ণ হিন্দু পরিবারের। অন্যদিকে বহুবিবাহ সমস্যাটিও ছিল পুরোপুরিভাবে বর্ণহিন্দুদের বিশেষ ভাবে কুলীনদের মধ্যে। বি-বর্ণ হিন্দুদের মধ্যেও মুসলমানদের মধ্যে একাধিক বিবাহের প্রচলন ছিল। তবে তা কুলীন বর্ণহিন্দুদের চেয়ে অনেক অনেক কম। যেমন উনিশ শতকের কুলীন বর্ণ হিন্দু চল্লিশ পঞ্চাশটি বিবাহও করেছেন। এদের সংখ্যা কম হলেও এই প্রথা সমাজে নিন্দিত ছিল না। বহু বিবাহ বিরোধী আন্দোলনের মুখ্য স্থপতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গর্ভনর জেনারেল লর্ড ডালহৌসিকে যে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন তাতে ২১৩০০ জন স্বাক্ষর করেছিলেন। এতে উত্তরবঙ্গের কেউ স্বাক্ষর করেছিলেন কি না এবং করে থাকলেও তাদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। তবে বহু বিবাহের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের জন্য আবেদন পত্র পাঠিয়েছিলেন দিনাজপুর ও রাজশাহীর অধিবাসীরা। আশ্চর্যের কথা হলো দিনাজপুরের রাজাও বহুবিবাহ বিরোধী আইন প্রণয়নের জন্য আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন।

আবার বিধবা বিবাহ নিয়ে যে তুমুল আলোড়ন শুরু হয়েছিল উত্তরবঙ্গেও তার প্রভাব অনুভূত হয়েছিল। রংপুরের অধিবাসীরা বিধবা বিবাহ বিষয়ক আইনের সমর্থনে একটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু উল্লেখ্য বিষয় হলো বিধবা বিবাহ আইনের বিপক্ষেও রংপুরবাসীরা আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন। আরো একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো বিধবা বিবাহের পক্ষে যারা আবেদন পত্র স্বাক্ষর করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ইংরেজীতে স্বাক্ষর করেছিলেন। অর্থাৎ শিক্ষিত সমাজই বিধবা বিবাহ সমর্থন করেছিলেন, দেশীয় শিক্ষিত সমাজ নয়। উত্তরবঙ্গেও তাই ঘটেছিল। তার প্রমাণ হলো ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন গৃহীত হলেও ১৮৮৪ সালের মধ্যে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে একটিও বিধবাবিবাহ হয়নি। তবে অনেক পরে বিশ শতকের প্রথমাদ্ধে বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে দুটি বিধবা বিবাহের খবর পাওয়া গিয়েছিল। একটি

বালুরঘাটে, অপরটি হল জলপাইগুড়িতে। বালুরঘাটের বিশিষ্ট স্বাধীনতা আন্দোলনকারী সরোজ রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বিধবা বিবাহ করেছিলেন। আর জলপাইগুড়িতে স্বনামধন্য চা শিল্পপতি যোগেশ চন্দ্র ঘোষ নিজে উদ্যোগী হয়ে একজন বিধবাকে বিয়ে দিয়েছিলেন।

১৮৯১ সালে সহবাস সম্মতি বিলের (Age of consent Bill) বিরুদ্ধে কোচবিহারের অধিবাসীরা ইংরেজ সরকারের নিকট একটি আবেদনপত্র জমা দিয়েছিলেন। এই আইনের অর্থ হলো কন্যা সন্তান দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ না করলে বিবাহ দেওয়া যাবে না। মনুর নিয়মানুযায়ী অষ্টম বর্ষে কন্যাকে পাত্রস্থ করতে হবে। এই নিয়মের বিরুদ্ধেই সরকার সহবাস সম্মতি বিল প্রস্তুত করেছিলেন। যাই হোক এই সামাজিক-মানসিক কাঠামোর মধ্যেই ক্ষীণাকারে জাতীয় চেতনার সূত্রপাত ঘটেছিল। এবারে সে কথাতেই আসছি।

সাধারণভাবে ঔপনিবেশিক কাঠামোতে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে ঘটেছিল দুটি পর্বে। একটি পর্বে ইংরেজী বা পাশ্চাত্য শিক্ষিত লোকেরা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক সমিতি বা সভা গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই উদ্যোগ স্থানিকভাবে শুরু হলেও এর আদলটি কলকাতা থেকেই পাওয়া। আবার সর্বভারতীয় বা সর্ব বাংলা ভিত্তিক সংগঠনের বা সংস্থার শাখাও স্থাপিত হয়েছিল জেলাগুলোতে বা বর্ধিষ্ণু বা নবীন শহরে। অর্থাৎ আদি পর্বের রাজনৈতিক চেতনা সভা সমিতি গঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক সংস্থা বা সংগঠনের স্থাপনের কথা তখনও তারা ভাবতে পারেননি। রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নিয়ে রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপনের ঘটনা দ্বিতীয় পর্বের। অর্থাৎ বিশ-শতকের ঘটনা। অন্ততঃ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে বাদ দিলে তাই বলতে হয়।

আঞ্চলিক ভাবে রাজশাহীতে ১৮৭৬ সালে রাজশাহী এ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়েছিল। এটিকে অবশ্য রাজনৈতিক এ্যাসোসিয়েশন বলা যাবে না। রাজশাহী এ্যাসোসিয়েশনের আদলে মালদহে Malda Association স্থাপিত হয়েছিল। দিনাজপুরেও এই রূপ এ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হলেও জলপাইগুড়িতে স্থাপিত হয়নি। কোচবিহারে অবশ্য রাজ সরকারের পৃষ্টপোষকতায় কোচবিহার হিতৈষী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৫৯ সালে। এইসব সভা বা সংস্থা অঞ্চলের আর্থিক নৈতিক, সামাজিক উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করতেন। রাজনৈতিক কোনো কর্মসূচী ছিলনা এদের।

সর্ববাংলা বা সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংস্থা The India Association ১৮৭৬ সালে কলকাতায় স্থাপিত হয়েছিল। এর শাখা ১৮৭৯ সালে জলপাইগুড়িতে স্থাপিত হয়েছিল। শিলিগুড়িতে শাখা স্থাপিত না হলেও ১৮৮৩ সালের অধিবেশনে শিলিগুড়ি থেকে দুজন প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছিলেন কলকাতায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে The India Association এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কথায় আসছি।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫ সালে মুম্বই (তখন বোম্বাই) শহরে শুরু হয়েছিল।

এবং এখানে প্রথম অধিবেশন বসেছিল। এই প্রথম অধিবেশন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৮২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছিলেন। এতে বর্তমান উত্তরবঙ্গ থেকে কেউ উপস্থিত ছিলেন কিনা জানা যায়নি এখনও। তবে ১৮৮৬ সালের ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে অর্থাৎ কলকাতা অধিবেশন জলপাইগুড়ির থেকে ডাঃ তমিজউদ্দিন আহমেদ নামে এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তবে এই চিকিৎসক জলপাইগুড়ির না বাইরের, তা স্পষ্ট নয়। এই অধিবেশনে মালদহ থেকে উপস্থিত হয়েছিলেন রাধেশ চন্দ্র শেঠ। তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে হিন্দু রঞ্জিকা পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য হিন্দু রঞ্জিকা পত্রিকা রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হতো। রাধেশ চন্দ্র শেঠ অস্থায়ী সম্পাদক ছিলেন এই পত্রিকার। লন্ডন থেকে প্রকাশিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মুখপত্র The India-র ১৮৭৯ সালের একটি সংখ্যার একটি খবরে দেখা যাচ্ছে যে জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর ও পূর্ণিয়াতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের শাখা স্থাপিত হয়েছিল ১৮৯১ সালে। এই সময় কংগ্রেসের জেলা শাখার প্রচলন ছিল না। এর নাম ছিল সার্কেল। অর্থাৎ দেশের বিভিন্ন অংশে কংগ্রেসের সার্কেল অফিস খোলা হয়েছিল। জলপাইগুড়িতে এই সার্কেলের সেক্রেটারী ছিলেন বাবু উমাগতি রায়। ১৮৯৬ সালে কংগ্রেসের দ্বাদশতম কলকাতা অধিবেশনে জলপাইগুড়ি থেকে উপস্থিত ছিলেন উমাগতি রায়, কুমার জগদিন্দ্রদেব রায়কত, তারিণী প্রসাদ রায় প্রমুখ। প্রসঙ্গ উল্লেখ্য এই অধিবেশনেই রবীন্দ্রনাথ 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি শুনিয়ে ছিলেন দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে। ১৯০৩ সালের ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে জলপাইগুড়ি থেকে উপস্থিত হয়েছিলেন বাবু উমাগতি রায়, মধুসূদর রায় প্রমুখ। এই মধুসূদন রায় ছিলেন রাজবংশী সমাজভুক্ত ব্যবহারজীবী।

১৯২১ সালে নাগপুর অধিবেশনে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস জেলা কংগ্রেস শাখা খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। এই সূত্রেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন জেলাতে কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়েছিল। জলপাইগুড়িতে এই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন রাজা জগদিন্দ্রদেব রায়কত এবং সম্পাদক শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র সান্যাল। দুজনেই দেশব্রতী ও দেশভক্ত হিসেবে সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। রাজা জগদিন্দ্রদেব রায়কত মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ ত্যাগ করেছিলেন, আর জ্যোতিষচন্দ্র এম.এ.বি.এল হয়েও সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ না করে সংবাদ পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেছিলেন। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই এই সময়েই জেলা কংগ্রেসের শাখা স্থাপিত হয়েছিল। অবশ্যই কোচবিহার বাদে। কারণ কোচবিহার ছিল দেশীয় রাজ্য। তবে দার্জিলিংঙে জেলা কংগ্রেস স্থাপন ও দপ্তর স্থাপন নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিল কালিম্পং ও শিলিগুড়ির মধ্যে। কালিম্পঙেই প্রথম কংগ্রেসের শাখা স্থাপিত হয়েছিল। শিলিগুড়িতে পরে হয়েছিল। ফলে কালিম্পং ও শিলিগুড়ির মধ্যে জেলা কংগ্রেস প্রধান দপ্তর স্থাপন নিয়ে দড়ি টানাটানি শুরু হয়েছিল। শেষাবধি শিলিগুড়িতেই কংগ্রেসের সদর দপ্তর

হয়েছিল। কোচবিহার কংগ্রেসের শাখা স্থাপিত হয়েছিল স্বাধীনতার পরে। অন্যদিকে ধর্মীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগের শাখা উত্তরবঙ্গে স্থাপিত হয়েছিল ১৯৪০ সালে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণের পরে। মুসলিম লীগ স্থাপিত হয়েছিল ১৯৪৬ সালে তবে স্থানিকভাবে জলপাইগুড়ি, মালদহ, দিনাজপুরে জেলা মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়েছিল। সর্বভারতীয় সংস্থা সেন্ট্রাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হয়েছিল জলপাইগুড়ি ও মালদহের অভিজাত মুসলমানদের অনেকেই।

জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী সংস্থার পাশাপাশি সমাজতন্ত্রের ধারা প্রসারিত হতে শুরু করেছিল। আচার্য নরেন্দ্র দেব, মিনু মাসানী, রামমনোহর লোহিয়া, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ ছিলেন এই আন্দোলনের ঋত্বিক। ১৯৩৩ সালে সোসোলিষ্ট বা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসীদের এক সর্বভারতীয় সম্মেলন বসেছিল মুম্বইতে। এদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জলপাইগুড়িতে ও কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি (গ্রুপ) স্থাপিত হয়েছিল। দিনাজপুরে ও কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির শাখা খোলা হয়েছিল।

সোসালিষ্টদের পাশাপাশি প্রগতি ও সাম্যবাদী আদর্শে বিশ্বাসীরা কমিউনিষ্ট পার্টি স্থাপন করেছিলেন। ১৯২৫ সালে জেলায় জেলা সাম্যবাদীরা কংগ্রেসের পতাকাতলেই কাজ করতেন। পৃথক কমিউনিষ্ট পার্টি জেলায় জেলায় অনেক পরে তৈরী হয়েছিল। তবে হিন্দু মহাসভা ও জেলায় জেলায় তাঁদের প্রচারভিযান চালাতেন। এরাও কংগ্রেসের সঙ্গেই থেকেছেন। হিন্দু মহাসভায় জেলা সংগঠনগুলো মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাবের পরেই বিশেষভাবে বেড়ে উঠেছিল।

একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতন্। সব মত ও পথের দিশারীরা সকলেই ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ ও বিকাশের প্রচারকও এরাই ছিলেন। জাতীয়তাবাদী, সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও সাম্যবাদী তিনটি স্রোত বিকশিত হলেও জাতীয়াবাদী স্রোত-ই ছিল মূল স্রোত। এই স্রোতেই অবগাহন করেছে সিংহভাগ ভারতীয়।

⌘⌘⌘⌘⌘

"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিভাজন এড়াতে চাই উত্তরবঙ্গ বিধিবদ্ধ স্বশাসিত উন্নয়ন পর্ষদ"

গোবিন্দ রায়

১৯৪৭ এ বঙ্গ বিভাজনে পশ্চিমবঙ্গের জন্ম। পূর্ববঙ্গ জন্মের পরই পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হয়ে বাংলাদেশ। এখন আর পূর্ববঙ্গ নেই। তাই পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ আছে অবিভক্তই।

বঙ্গ বিভাজনের মত উত্তরবঙ্গ বিভাজনও হয়েছে ১৯৪৭ সালে। উত্তরের রংপুর, দিনাজপুর, বগুরা, রাজসাহী প্রথমে পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তানের উত্তরবঙ্গ পরে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ।

পশ্চিমবঙ্গের সাথে উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক বিভাজন গঙ্গা নদী। আবার পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তান বর্তমানে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের বিভাজন যমুনা নদী। ১৯৪৭-এ দেশ ভাগের পর জলপাইগুড়ি জেলার ৫টি থানা, তেঁতুলিয়া, বোঁদা, পচাগর, দেবীগঞ্জ, পাটগ্রাম হুকুম পাকিস্তান ঘোষিত হলে পশ্চিমবঙ্গের নেতারা কেউ সোচ্চার হয়েছেন বলে জানা যায় না। ১৯৫০ সালে কোচবিহার দেশীয় রাজ্য উত্তরবঙ্গের একটি জেলায় পরিণত হয়েছে। সবটা মিলে জলপাইগুড়ি বিভাগ। প্রথমে ৫টি জেলা নিয়ে এই বিভাগ মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার এখন ৮টি জেলা এবং মালদা একটি নতুন বিভাগ। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, আলিপুরদুয়ার এবং কালিম্পং নতুন জেলা।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা, উত্তরবঙ্গ তথাকথিত মিনি সচিবালয় উত্তরকন্যা, উত্তরবঙ্গের স্বতন্ত্র পরিচয় বহন করে চলেছে।

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে গঠিত জিটিএ (গোর্খা টেরিটোরিয়াল এ্যাডমিনেস্ট্রশন) কুমারগ্রাম, কালচিনি, মাদারিহাট, নাগরাকাটা, মাল, মেটেলি, ৫টি বিধানসভা কেন্দ্র নিবির আদিবাসী অধ্যুষিত। এই অঞ্চল এমনিতেই সংবিধানের যষ্ঠ তপশীল ভুক্ত প্রশাসনের আওতা ভুক্ত হওয়ার কথা। এর বাইরেও দঃ দিনাজপুরের তপন মালদার হাবিবপুর এবং দার্জিলিং এর ফাঁসিদাওয়া তপশিলি আদিবাসী সংরক্ষিত কেন্দ্র। বাকী কোচবিহারের ৫টি, জলপাইগুড়ির ৪টি, আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা, দার্জিলিং-এর মাটিগারা, উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর, কুশমন্ডি, মালদার গাজল মোট ১৬টি কেন্দ্র তপশিলি সংরক্ষিত বৃহৎ জনগোষ্টি রাজবংশী ক্ষত্রিয় অধ্যুষিত। বাকী ২৮টি কেন্দ্রের ৮টি মুসলিম অধ্যুষিত এবং ২০টি তে রাজবংশী, বর্ণহিন্দু, তপশিলি, নমঃশূদ্র, মুসলিম ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেনী মিশ্রণ। এই বহু জাতি, জনজাতি অধ্যুষিত উত্তরবঙ্গ কলকাতা কেন্দ্রীক সভ্যতা সংস্কৃতির আলোক থেকে বঞ্চিত ও অবহেলিত জনপদ।

উত্তরবঙ্গের মালদায় গৌড়, দিনাজপুরের কর্ণসুবর্ণ ও বানরাজার ইতিহাস, জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ী, ডুয়ার্সের নলরাজার গড় স্বতন্ত্র ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে। কোচবিহারে মহারাজা নরনারায়ন ও তার সেনাপতি শুক্লধ্বজ (চিলা রায়) ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। কোচবিহারের সেনাপতি চিলা রায়ের নাম ব্রিটিশ ঐতিহাসিক টয়েনবি নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ও ছত্রপতি শিবাজীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। সেই দেশিয় রাজ্য কোচবিহার ভারত ভুক্তির পর প্রথমে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল, পরে 'গ' শ্রেণী ভুক্ত রাজ্যের মর্যাদা থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক জেলায় পরিনত হয়েছে।

স্বতন্ত্র ইতিহাস সমৃদ্ধ উত্তরবঙ্গের এই জনপদ পশ্চিমবঙ্গের কোলকাতা কেন্দ্রীক সভ্যতার থেকে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক সব বিষয়ে ভিন্ন স্রোত ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই অঞ্চলের জনজাতি উপজাতি ও মিশ্র জনগোষ্ঠির মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যানে স্বতন্ত্র্য রাজ্য না হলেও স্বশাসিত সাংবিধানিক শাসনের দাবীদার অবশ্যই হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ নিয়ে স্বতন্ত্র রাজ্য, ইউ টি নয় চাই বিধিবদ্ধ স্বশাসিত উন্নয়ন পর্ষদ দাবীর যৌক্তিকতা ঃ

১) ভৌগোলিক স্বতন্ত্রতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির সময় থেকেই উত্তরবঙ্গ স্বতন্ত্র জনপদ। কোচবিহার সংযুক্তির ইতিবৃত্ত ও তৎজনিত ক্ষোভ এবং তারও পশ্চাতপদতা এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

২) অর্থনৈতিক ঃ চাশিল্প, পর্যটন, কৃষি, কুটির শিল্প অর্থনীতির ভিত্তি। ভারী, মাঝারী শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহনে উত্তরপূর্ব ভারতের মত বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা চাই। পাট, তামাক, আলু, লংকা, টমাটো প্রভৃতি কৃষিপন্নকে ভিত্তি করে, আধুনিক পাটকল, তামাক থেকে রং তৈরীর শিল্প, আলু থেকে এ্যালকোহল, চিপস্ লংকা, টমাটো প্রসেসিং শিল্প গড়ে তোলার সম্ভাবনাকে বাস্তবায়ন করতে হবে।

* চা বাগান উত্তরবঙ্গে তার হেড্ কোয়াটার কলকাতায়। এটা উত্তরবঙ্গ ফিরিয়ে আনতে হবে।
* টি বোর্ড উত্তরবঙ্গে স্বতন্ত্র করতে হবে। জলপাইগুড়ি চা নিলাম কেন্দ্র, আলিপুরদুয়ার ডুয়ার্স চা নিলাম কেন্দ্র চালু করতে হবে।

৩) রাজনৈতিক ঃ মেইনস্ট্রিম কোন দলেরই রাজ্য দপ্তর উত্তরবঙ্গে নেই। রাজ্য সম্পাদক/সভাপতি নেই। প্রতিটি মেইনস্ট্রিম দলের স্বতন্ত্র উত্তরবঙ্গ কমিটি প্রয়োজন। রাজ্য বিধানসভায় ডেপুটি স্পীকার, মন্ত্রীসভায় ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রী সহ ১/৪ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক উত্তরবঙ্গের চাই। রাজ্যসভায় সবসময়ের জন্য ৩ জন উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধি চাই। বিধান পরিষদ গঠিত হলে তারও আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব চাই উত্তরবঙ্গ থেকে।

৪) স্বাস্থ্য ঃ AIIMS চাই, জেলা হাসপাতাল সমূহ, মেডিক্যাল কলেজ সমূহ ও গ্রামীন হাসপাতাল গুলিতে সর্বক্ষণের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও সরঞ্জাম চাই। স্বাস্থ্য বিভাগে নিয়োগের জন্য উত্তরবঙ্গেই স্বাস্থ্য ভবন চাই।

শিক্ষা ঃ IIT, IIM, Central University, কারিগরী শিক্ষা, উচ্চ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা চাই।

৫) শিল্প ঃ আধুনিক পাটশিল্প, ভেষজ শিল্প ও কৃষিভিত্তিক শিল্প চাই। শিল্প বিকাশ কেন্দ্র ও তার পরিকাঠামো উন্নয়ন করে WBIIBC'র উত্তরবঙ্গ শাখা চালু করতে হবে।

৬) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঃ কলকাতা কেন্দ্রীকতার বদলে সব কিছুরই বিকেন্দ্রীকরণ চাই সাহিত্য একাডেমী, হেরিটেজ কমিশন থেকে সব কিছুরই। যা আছে রাজ্যে তার সিকি অংশের ভাগিদার উত্তরবঙ্গ। উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী সমস্ত জনজাতির ভাষা সংস্কৃতি বিকাশে গবেষণা ও গ্রন্থ প্রকাশের জন্য স্বতন্ত্র্য বোর্ড চাই।

৭) পূর্ণাঙ্গ হাইকোর্ট বেঞ্চ, (মাদুরাই মডেল) চাই। দ্রুত নির্মান কার্যের মাধ্যমে নিজস্বভবনে হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ চালু করতে হবে।

৮) SSC, PSC, SSC, CSC, WBP সব নিয়োগেরই উত্তরবঙ্গ জোন আবশ্যিক করণ।

৯) পূর্ত্ত ও সড়ক দপ্তরের উত্তরবঙ্গ কার্যালয়, জলপাইগুড়িতে পুনরায় চালু করতে হবে।

১০) বন্যা নিয়ন্ত্রন, নদীভাঙ্গন প্রতিরোধে উত্তরবঙ্গ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বোর্ডকে পুনজীবীত করা দরকার। ইন্দোভুটান নদী কমিশন গঠন করতে হবে।

১১) যোগাযোগ ও কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, বালুরঘাট বিমান বন্দর চালু করতে হবে। রেলপথ সম্প্রসারণ ও আন্ত জেলা সার্কুলার ট্রেন চালু করতে হবে।

১২) উত্তরবঙ্গের সম্পদ অরন্য সুরক্ষা ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ বরাদ্দ ও তার বাস্তবায়ণ –

১) জাতীয় নদী সেচ প্রকল্প তিস্তা, ২) নদী শাসন ও বন্যা নিয়ন্ত্রনে, ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের কার্যালয়, ৩) আর্কিওলোজিক্যাল দপ্তরের অধীগ্রহনে উত্তরবঙ্গের সমস্ত হেরিটেজ ইমারতের রক্ষণাবেক্ষণ, ৪) AIIMS, ৫) কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ৬) মিলিটারী একাডেমী, ৭) CPWD, ৮) উত্তরবঙ্গ কার্যালয় সীমান্ত উন্নয়ণে BADA গঠন, ৯) তেঁতুলিয়া করিডর, চালু, ১০) রেল ডিভিশন ও উন্নয়ণ, ১১) গীতালদহ, হলদিবাড়ি, তেঁতুলিয়া, স্থলবন্দর চালু করা, ১২) বিমান বন্দর, ১৩) Reserve Bank এর Branch, ১৪) SAI উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং

ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, ১৫) মিলিটারী স্কুল স্থাপন।

GTA/DGIC মডেল অনুকরণে উত্তরবঙ্গ বিধিবদ্ধ স্বশাসিত উন্নয়ন পর্ষদের গঠন ঃ

(ক) জেনারেল কাউন্সিল ঃ

উত্তরবঙ্গে প্রতিটি ব্লক থেকে ১ জন, বড় ব্লক হলে তার সমান দুই অংশ নিয়ে ২ জন প্রতিনিধি বিধানসভা কেন্দ্র ভিত্তিক ২টি করে আসন চিহ্নিত করে প্রত্যক্ষ নির্বাচন। পঞ্চায়তে নির্বাচনের সঙ্গে এবং পৌর সভা নির্বাচনের সঙ্গে কাউন্সিল সদস্য নির্বাচন করা যেতে পারে। জেনারেল কাউন্সিল মোট নির্বাচিত সদস্য ৫৪x২ = ১০৮ জন সদস্য/সদস্যা।

(খ) এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ঃ

১০৮/৬ = ১৮ জন সদস্য/সদস্যা জনবসতি সংখ্যা অনুযায়ী প্রতিনিধি সুনিশ্চিত করা। উভয়ক্ষেত্রে কাউন্সিলে তপঃ জাতি (রাজবংশী), নমশূদ্র, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী (ক) ও (খ) সাধারণ প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করার বিধান থাকবে। পঞ্চায়ত বা পৌর আইন অনুকরণে মহিলা সংরক্ষণ ব্যবস্থাও কার্যকর করতে হবে। পর্ষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচিত হবেন। সদস্যদের দ্বারা। সভাপতি হবেন এস.সি. (আর), সহ-সভাপতি হবেন ও.বি.সি (এ) এছাড়া কার্যনির্বাহী হবেন - বন (এস.টি), চা-বাগান (এস.টি), আদিবাসী ভাষা সংস্কৃতি ও শিক্ষা (এস.টি), রাজবংশী ভাষা সংস্কৃতি ও শিক্ষা এস.সি. (আর), কৃষি ও উদ্যান পালন এস.সি. (এন), মৎস চাষ, পান চাষ (এস.সি.) (এন), সাধারণ শিক্ষা (ইউ. আর), অনগ্রসর কল্যাণ ও.বি.সি (এ), সড়ক ও পরিবহন এস.সি. (আর), সেচ ও জলপথ এস.সি, (আর), সীমান্ত ও.বি.সি (এ), স্বাস্থ্য নারী ও শিশু কল্যাণ এস.সি. (আর), স্বাস্থ্য, আদিবাসী নারী ও শিশুকল্যাণ (এস.টি), সংরক্ষণ ও নিয়োগ এস.সি. (আর), নগরায়ণ পৌর অঞ্চল উন্নয়ণ (ইউ. আর), গবেষণা ও উদ্ভাবনী বিষয় ও.বি.সি (বি)।

এস.সি. (আর) সভাপতি + ৫	= ৬
এস.সি. (এন)	= ২
ও.বি.সি. (এ) সহ-সভাপতি +২	= ৩
ও.বি.সি. (বি)	= ২
এস. টি.	= ২
ইউ.আর.	= ৩
	১৮

(নোট- এস. সি (আর) = রাজবংশী, এস. সি. (এন) = নমশূদ্র, ওবিসি (এ) মুসলিম, নস্যশেখ, ওবিসি (বি) যাদব, গোপ, মাহিস্য প্রভৃতি)।

এই মর্মে সংবিধানের সংশোধন করে কেন্দ্র ও রাজ্য দুই আইন সভায় NBDC

(Autonomous) পাশ করতে হবে।

অন্যান্য করণীয় ঃ

(১) রাজ্য সরকারের সমস্ত দপ্তরের উত্তরবঙ্গ সচিবালয় কাজ করবে পর্ষদের অধীনে উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে।

দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব পদ সৃষ্টি করতে হবে। অতিরিক্ত সচিব এবং অতিরিক্ত ডাইরেক্টর বৃন্দ উত্তরবঙ্গের জন্য নিয়োজিত হবে।

রাজ্যসরকারের সমস্ত দপ্তরের প্রায় ৪৪টি কর্পোরেশন আছে। তার প্রতিটির শাখা উত্তরবঙ্গের জন্য স্থানান্তর করতে হবে এবং প্রতিটি কর্পোরেশনের সভাপতি ও সদস্যরা হবেন পর্ষদ কর্তৃক মনোনিত।

এর মাধ্যমে রাজ্য বিভাজন রোধ করে ক্ষমতার পূর্ণাঙ্গ বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের দাবিকে মান্যতা দেওয়াই বর্তমান সময়ের একমাত্র সমাধান সূত্র। মনে রাখা দরকার আধুনিক বিশ্বে উন্নয়ণের বৈষম্য দূরীকরণে আঞ্চলিক উন্নয়ণ কাউন্সিল গঠন একটি স্বীকৃত পদক্ষেপ। আধুনিক চিন দেশেও এই উন্নয়ণ মডেল স্বীকৃত।

অর্থনীতির তিনটি মানদন্ডের বিচারে উত্তরবঙ্গ একটি স্বীকৃত পিছিয়ে পড়া অঞ্চল। অর্থনীতিবিদ ডঃ মানস দাশগুপ্ত বহুবার সে কথা বলেছেন

HDI (Human Development Index)
HDM (Human Deprivation Measure)
এবং CPM (Capability Poverty Measure)

এই তিনটি মানদন্ডের বিচারে আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ উন্নয়নে উত্তরবঙ্গ স্বশাসিত বিধিবদ্ধ উন্নয়ন পর্ষদ গঠন জরুরী। আর এই বিষয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ সদিচ্ছা থাকলে তা যে সম্ভব তার প্রমান বাম আমলে DGHC এবং মমতা ব্যানার্জীর আমলে GTA গঠন। এই উভয় ক্ষেত্রে দার্জিলিং হিলের উন্নয়নে কাম্য উন্নয়ণ সংগঠিত করতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার উভয়ই উন্নয়নের বদলে রাজনীতি করতে গিয়ে লক্ষ্য পূরণে সফল হয়নি। সেটা অবশ্য ভিন্ন প্রসঙ্গ।

আসলে উন্নয়ন মানে মানব সম্পদের উন্নয়ন। উন্নয়নের জন্য চাই একটি নির্দিষ্ট দর্শন। সেই নির্দিষ্ট দর্শন অনুযায়ী লক্ষ্য পূরণে চাই বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা। আর আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে চাই আন্তরিক সদিচ্ছা। শরীরের সব অঙ্গে সঞ্চালন সঠিক ভাবে না হয়ে শুধু মাত্র মুখে রক্ত জমতে থাকলে যেমন মানবশরীর অসুস্থ হয় ঠিক তেমনি আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে ক্ষমতার পূর্ণাঙ্গ বিকেন্দ্রীকরণ না করে, পরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক পথে অগ্রসর না হলে রাজ্যের বা দেশের ক্ষেত্রেও প্রকৃত সুফল পাওয়া যায় না।

দিল্লিতে সেন্ট্রাল ভিস্তা নির্মানে কিংবা নবান্নে ক্রমাগত শাসক দলের আত্ম প্রচারের

মাধ্যমে সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য নানা ক্ষোভের জন্য, তার থেকেই বিচ্ছিন্নতার বিকাশ। এর একমাত্র সমাধান সাংবিধানিক বিধি অনুযায়ী দায়িত্ব বন্টন। আইনী সংস্থা হিসাবে বিধিবদ্ধ স্বশাসিত উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ গঠন। উত্তরবঙ্গের আপামর মানুষ দিল্লি কলকাতার মত মেট্রো চায় না। হিমালয়ের কোলে প্রকৃতির অপরূপ ঔদার্যের পাহাড়, বনাঞ্চল, চা-বাগিচা অঞ্চল ও সমতলের কৃষিক্ষেত্রের মানুষ চায় তার আত্মমর্যাদা নিয়ে বেচে থাকার, এগিয়ে চলার সাংবিধানিক অধিকার। শতাব্দী ধরে কারও অনুগত থেকে নয়, নিজের ভাগ্য নিজে গড়ে তোলার অধিকার নিয়ে আত্মমর্যাদায় স্বকীয় সত্ত্বার বিকাশ চায় উত্তরবঙ্গের আজকের জাতি, জনজাতি, আদিবাসী পিছিয়ে পড়া সমাজ। এই দাবি ন্যায্য। এই দাবী যৌক্তিক। এর মাধ্যমেই শতফুল বিকশিত হবে উত্তরবঙ্গে। শক্তিশালী হবে পশ্চিমবঙ্গ। গৌরবান্বিত হবে ভারতবর্ষ।

⌘⌘⌘⌘⌘

নবোদয়ের চার অধ্যায়

মানস মোহন গুহ

পরাধীন ভারতে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করা কল্পনাতীত। গ্রামীণ ভারতবাসীর হৃদয় ছিল জ্বলন্ত আগুনের গর্ভগৃহ। স্বাধীকার অর্জনের লক্ষ্যে বেশকিছু বিদ্রোহ গ্রামীণ ভারত ঘটিয়েছিল। যেমন ১৮১৬ সালে বেরেলি বিদ্রোহ, ১৮৩১-৩২ সালে পালামৌ ও ছোটনাগপুরের কেলী বিদ্রোহ, বাংলার বারাসতে ১৮৭৭ সালের ফরাসি বিদ্রোহ, মোপলা বিদ্রোহ ১৮৪৯, ১৮৫১, ১৮৫২, ১৮৫৫ সালে, সাঁওতাল বিদ্রোহ ১৮৫৫-৫৬ সালে ও সিপাহী বিদ্রোহ ১৮৫৭-৫৯ সালে। কিন্তু রাতের শেষে উষার উদয় তো হবেই। তাই পরাধীন ভারতে নব চেতনার উন্মেষ লগ্নে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির আবির্ভাব এক গৌরবদীপ্ত অধ্যায় সৃষ্টি করে গিয়েছে তা শৌর্য-বীর্যের মহিমায় উজ্জ্বল আত্মত্যাগ ও কর্ম সাধনার বিভাস অতুলনীয় দেশপ্রেমের বিচ্ছুরণে দীপ্যমান।

এই অরুণোদয়ের লগ্নটা কেমন ছিল! একদিকে ব্রিটিশের ছত্রছায়ায় দেশীয় নৃপতিকুল আর অপরদিকে সাধারণ প্রজাকুল অশিক্ষা, কুসংস্কার অনৈক্য, কাপুরুষতা, নৈতিক অবনতি দারিদ্র্যে জর্জরিত। মানুষ নির্বাক; নীলকর, জমিদার, চোর-ডাকাতদের অত্যাচারে অসহায় মানুষ দিশেহারা। আবার একটা আশার ব্যঞ্জনা হলো রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, ডিরোজিওর শিষ্য কুলের 'ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্ট', মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র ও আরো কবি-সাহিত্যিকের আবির্ভাব। এই যুগসন্ধিক্ষণেই ১৮৪৮ সালে যুগপুরুষ সুরেন্দ্রনাথ-এর জন্ম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে বিলাত গমন। প্রত্যাশা আইসিএস হবেন; হলেনও। ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে আসামে কর্মজীবন কিন্তু তিন বছরও পার হল না মিথ্যা অজুহাতে পদচ্যুত হলেন। ভেঙ্গে পড়লেন না ব্যারিস্টারি পড়বেন বলে আবার বিলাত গমন। কিন্তু সেখানেও অনুমোদন পেলন না। অবশেষে পিতৃবন্ধু ঈশ্বরচন্দ্রের মেট্রপলিট্যান কলেজে অধ্যাপনা শুরু। তারপর চার্চ কলেজ ও শেষে প্রেসিডেন্সি ইনস্টিটিউশনের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে রিপন সাহেবের অনুমতিক্রমে রিপন কলেজে (বর্তমান নাম সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপনা।

সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৫ সাল থেকে ১৯১২ সালে অবধি শিক্ষকতা করেছেন। শিক্ষকতাই তার প্রিয়। আর প্রিয় ছিল তরুণ সমাজ। সেই জন্য তরুণ ছাত্রদলের মনোবল দৃঢ় করা, যাতে তারা দেশমাতৃকার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে। তাই তিনি ছাত্রদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখতেন। তার প্রথম বক্তৃতা কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রেক্ষাগৃহে 'ধূমপান ও মাদক বিরোধী' আন্দোলনের সমাবেশে। কারণ তখন কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সুরাশক্ত ও সাথে সাথে ধূমপায়ী। এই কুঅভ্যাস ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল তরুণদের উপর। এই সভায় সুরেন্দ্রনাথের বক্তব্য তরুণদলের হৃদয়াবেগকে উন্মাদনায় পর্যবসিত করলো।

তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে নিকটবর্তী সময়ের মধ্যে কোন মহৎ ব্যক্তি বা বৃহৎ উদ্‌বোধনের আবির্ভাব হয় নাই। তার বক্তৃতায় বিষয় ছিল ভারতীয় ঐক্য ও ইতিহাস, চৈতন্যদেব ও ইতালির ম্যাজিনি, ইংরেজি শিক্ষা ও সর্বোপরি দেশপ্রেম, দেশাত্মবোধ ও মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ। মুখে মুখে বার্তা রটে গেল। দেখা গেল তার বক্তব্য শুনতে কিংবদন্তি নায়করা ও তার সভায় উপস্থিত। যেমন, বিবেকানন্দ, নন্দকিশোর বোস ও আরো অনেকে। সুরেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন যে ১৮৭৫ সালের সমাজ রাজনৈতিক বিষয়ে উদাসীন ছিল। তাই তিনি উল্লিখিত পন্থা গ্রহণের মাধ্যমে জনসাধারণকে বিশেষ করে যুব গোষ্ঠীকে উদ্দীপিত করলেন। এই উদ্যোগে তিনি সর্বক্ষণের সঙ্গী পেলেন আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীকে।

দিশার অন্বেষণ ঃ

মুখবন্ধে দেশের সংকটাপন্ন অবস্থার আবাস দেওয়া হয়েছে। প্রাক ইতিহাসের ধারা ভীতি সংকুল। ভয় ও ভাবনার সময় চিন্তা ও বাক্যের মধ্যে বিকলতা ঘটে। অথচ ঠিক এরকম সময়ে অবিচলিত ও নির্বিকার সত্যের প্রয়োজন সব থেকে বেশি। প্রতিদিন অসত্য ও অর্ধসত্য সমাজের ততো গুরুতর অনিষ্ট করে না। কিন্তু সংকটের সময় তার মতন ভ্রষ্টাচরণ আর কিছু নাই। এরকম প্রায় অনুরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। তার স্বপ্ন ভারতকে Westernization-এর আদলে গড়বেন। 'ইয়ংবেঙ্গল' তার ভরসা। কিন্তু তিনি ভারতীয় হয়েও কতটুকু ভারত দরদী? প্রশ্ন জাগে! একটা উদাহরণই যথেষ্ট। ১৮৪২ সালে লন্ডনের মেয়র কর্তৃক দ্বারকানাথের সম্মানার্থে আহূত এক ভোজ সভায় দ্বারকানাথ বলেছিলেন – "It was England who sent out Clive and cornwallis to benefit India by their courages and arms ...... And all this was done – not in the expectation of a requital – not in the hope of anything whatever in return, but in the mere love of doing good. It was impossible for his countrymen to treat the English ingratitude." শুধু এটুকুই উল্লেখ করা গেল.

স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে স্বদেশে ফেরার সময় দ্বারকানাথ সাথে করে একজন ভারতপ্রেমী বন্ধু এনেছিলেন। তিনি জর্জ টম্পসন। মানবতাবাদী ও বাগ্মী হিসাবে তিনি ইংল্যান্ডে জনপ্রিয়। বিশ্বের সমস্ত দাসদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন। এছাড়া ১৮৩৯ সালে লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি-এর সভায় ইংরেজদের ভারত সংক্রান্ত বহু তথ্যাজ্ঞত করেছেন। দ্বারকানাথের বাসনা যে 'ইয়ং বেঙ্গল' জর্জ টমসনের পরিচালনায় কীর্তি বাস হয়ে উঠুক। টম্পসনের উপস্থিতি শুরু 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর উদ্দমই বৃদ্ধি করল না, উপরন্ত ভূস্বামীদের একটা সংগঠন করতে প্রেরণা জোগালো। ইয়ং বেঙ্গলের তারাপদ চক্রবর্তীর ও রামগোপাল ঘোষদ্বয়ের নেতৃত্বে ২৪-৪-১৮৪৩ সালে স্থাপিত হ'ল বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি। লক্ষ্য ভারতের শুধুমাত্র ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চলের মঙ্গল সাধন করা – যেমন (১) প্রশাসনিক, আইন, পৌর,

শিক্ষা ও সামাজিক এবং (২) ইংল্যান্ডে উপস্থিত 'Parent Body' ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটিকে ভারত সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যাবলি জোগান দেওয়া। 'তত্ত্ববোধিনী' সভার প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি-এর উন্নতিকল্পে রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। ফল শূন্য। অরুণোদয়ের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় পর্বের আলোচনায় বলতে হয় Charter Act, 1833 ও 1853 ভারতবাসীর স্বার্থবহ ছিল না। তাই যুব ও বয়স্ক নির্বিশেষে একটা স্বদেশী স্বার্থসহায়ক সংগঠনের প্রয়োজনে ১৮৫১ সালে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। ২৫ বছর পর দেখা গেল এই সংগঠন শুধু জমিদারদের সার্থক কায়েমে নিয়োজিত তাই এটার আয়ুও শেষ।

এখন তৃতীয় অধ্যায় শুরু। কলকাতা তখন ব্রিটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান কার্যালয়। তখন বাংলার শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল – "আমরা ভারতবাসী – এক জাতি, এক প্রাণ।" এই পবিত্র। ভাবনার প্রাদেশিকতা বা সাম্প্রদায়িকতার কলুষ ছিলনা। আবির্ভাব হ'ল হেমন্ত কুমার ঘোষ ও শিশির কুমার ঘোষ ভাতৃদ্বয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অমৃতবাজার পত্রিকা যার মাধ্যমে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়। এই গোষ্ঠীর আর এক অবদান 'Indian League' প্রতিষ্ঠিত (২৫-৯-১৮৭৫)। কিন্তু সদস্যবৃন্দের মতপার্থক্যে এটাও স্থায়ী হয় নাই।

পরিশেষে 'ভারত সভা' (ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন)-এর উদ্বোধন। এ যেন একটুখানি করে এগিয়ে ভারতবাসী দেখতে পেল অরুণোদয়ে সূর্যের আলোকছটা দিগন্তে ছড়ানো। তেমনি মানুষের জীবন ও চেতনাতে যখন নতুন আলোকের কিরণ সম্পাত ঘটে, তখন তার বুদ্ধি ও ভাবনার বিচ্ছুরণ সমস্ত কিছুকেই দীপ্ত করে তোলে। ফলে রূপান্তর ঘটে তার সমাজ ভাবনা ও আনুষঙ্গিক সবকিছু। নতুন করে হয়ে ওঠে তার স্বদেশ চেতনা এবং জীবনবোধ। চেতনার এই নবজীবন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির দুর্বার প্রাণশক্তি সম্মুখপানে আগুয়ান করেছে বাধা-বিপত্তি থেকে জীবনবোধের দীপ্ত-আলোকে। সাথে তার চিরসাথী মনমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী ও দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী।

১৮৭৬ সালের ২৬শে জুলাই ৫-৩০মিনিটে 'ভারত সভা' বা দ্যা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্বোধন ঘটে। স্থান অ্যালবার্ট হল, কলেজ স্কোয়ার। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ৭০০-৮০০ লোকের জমায়েত। দেড় ঘণ্টা পর সুরেন্দ্রনাথ হাজির হলেন জনতা ক্ষুব্ধ। সুরেন্দ্রনাথ ক্ষমা চেয়ে বললেন,– "আমি শ্মশান থেকে ফিরছি আমার একটি মাত্র পুত্রকে দাহ করে; তাই দেরি হ'ল।" সভা একেবারে চুপ। অনেকেরই গন্ডদেশে অশ্রুধারা। সভা শুরু।

সভায় সুরেন্দ্রনাথ দু'রকম কর্মসূচি ঘোষণা করলেন। এক, জনগণের প্রতিনিধি হয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ও দ্বিতীয়, শিক্ষিতদের প্রভাবিত করতে জনগণের স্বার্থ সম্বিলিত দাবীর প্রশ্নে সভার মাধ্যমে বক্তব্য রাখা। 'বঙ্গ দর্শন' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের জয়ধ্বনি প্রকাশিত হলো – "আশা করি অবশেষে এমন একটা প্রতিষ্ঠান উদয় হ'ল যা ভারতের জনগণের স্বার্থে

আন্দোলন করবে।' দেখা গেল বাংলায় ১২১টি স্থানে আর বাংলার বাইরে লাহোর, আগ্রা, কানপুর, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে দ্য ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হল। এছাড়া রাষ্ট্রগুরুকে ভারতের চতুর্দিক থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

যাইহোক ভারত সভার প্রথম ১০ বছরের সফলতার তালিকা এইরূপ ঃ–

১) ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড স্যালিসবেরি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের বয়স কমানোয় সারা ভারত জুড়ে আন্দোলন।

২) ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন সুদূর ইংল্যান্ড অবধি ছড়িয়ে পড়েছিল। দু'বছরের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার বাতিল করে।

৩) ভারতীয়দের দাবি-দাওয়ার প্রশ্নে খোদ লন্ডনে 'ভারত সভার' প্রতিনিধি হিসাবে লালমোহন ঘোষকে ১৮৭৯ সালে পাঠানো হয়।

সংসদ নির্বাচনের সময় ১৮৮০ সালে গিয়ে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। ১৮৮৫ সালের নির্বাচনের সময়েও তিনি ভারতীয়দের সমস্যা সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে সমর্থ হয়েছিলেন।

৪) 'ভারত সভা' প্রজাসত্ব বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে খাজনা সংক্রান্ত জটিলতা যাতে সৃষ্টি না হয় কলকাতা, মেহেরপুর ও কিশানগঞ্জে এই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়।

৫) ন্যাশনাল সেল্ফ গভর্নমেন্ট রূপায়নের প্রথম ধাপ হিসেবে লোকাল সেল্ফ গভর্নমেন্ট রূপায়নে অগ্রসর হয়। ফলে লর্ড রিপন এই লোকাল সেল্ফ গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা চালু করেন।

৬) 'ভারত সভা'র আরেকটি উল্লেখযোগ্য অবদান 'ন্যাশনাল কনফারেন্স'-এর মতো প্রতিষ্ঠান স্থাপন যা ভারতব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ২৮, ২৯, ৩০শে ডিসেম্বর ১৮৮৫ সালে কলকাতার অ্যালবার্ট হলে প্রথম অধিবেশন। এখানে ভারতের প্রায় সমস্ত প্রদেশের প্রতিনিধিদের সমাবেশ। এমনকি ইংল্যান্ডের দুজন সাংসদ এবং শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির প্রতিনিধিরা যোগদান করেছিল। কলকাতা ছাড়াও বোম্বেতেও ন্যাশনাল কনফারেন্স এর অধিবেশন হয়েছিল।

এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। সুরেন্দ্রনাথ-এর ন্যাশনাল কনফারেন্স গঠনের বিষয়ে ভবিষ্যতের ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাতাদের তীক্ষ্ণ নজর ছিল। তাদেরই একজন কাশীনাথ ত্রেমবাক তেলাং সুরেন্দ্রনাথ-এর কাছে ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর ভবিষ্যত লক্ষ্য কি তা জানতে চাইলে তিনি তা জ্ঞাত করেন; কিন্তু তিনি জানতেন না যে তেলাং একজন কংগ্রেসের সংগঠক। আর প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি সুরেন্দ্রনাথকে কংগ্রেস অধিবেশনে আমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ রক্ষা করেন নাই। এখানে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভি.ভি.গিরির মন্তব্য উল্লেখযোগ্য – 'The National Conference can be rightly called the precursar of the Indian National Congress which came into existence in 1885. Holding the National Conference is the greatest achievement of the Indian Association in its work of the national cohesion and soliderity......" সুরেন্দ্রনাথও ঐ ১৮৮৫ সালেই

বোম্বেতে সভা করেন।

৭) এইভাবে সুরেন্দ্রনাথ তার কর্ম যজ্ঞের ইপ্সিত ফললাভ করতে লাগলেন। এরপর তার মনোযোগ গ্রামীণ সমাজের দিকে। এতদিন তিনি শহরের শিক্ষিত বাবু সমাজের দিকেই ব্যস্ত ছিলেন। এখন গ্রামের দিকে তার অভিযান। এই লক্ষ্যে তিনি সরকারের 'চৌকিদারি বিল'-এর বিরুদ্ধে গ্রামগুলিকে সংঘবদ্ধ করতে লাগলেন।

এছাড়াও আরো কর্মসূচি ছিল তার লক্ষ্যে। যেমন, আফগান যুদ্ধের ব্যয়ভার ভারতের উপর চাপানোর বিরুদ্ধে, সুতি বস্ত্রের ওপর আমদানি শুল্ক রদ করার, লর্ড কার্জনের বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে গেছেন।

আরো একটা বিশাল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন আসামের চা শ্রমিকদের স্বার্থে। কালা কানুন ইংল্যান্ড ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট ১৮৮২, বাতিল করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ভারত সভার সম্পাদক দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীকে আসামে প্রেরণ করে চা শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করার দায়িত্ব অর্পণ করেন।

কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর প্রাণের সম্পর্কই ছিল। তিনি ১৮৯৫ সালে পুনা ও ১৯০২ সালে আমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সুরেন্দ্রনাথের কর্মপুঞ্জ অসংখ্য ও দুর বিস্তার। কয়েকটি উল্লেখ করা হলো। দিনটি ১৯২৫ সালের ১৬ই আগস্ট। একটা দুঃসংবাদ রটে গেল – তিনি আর নেই। রাষ্ট্রগুরু আর কোনদিন ফিরবেন না। তিনি হয়ে গেলেন ইতিহাস।

১৯৫১ সালে 'ভারত সভা'র হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে 'ভূদান আন্দোলনের' জনক আচার্য বিনোবা ভাবের আবেগাপ্লুত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন – "How is it possible for us to forget the patriotic works of the Indian Association founded by Sri Surendranath Banerjee and Sri Anandamohan Bose, the two great souls of India and the effort made by the association towards the awaikening of nationalism in India even before the birth of the Indian National Congress."

কলকাতায় লোকমুখে একটা কথা প্রচলিত ছিল – "Surrender Not Banerjee"। তার নিষ্ঠা অন্যায়ের কাছে 'Surrender' নয়। – প্রতিবাদ।

৵৵৵৵৵

Child Care -- Scientific approach

R. K. Sharma

This endeavour of writing something about the children is due to insistence of my beloved brother. Today, I will try to discuss on the possibilities of making a child grow to full potential and become a sensible & responsible citizen with lot of success in life & becoming a happy and satisfied human being.

Let me make it amply clear that human beings grow as per the seeds of their thoughts & their future is an accumulation of their past thoughts. We unfold as per our thoughts. This universe gifts us in equivalence of our thoughts. Surprisingly, there is no error in this cause and effect relationship in everyone's life. Thoughts create realities, and we see the reality unfolding before us slowly as we had generated thought in the past. Our present is a summation of our past thoughts & our future is embedded in our present thoughts. So, all our success & failures, our achievements & unfulfilled dreams are due to our thought process. We are constantly knowingly or unknowingly creating our own realities. Thoughts are the causes & realities are the effects. Another surprising reality is that in almost ninety percent of our daytime we are thinking in the manner of the injected thoughts in the first seven years of our life.

A child's future is embedded in the mental & physical conditions prior to & during her mother's pregnancy, on the surrounding environment during the first seven years of a child's upbringing, on the relationship & physical & mental internal landscape of parents, on the mental makeup & behavior of the people with whom the child is growing up, on the overall environment around the child during child's formative years of childhood. Whatever gets written on the subconscious mind of the child during this period, the child repeats it unknowingly ninety percent time in the life afterwards. So, ninety percent of the future human being are the products of the injected thoughts in the subconscious mind during primary seven years of life. Naturally, our ignorance is mostly responsible for the future failure of a human being. Our wrong thoughts, narrow vision, lack of awareness & knowledge, our attitude & phsyche of ugly competition, hatred, jealousy, negativity, own failures, depressions etc., cast shadows on the thoughts of the child & throws child's future into darkness.

Every child is full of potential but we create bottlenecks on their path of proper growth due to a negative destructive environment created by us, of course, mostly unknowingly. So, the requirement is that of changing our own thought

process & creating a positive favourable constructive environment during the first seven years of upbringing of the child. It's necessary to write good constructive chapters on the subconscious mind of the child, so that, the child grows into a happy and good natured future citizen. The first seven years of life is more important than the rest of life & hence should be taken care of properly. It's the environment around the child which is more important of all the aspects in a child's formative growth stage.

Congenial atmosphere, balanced diet (made up of nature grown grains, fruits, vegetables & homemade food), mother's milk for the first three years , fun & play with friends of similar ages, acquaintance with nature, will plant the seeds of a good future human being.

Thoughts create habits, habits create character & thus the situation around us gets created. We can't change the conditions that we are in directly. What we have control upon is only our thoughts. If we have good thoughts, it will give birth to good habits, good habits will create good characters and thus good circumstances will get unfolded before us. Naturally, in order to have good circumstances, good realities, we at first must possess good thoughts in our minds. Thought is energy and thus will get manifested into realities. And if that be so, if we produce bad thoughts, it will only create bad realities for us & not the otherwise. Thoughts create signals and signals are received by the cell membranes & it is transmitted to the cell as a secondary signal & accordingly proteins behave. Some may ask this question that even if we produce positive thoughts it does not result in positive outcomes. Yes, only positive thoughts will not work. We must have constructive coherence of thoughts, feelings and emotions & then only it will work. Majority (almost ninety five percent) of our health related issues are not caused by the genetic faults but they are caused by our destructive thoughts, trauma and toxicity. Trauma & toxicity can be controlled to some extent but not fully but the main reason of generation of bad thoughts can be rectified because it's very much in our hands. One other thing is to be remembered that what we give to other's comes back to us in a multiplied way. So, in order to get love & respect in our life, first we have to give it to others. It is now proved beyond doubt that it's the environment i.e., epigenetic which controls the biology of our life.

If we accept the science & scientific facts then we have to accept that this universe was created through Big Bang & it was created from a single point. If that is so, then we all are products of a single point. Now, if we accept that,

then it can well be said that we don't have any difference between us, we are all same & one. So, there is no reason of infighting, animosity, ugly unholy competition, bloodshed, madness in aggression. We can't have anything other than cooperation replacing ugly competition, if we want this earth to be peaceful & sustainable. We are made up of colony of bacteria inside us, five times to the number of cells that we have. If we have fifty trillion cells, we have two hundred fifty trillion bacteria. Colony of cells was created to survive the onslaught of evolutionary process. Cells will remain healthy, if they are in constructive coherence. In the similar way, human race will survive, if there is constructive coherence amongst us. We have to think about cooperative survival replacing ugly thought of survival through competition. There is room for everyone; we just have to think that there are immense unexplored possibilities. The need of the hour is replacement of the word competition by cooperation.

Maximum portion of our body is water only, just like the surface of the earth. So the water that we are drinking should be in constructive coherence with the water inside our body. That requires drinking ideal water (the true spring water having a temperature of four degree centigrade). Anything produced in nature devoid of poisonous insecticides/pesticides is good for health and most of that coming through the manufacturing process is not safe for human consumption. Diverse naturally grown grains, fruits and vegetables are good for health. Incentives are to be given to grow crops organically, which is very much possible and has already been proved by many farmers without sacrificing productivity & this will ensure good nourishment for kids & adults both. Rivers are the arteries of earth & water is blood to earth. Plant tress to save rivers & restore full hydrological cycle as we have already entered into half hydrological cycle. Tree is life, no tree, no life. incuicate the habit of exploring the nature into the minds of the child & help them getting acquainted with nature & its diversity, which will ensure their integration with it & this love for nature & its preservation will develop automatically from early childhood. Encourage them to plant trees & nourish the trees, so that, they feel in constructive cohesion with nature.

Playground is health: physical, mental & social. Ensure that every child gets an opportunity to play with friends without creating a bottleneck of social identity.

Conscious endeavor of creating an atmosphere of self exploration & quest of knowing, formation of habit of asking questions, inquisitiveness & learning

through exploring on their own with assistance of positive correct input of elders will help the child to grow slowly but steadily into a potential future good human being. A positive constructive atmosphere with encouragement will build confidence in the child & imbibe the child to explore more. Happiness and satisfaction, love and respect for self and for others is the ultimate parameter of success of a human being.

Going beyond the traditional education system, encouragement of the child in raising questions like why and how & giving them confidence is our job. Science has to be related with daily life realities. In the era of internet and living in digital world, gaining knowledge has become so very easy and lack of knowledge is just not possible, unless, we block our quest. The world is in our hand now. We just need to use the technology properly. Proper infrastructure has to be provided and it has to be made available to the remotest corner of the country of the same quality and for free to the students. Panchayats can play a big role here by creating a library cum reading facility with fiber optics 50 mbps broadband connectivity and Desktop PCs, which can be utilized by students for free twenty four hours in a secured and noise free atmosphere, sufficient in number to cater to the traffic of students at any point of a particular locality. This will go a long way in the making of a learned future individual.

The question remains as how to spread the idea into masses and make them realize the importance of proper child upbringing and assist them to learn the way to ensure it. I know I can play my little role by writing a book in local language and so is the responsibility of all of us to spread the idea nicely.

Coming to the next big and most vital space of education which is guaranteed free and compulsory by the constitution (Eighty-sixth Amendment) Act, 2002 inserted Article 21-A in the Constitution of India for the children in the age group of six to fourteen years as a Fundamental Right). What is missing however the same standard quality of education at every place is and that too only through public institutions, eradicating possibilities of differentiation based on riches and locations at the very early age. I am no expert of either constitution or law but I would definitely desire to have same standard and quality of education at every nook and corner of the country and this is now possible with the use of digital technology & this can only ensure fundamental right of same quality standard education everywhere thus ensuring real equality.

Who can be considered for becoming a teacher? The person who has the real passion for teaching, one who qualifies a certain minimum standard to become

a teacher and who is psychologically fit to become one, can only be considered to become a teacher. The noise and bias of selection can be eradicated through a system of selection by four independent boards interviewing the candidate separately and in the same board also the individual members are not allowed sharing of their evaluation with each other and combing all the scores by a separate neutral independent body with full transparency. We cannot and should not ruin the child and thus the prospect of a good future citizen by giving preference to a wrong candidate aspirant for the job ruining the prospects of thousands of aspirant children and if we do it, we are just doing a social crime AND IS THE BIGGEST CRIME DONE BY US TO THE SIOCIETY. At some point we all have to realize that we should ensure a rich inheritance of citizens for our beloved country and this is required more so to save this planet.

Every child is full of potential & can excel in one or more area & we just need to create a congenial atmosphere of encouragement and learning through self exploration of this world by the child. We should ensure that there is no burdening of the child with home task, no single class duration beyond thirty minutes & there is a compulsory break of fifteen minutes for playing in between two consecutive classes to facilitate starting of the next class with a fresh mind. Facilities of indoor and outdoor games, gardening, an atmosphere of natural landscape in the surroundings and facilities for having hands on experience with all possible types of jobs that a child will be exposed to or will be required to do in future are to be provided in the schools. In this direction, we can learn and adopt the model used by Finland which is at the top of education system beating the rich developed nations. The need to search good schools, good home tutors, should not aríse at the end of the parents if we can provide same quality of education in every school. Books and uniforms are to be made available free by the schools and books are not to be taken at home till the age of twelve years upto the class of six, which may be brought under primary section. This will make class one to class six in one bracket morning session and seven to twelve in another bracket in day session. This will stagger many things and ease out many problems.

The standardization of school infrastructure having the same facilities throughout the country with abolition of all private setups or making private set ups public at least upto class six is an urgent need of the hour to create a homogeneous society, which will ensure abolition of all possibilities of creation of disparities amongst children at their tender age, due mainly to economic

disproportionate status. Equality has to be ensured at least in the beginning periods of a child's life to create a sense of belongingness in this country; else, we have to pay a heavy price in future. Discrimination in society based on economic conditions, religion, caste etc has to be routed out from the minds of the child & once we can ensure this at the primary level, we can expect a better future for the country.

We have examples in our country of doing great works in Childs development by great individuals without any institutional support at the primary stages & we can learn & collaborate with them to extend the same in our area. The work done by Mr. Satish Sharma in Haryana in his village school is a glaring example of this. His own child Kautilya Pandit is already a celebrity not only in our country but outside also & he has done this miracle with almost all the children of that school. You take anyone from that school & the child will prove his brilliance. This is possible & we have to make it a reality in every school, in every child. (Kautilya Pandit was born on 12 December 2007 in Kharhar village of Haryana, India. Her father name is Satish Sharma. He did his schooling at SD Harit Modern School located in Kohand village. This school is executed by his father itself.)

Every school should have a game teacher, a music teacher, and skilled technicians to assist the child to learn different crafts. Every child should be taught three languages in a functional way, so that, he can read and talk in that language (Mother Tongue, English & Hindi) & this can easily be done. It has been proved that a child can learn upto three languages easily by the age of seven.

Digital literacy is a must these days and we can't think a step forward in future without knowledge of computer & programming & the Government may think in terms of collaborating with Edutech companies in this field to impart computer literacy to the students. We can explore the idea of providing zero interest loan with a repayment schedule of twenty years to the parents of each child (The EMI will not be more than hundred rupees per month) with fifty percent capital cost to be borne by the government to buy computers & work out an agreement with BSNL to provide 50 mbps broadband fiber optics Ftth connection to every child with a cost of hundred rupees per month, which may be paid by the government. This will go a long way to help them grow big in life, because, we can explore the world if we have computer and fiber optics network. I had prepared a proposal for a CUG scheme between Landline &

Mobile connectivity with BSNL while working as e - governance Nodal Officer of my organization & this opened a new era reducing cost drastically and ensuring minimization of lot of noise & biases in the systems. The full potential of the scheme could have been exploited with engagement of entire government with the same scheme & bringing in fiber optics network in the ambit of the scheme.

Students are only to be evaluated regularly with monthly tests & we have to get rid of final exams & special care has to be arranged for the comparatively weak students & the benchmark has to be set for standard of learning by each child having not more than ten percent difference between the best & the worst student & there should be a threshold standard of learning for all the students. Teacher's performances are to be judged based on the performances of the students & they are to be given respect & free hand with completely free & fair environment of teaching without any interference of outsiders. We can think for making a masters degree qualification compulsory for becoming a teacher or send them for doing one in turns during service period. We can also consider taking the help of retired professionals who will love to volunteer once in a week to impart education in schools. This model has been used by Narendrapur Ramkrishna Mission successfully. Now a day's retired people are keeping healthy almost till a decade after retirement & instead of sitting idle they will love to volunteer to tide over the shortage of teacher or bringing in new thoughts into teaching. Standardized Test modules are to be designed for testing the skills of the students & the same process of evaluation is to be made compulsory in every school.

We need to build a thinking sensible society. I will end by some ideas of thinking.

Why we can't live for a thousand years?

Why is the number of heartbeats in a life span roughly the same for elephants, mice, and all mammals, namely about 1.5 billion?

Why do we get relatively fewer tumors than mice, but whales get almost none?

Why does a river meander?

Why boulders are not seen in south Bengal Rivers?

Where from the boulders have come?

These are only thoughts to initiate a thinking process in the minds of the citizen & help them come up with new ideas so that we can set right our system of child development.

✠✠✠✠✠

বাংলা প্রবাদে নারী প্রসঙ্গ

প্রমোদ নাথ

বাংলা লোকসাহিত্যের অন্যতম সমৃদ্ধি আঙ্গিক হল প্রবাদ। অন্যান্য সকল বিষয়ের মতোই প্রবাদের সঙ্গে নির্দেশ করাও অত্যন্ত কঠিন। পৃথিবীর সব জনগোষ্ঠীর প্রবাদের মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে।

ইংরেজিতে প্রবাদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে - A Proverb is a short sentence based on Long experience. অর্থাৎ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে যদি সীমিত পরিসর বাক্যে প্রকাশ করা হয় তবে তাই প্রবাদবলে গৃহীত হয়। প্রবাদের মূল আকর্ষণ এতে প্রকাশিত সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা। পাঠক বা শ্রোতা তার ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতার সাযুজ্যে স্বভাবতই আকৃষ্ট হয় এবং যে অভিজ্ঞতার কথা সে ঠিকমত প্রকাশ করে উঠতে পারছিল না, প্রবাদে তাকেই বাগময় হতে দেখে সে প্রবাদকেই তার বক্তা হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। প্রবাদ হয়ে উঠে তার মুখপাত্র স্বরূপ। প্রবাদের এই সর্বজন গ্রাহ্যতা প্রবাদের একটি বড় বৈশিষ্ট্য (বঙ্গীয় লোক সংস্কৃতি কোষ, সম্পাদনা ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী)।

দার্শনিক বেকন বলেছেন- একটি জাতির প্রতিভা বুদ্ধিমত্তা এবং আত্মা সেই জাতির প্রবাদের মধ্যে আবিস্কৃত হয়।

বঙ্গীয় শব্দ কোষ গ্রন্থে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শব্দটি প্রসঙ্গে বলেছেন - পরস্পর কথোপকথন সম্ভাষন, পরম্পরাঘাত অন্যান্য স্পর্ধা, লোকাপবাদ, লোকনিন্দা, পরম্পরাগত বাক্য প্রসিদ্ধ লোকবাদ, কিংবদন্তী, জনশ্রুতি ইত্যাদি অর্থে প্রবাদ শব্দটি প্রযুক্ত হয়।

রাজশেখর বসু চলন্তিকাতে আরোও যুক্ত করেছেন- উক্তি আখ্যান, বাগ্মিতা, ভাষণ গৌরব, চলতিকথা, জনশ্রুতি ইত্যাদি শব্দ গুলো যা প্রবাদ শব্দটির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব।

আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রবাদের সংজ্ঞার উল্লেখ করেছেন - প্রবাদ গোষ্ঠী জীবনের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম সরস অভিব্যক্তি। সংজ্ঞাটি প্রবাদের অনেক কিছু বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরতে পেরেছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রবাদের মাধ্যমেই প্রকাশ পায় সংক্ষিপ্ত সরল ভঙ্গিতে জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। জীবন অভিজ্ঞতার নিটোল বাক মুর্তি প্রবাদ। ছোট ছোট প্রবাদের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে একটি দেশ, একটি জাতির কৃষ্টি সংস্কৃতির সুস্পষ্ট প্রকাশ। প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা কালের কোষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে প্রবাদে পরিণত হয়।

প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে আজ অবধি সাহিত্যে প্রবাদের অবাধ বিচরণ। সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাস ভাসের কাছে প্রবাদ তৎকালীন লোক জীবনের অমুল্য অভিজ্ঞান। বাংলা ভাষার প্রায় জন্ম-লগ্ন থেকেই রচিত বৌদ্ধ গান ও দোহার মধ্যে ব্যবহৃত প্রবাদে সেই

যুগের সমাজ জীবন জীবিকার পরিচয় পাওয়া যায়।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের অভিমত দিয়েই প্রবাদ বিষয়ে আলোচনা শেষ করছি। বিস্তৃততম জীবন অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম সাহিত্যিক প্রয়াসই হল - প্রবাদ বা প্রবচন।

নারী ও পুরুষ উভয়কেই নিয়ে লোক সমাজ। প্রবাদে যেমন নারীর কথা বলা হয়েছে, তেমনি বলা হয়েছে পুরুষের কথাও। আমাদের আলোচ্য বিষয় - বাংলা প্রবাদে নারী প্রসঙ্গ। স্বাভাবিক ভাবেই প্রবাদে যেখানে নারীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে সেই সব প্রবাদ নিয়েই আমাদের আলোচনা। দৈনন্দিন জীবনে নারীকে সাধারণত ভাসুর, শ্বশুর, দেওর, ননদ, নন্দাই, শাশুড়ী এদের নিয়েই বিবাহিত নারীর সংসার। তাই প্রবাদে এদের প্রসঙ্গ এসেছে বারবার। দাম্পত্য জীবনে কোন অবস্থাতেই সতীনের অবস্থানকে মেনে নিতে পারেনি কোন বিবাহিত নারী, পারা সম্ভবও ছিলনা। দুঃখ কষ্ট, দারিদ্র্য পীড়িত জীবন স্বীকার করা গেলেও সতীনের অবস্থানকে মেনে নিতে পারেনি কোন নারী সঙ্গত কারণেই। বাংলা প্রবাদেও তার প্রতিফলন দেখা যায় বিশেষ ভাবে।

(১) একা ছিলাম ঘরের মাথার ঠাকুর, সতীন এলো আস্তাকুড়ের হলাম কুকুর।
(২) যমকে ভাতার দিতে পারি, সতীনকে তবু দিতে পারি।
(৩) হাতা, হাতা, হাতা, খা সতীনের মাথা।
(৪) অনাথ কেটে বনাত করি সতীন কেটে আলতা নরি।
(৫) আন সতীন তবু সয়, বোন সতীন কভু নয়। ইত্যাদি।

নারীর প্রতি প্রেম নিয়েও এসেছে নানা প্রবাদ। এমন কিছু প্রবাদ রয়েছে যেখানে স্বামীই মুখ্য হয়ে এসেছে এই সব প্রবাদে নানা ভাবে স্বামীকে সম্বোধনও করা হয়েছে।

(১) আমি খাই ভাতারের ভাত তোর কেন গালে হাত।
(২) এক ছাড়া নেই গতি, সেই মোর প্রাণ পতি।
(৩) আপনি রাঁধি আপুনি বাড়ি, মোর সায়োমী খায় পাড়াপড়শী মাগীগুনা চোখ পাকিয়ে ছায়।
(৪) ভাত দেওয়ার ভাতার নয় কিল মারার গোঁসাই।

প্রবাদে নারীর গুনকীর্তন যেমন আছে, তেমনি তাদের চাল-চলন নিয়েও প্রচলিত আছে নানা প্রবাদ। যেমন –

(১) ভাত খাই ভাতারের গুণ গাই নাগরের।
(২) নারী নরের মরণ ফাঁদ।
(৩) যুব কালে রঙ্গ করে বৃদ্ধ কালে সতী।

নারী শিক্ষাকেও প্রবাদে কটাক্ষ করা হয়েছে এক সময়ে – প্রবাদে তার উল্লেখও পাওয়া যায়। –

(১) মেয়ে যত পাশ দেবে, মাথায় তত চড়ে বসবে।
(২) স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী, শিখলে লেখাপড়া হবে বাড়াবাড়ি।

সংসারে শাশুড়ী ও ননদের সাথে সম্পর্কের টানা পোড়ন নিয়েও প্রচলিত আছে নানা প্রবাদের। কখনও ননদ, আবার কখনো শাশুড়ী নিয়ে প্রচলিত প্রবাদের ব্যবহার দেখা যায়।

(১) ননদিনী রায় বাঘিনী, দাঁড়িয়ে আছে কাল সাপিনী।
(২) ননদিনী যদি মরে সুখের বাতাস বইবে গায়।
(৩) দেখে শুনে বড় ঘরে বিয়ে দিলো বাপে এখন মরি জা আর ননদের চাপে।
(৪) শাশুড়ী মল সকালে খেয়ে দেয়ে যদি বেলা থাকে তো কাদবো আমি বিকালে।
(৫) ঠাকরুনের গর্ভ চমৎকার/বিহায়ছেন এক বাদর অবতার।

বিবাহের পর নানা বিষয়েই পুত্র জননী অপেক্ষা স্ত্রীর উপর নির্ভর করে স্বাভাবিক ভাবেই। জননী তখন নিজেকে অবাঞ্ছিত ভাবেন সংসারে পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে সহজ ভাবে মেনে নিতে পারেন না - প্রবল ভাবে বধুর বিরোধী হয়ে উঠেন। প্রবাদে সে বিষয়েও তার প্রতিফলন দেখা যায় –।

(১) বউয়ের চলন বলন কেমন, তুর্কী ঘোড়া যেমন।
(২) বউনারে বউনা, গরল ডাকিনী।
দিন হলে মানুষের ছা, রাত হলে বাঘিনী।

অলংকারের প্রতি নারীর আকর্ষণ স্বাভাবিক ভাবেই উল্লেখের দাবী রাখে। পতি প্রেমের পরেই নারী জীবনে অলংকার প্রিয়তা দেখা যায়। এই বিষয়ে প্রবাদেও উল্লেখ পাওয়া যায়।

(১) এমন গায়ে বাস করি
একঘর স্যাকরা নেই যে / একজোড়া মল পরি।
(২) কত সাধ যায়রে চিতে, মলের আগে চুটকি দিতে।
(৩) ভাত পায়না ভাতার চায়, থেকে থেকে গয়না চায়।

নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও নানা জটিলতার মধ্যেও নারী জীবনের মূল লক্ষ্য, নিজের সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় রাখা। প্রবাদের ভাষায় তার এই কামনা প্রকাশিত হয় এই ভাবে...।

(১) যেখানে সেখানে থাকুক রাম / সিঁথের থাকুক এরোত নাম।

প্রবাদের মধ্য দিয়েই নারী জীবনের সামগ্রিক দৃষ্টি ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় – সহজেই যা অন্যত্র পাওয়া যায় না।

তথ্য সূত্র – (১) প্রবাদ প্রসঙ্গ – সম্পাদক বরুণ কুমার চক্রবর্তী (২) বাংলা প্রবাদে স্থান কাল পাত্র – বরুণ কুমার চক্রবর্তী (৩) বাংলা প্রবাদে নারীমন – জয়শ্রী ভট্টাচার্য।

✽✽✽✽✽

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ড. বাসুদেব রায়

জুন মাসে জন্মগ্রহণকারী কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে যার নাম প্রথমেই চলে আসে তিনি হচ্ছেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বমহিমায় দেদীপ্যমান বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৩৮ সালের ২৬ জুন উত্তর ২৪ পরগণা জেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দু'জন স্নাতকের অন্যতম হচ্ছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। স্নাতক হয়ে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে যোগদান করেন। মৃত্যুর ৩ বছর আগে ৫৩ বছর বয়সে ১৮৯১ সালে তিনি ব্রিটিশের চাকরি থেকে স্বেচ্ছা-অবসর গ্রহণ করেন।

যুগসন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১১-১৮৫৯)-এর সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর'-এর মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'ললিতা ও মানস' একটি কাব্যগ্রন্থ। উপন্যাস লেখা শুরু করার পর তিনি আর কবিতার দিকে ফিরে তাকাননি।

বঙ্কিম-প্রতিভা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারাকে সাঙ্গীকৃত করেছিল বলেই বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে তাঁর খ্যাতি যুগপৎ স্রষ্টা ও সম্পাদক হিসেবে। তিনি একইসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ উপন্যাসের স্রষ্টা এবং পাশাপাশি আধুনিক বাংলা সাময়িক পত্রের পথিকৃৎ 'বঙ্গদর্শন'(১৮৭২)-এর সম্পাদক।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরেই বাংলা উপন্যাস শৈশব থেকে যৌবনে উপনীত হয়। তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র মোট চোদ্দোটি উপন্যাস রচনা করেন। সেগুলোর মধ্যে সাতটি ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণে রচিত। বাকি সাতটির মধ্যে দুটি তত্ত্ব ও দেশাত্মবোধক উপন্যাস এবং পাঁচটি সমাজ ও গার্হস্থ্যমূলক উপন্যাস।

বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক সমালোচনা রীতির পথিকৃৎ বলা হয়। তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' নামক গ্রন্থে সংকলিত আলোচনা গুলো উপরোক্ত মতের সাক্ষ্য বহন করে। পত্রিকা সম্পাদক হিসেবে নতুন লেখক সৃষ্টিতেও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর লেখা 'Rajmohan's Wife' ইংরেজি ভাষায় ভারতীয় লেখকের লেখা প্রথম উপন্যাস।

বঙ্কিম-প্রতিভা বহুমুখী। বঙ্গদর্শন-এর মাধ্যমে তিনি বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে আরও বিভিন্ন ভূমিকায় আবির্ভূত হন। উপন্যাসের পাশাপাশি তিনি লেখেন ইংরেজি ও বাংলায় অসংখ্য প্রবন্ধ। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে যতটা সফল, প্রবন্ধেও ততটাই। বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনে তাঁর বিরাট অবদান রয়েছে। ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটিতে 'বন্দেমাতরম' গানটি যুক্ত হয়েছিল। সেজন্য দেশপ্রেমিকদের কাছে এক সময় এই গ্রন্থটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

সুদীর্ঘ কাল সাহিত্য-সাধনা শেষে ১৮৯৪ সালের ৮ এপ্রিল ৫৬ বছর বয়সে কলকাতায় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনাবসান ঘটে।

*****

মহামারী বা অতিমারি ও সাহিত্য

অর্ণব সেন

অনিবার্য মৃত্যুকে অস্বীকার করে প্রাণের জন্ম / আবার জলের অপর নাম জীবন / জল শব্দের মধ্যে লুকিয়ে আছে বর্ণ 'জ' আর 'ল' – জন্ম আর মৃত্যু। 'জনমত' শব্দটি অমর / চিরকাল বেঁচে থাকবে / স্থান, কাল, পাত্র, পারিপার্শ্বিকতা ও যুগের তাগিদে বহিঃপ্রকাশের ভিন্নতা ও বৈচিত্র হতেই পারে। 'জনমত' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা কাল (ইং) ১৯২৪ সাল, বাংলা ১৩৩১ থেকে আজও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। 'জনমত' পত্রিকাটি সাপ্তাহিক ও শারদীয়া সংখ্যা আজও বেঁচে আছে নানা ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করে। 'জনমত' সারা বাংলার একটি প্রাচীনতম পত্রিকা। করোনা আবহে এবারও প্রকাশিত হচ্ছে ৯৭তম শারদীয় সংখ্যার। ১০০ বর্ষ সংখ্যা শতবার্ষিকী বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশিত হবে এই স্বপ্ন, আশা ও বিশ্বাস রাখি।

করোনা আমাদের সব মানুষের জীবনে এনেছে আতঙ্ক আর মৃত্যুর সংকেত। ২০১৯ সালের গোড়ার দিকে যখন প্রথম আমরা সংবাদমাধ্যমে খবরটা পাই তখন আমরা ভেবেছিলাম এই অসুখটা ইউরোপ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান এমনকি কিছু দূরের দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের দেশ নিরাপদে থাকবে। আমাদের ধারণা 'মিথ্যা' প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বায়ন পৃথিবীকে ছোট করে দিয়েছে। ঘরে বসে আমরা অনেক দূর দেশের ছবি দেখি। জিনিসপত্র পেয়ে যাই, অনেকে আকাশপথে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ইংল্যান্ড থেকে চলে আসেন ভারতে। এখান থেকে চলে যান আমেরিকায়। আসলে করোনাও বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়তে জানে। বিশ্বজোড়া ক্রাশকে উপেক্ষা করবে কে? চীনের উহান থেকে মাংস, মাছ রপ্তানি হয় ইতালিতে। ইতালিতে করোনা অদৃশ্য থাকায় মৃত্যু-মিছিল দেখা দেয়। বাড়ির পর বাড়ি খালি হয়ে যায়। মানুষ বড় অসহায়। বিজ্ঞান যত এগিয়েছে, মানুষ হিসেবে আমাদের গর্ব হয়। বহু ভয়ঙ্কর অসুখ এখন সেরে যায় চিকিৎসায়। মানুষ পা ফেলে মহা-শূন্যে চাঁদের দেশে। টিবি রোগ এখন আর ভয়ের নয়। চিকিৎসায় সারে। তবুও সুকান্ত ভট্টাচার্য্যর সময় ওষুধ ছিল না। ১৯৩৯ সালে অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার হয়েছে। ল্যাবরেটরীতে সম্যইহাস্তাহ উদ্বেগে কিন্তু তার আগেই তো কত মানুষ মৃত্যুকে বরণ করেছেন।

এভাবেই মহামারী, অতিমারী মানব সভ্যতাকে বিপন্ন করেছে বারবার। ইংল্যান্ড ইউরোপে। আমাদের দেশে কলেরা মহামারীতে গ্রামের পর গ্রাম শহরের পর শহর খালি হয়ে গেছে। ছোটবেলায় আমি দেখেছি বর্ধমানের কাছেই কাঞ্চননগর জনশূন্য। বিশাল বিশাল বাড়ি পরিত্যক্ত, শূন্য। একদিন ইতালির মিলান শহর বৃটেনের লন্ডন এভাবেই আক্রান্ত হয়েছিল। কলেরা, প্লেগ বা সার্স ফ্লুতে। শুধু সার্স ফ্লুতেই পাঁচ কোটি মানুষের প্রাণ যায়। অনেকে মনে করেন, মহামারী বা অতিমারি আসে একশ বছর অন্তর। ভারতেও ঘটেছিল ফ্লুর আক্রমণ

১০০ বছর আগে। আবার কুড়ি হাজার বছর আগে এসেছিল করোনা।

প্রতিষেধক হীন পৃথিবীতে অসহায় মানুষের মৃত্যু মিছিল দেখেছে যারা তারাও বেঁচে নেই। তবে এবার মানুষ বিশ্বায়নের যুগে দাঁড়িয়ে খানিকটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চাইছে। তবে রোগী নয় রোগকে ঘৃণা করতে হবে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন কথাটা সংশোধন করে একটি সংস্থার শ্লোগান শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন। আমরা এখন চুপচাপ বাড়িতে বসে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকি। মনে পড়ে সেই ২৩শে মার্চ ২০২০ কুড়ি লকডাউন ঘোষণার দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘোষণা 'লকডাউন'। একাধারে জীবন ও মৃত্যু সংকেতেরই এক ঘোষণা।

সুদূর অতীতকে ধরে রাখে ইতিহাসের সংকেতবহ রচনা আর সময়ে তাৎপর্য বহ উপন্যাস। মহামারী চিহ্ন বহ দুর্ভিক্ষের ছবি আছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে, শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাসে, সুরেশ প্লেগ রোগীদের সেবা করতে গিয়ে প্রাণ দেয়। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র বর্মার প্লেগ মহামারীর কথা লিখেছেন। এখানে জাহাজ যাত্রীদের কোয়ারান্টাইনের রাখার কথা আছে। বিদেশি লেখকদের মধ্যে ডানিয়েল ডিকো (১৬৫১-১৭৩১) লন্ডনের মহামারীর কথা লিখেছেন 'জার্নাল অফ দ্য ইয়ার' বইয়ে। জেক লন্ডন লিখেছেনঃ 'দ্য কার্গেট প্লেগ' বিখ্যাত মনস্তাত্বিকের রচনা। মহামারী নিয়ে বিশ্ব বিখ্যাত উপন্যাস অ্যালব্যের ফাসুর (১৯১৩-১৯৬০) 'দ্য প্লেগ'। এই উপন্যাসের পটভূমি ফরাসি উপনিবেশ আলজেরিয়া উপকূলের 'ওরান উরা' শহর। উপন্যাসটি প্রতীকী। প্লেগ এখানে নাৎসিবাদকে প্লেগের সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্লেগ নাৎসিদের মত লুকিয়ে থাকে বাড়ি ঘরে, বালিশ, বিছানার আড়ালে। হঠাৎ তার আক্রমণ ঘটে। জার্মানির হিটলার এভাবেই একদিন ফ্রান্স দখল করে নেয়। আক্রমণ করে রাশিয়া, ওরান শহর ও একদিকে মুক্ত হয় রোম থেকে উপন্যাসটি ট্রাজেডির মতোই পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। প্রাচীন চরিত্র ডাক্তার বার্নার্ড, তার পায়ের নিচে একটি মরা ইঁদুর মেনটাজয়, ইঁদুর সেই প্লেগের দূত। কয়েকশত উপন্যাস গল্প, লেখা হয়েছে। মহামারী নিয়ে। করোনা ২০১৯ নিয়ে লেখা হচ্ছে গদ্য, পদ্য। আমরা এক মনস্তাত্বিক সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে। কেউ কাজে যাবে না। কেউ স্কুল, কলেজ যাবে না। ট্রেন চলবে না।

বেকার চাকরি হারানো মানুষ অসহায় হয়ে আক্ষেপ করবে। লক্ষ লক্ষ বেকার মানুষ কাজ হারিয়ে বসে থাকবে। মানসিক অবসাদ বা গভীর বিষাদ বোধ তাদের ডাকবে হাতছানি দিয়ে। এই বিশ্বাদ বিশ্বের ছায়া তলে মানুষকে ভাবতে হবে। 'করোনা'কে পরাজিত করে মানুষ তার সভ্যতা কে বাঁচাবে। মহামারী আর মানুষের সভ্যতার বয়স প্রায় এক। তবে প্রতিরোধের শক্তি এখন মানুষের হাতে আছে। তবু দুঃখ আছে। আছে মৃত্যু। তবে আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে সভ্যতা ও মানুষ।

❋❋❋❋❋

জলঢাকা নদী পাড়ের সুইট মাগুরমারি

দেবব্রত চাকী

বাংলার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে নদী-নালা-খাল-বিল আধিক্য হেতু বিভিন্ন প্রজাতির মাছেরও প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। যে এলাকায় যে মাছ বেশি পাওয়া যায় সেই এলাকার সেই মাছের নামে পরিচিতি লাভ করে ও কালক্রমে স্থান নামে পর্যবসিত হয়। এটা সুপ্রাচীন পরম্পরা। তবে এক্ষেত্রে শুধু মাছ নয় অন্যান্য প্রাণীদের নামেও এই এলাকার অনেক স্থান বা জনপদের নামকরণ হয়েছে। মারি বা মারা যুক্ত স্থান নাম। যেমন পুটিমারি, বোয়ালমারী, শৌলমারী, মাগুরমারি, দাঁড়িকামারি, কৈমারী, খলিসামারি, চেংমারি, সাটিমারি, কুরসামারি ইত্যাদি মাছের নাম যুক্ত স্থাননাম। আবার বাঘমারা, হরিণমারা, শিয়ালমারা, ঘোড়ামারা, গরুমারা ইত্যাদি নামকরণও রয়েছে। যাইহোক প্রান্ত উত্তর বাংলার জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি থানা এলাকায় একটি বিস্তীর্ণ ভূভাগের নাম মাগুরমারি। জলঢাকা নদীর পূর্বপাড় বরাবর এই ভূভাগ বর্তমানে মাগুরমারি ১ নং ও মাগুরমারি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত নামে আখ্যায়িত। একদা এই ভূভাগ ওপনিবেশিক পর্বে মরাঘাট পরগনার অন্তর্গত ছিল। এই মরাঘাট পরগনার অভ্যন্তরে মাগুরমারি নামাঙ্কিত বেশ কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ড পরিলক্ষিত হতো যা আদতে ছিল পার্শ্ববর্তী দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের ভূভাগ বা ছিট মহল। পরবর্তীতে ১৮৬৯ সালে জলপাইগুড়ি জেলা আত্মপ্রকাশের পর এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলির জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি থানার মধ্যে কোচবিহার রাজ্যের ছিটমহল হিসেবে সরকারি নথিতে স্থায়িত্ব লাভ করে।

প্রশ্ন হল জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে পার্শ্ববর্তী কোচবিহার রাজ্যের স্বাধীনতা পর্বের জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর কোচবিহার জেলার ছিটমহল এল কি করে? এর উত্তরে যেটা বলতে হয় তাহল, এর উত্তর সম্পূর্ণভাবে নিহিত রয়েছে রাজন্য শাসিত কোচবিহারের রাজনৈতিক ইতিহাসের গর্ভে। সেই ইতিহাস স্বল্প পরিসরে ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। তবে প্রাথমিকভাবে যেটা বলা যায় তা হল প্রাক স্বাধীনতার পর্বে কোচবিহার-ভুটান সংঘর্ষ ও বিরোধ মীমাংসায় ইংরেজ হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে এই ছিটমহলের উৎপত্তি। ১৯০৩ সালে প্রকাশিত কোচবিহারের ইতিহাস বিষয়ক প্রামাণ্য গ্রন্থ হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী কৃত "The Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement"-এ উল্লেখ্ রয়েছে যে, কোচবিহার রাজ্যের সাতটি বিচ্ছিন্ন ভূ-খন্ড বা ট্রাকের উল্লেখযোগ্য একটি হলো 'বাইশচালা ট্যাক', যা পার্শ্ববর্তী জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি, গোসাইহাট ও গাদং তালুকের অভ্যন্তরে অর্থাৎ মরাঘাট পরগনার অধীনস্থ অবস্থান করছে। কোচবিহার রাজ্যের উত্তরের দুটি জনপদ মোরাঙ্গা ও ক্ষেতির ছয় থেকে আট মাইল দূর এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম বা ছিট মহল গুলির অবস্থান। ইতিহাস বলে মরাঘাট অঞ্চলে অবস্থিত এই ভূখণ্ডগুলি প্রধানত কোচবিহার মহারাজ কর্তৃক নির্মিত রাজপথ, পুষ্করণী, দেবমন্দির,

কাছারিবাটী, রাজগণের বসতি ইত্যাদি। ইঙ্গ-ভুটান যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে সন্ধিস্থাপন পর্বে যারা এই সমস্ত এলাকার অধিকার লাভ করেছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের প্রথম দশকে তৎকালীন কুচবিহারের মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে উপরোল্লিখিত এলাকার অধিকার লাভ করেছিল। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে ইঙ্গ-ভূটান সন্ধি (১৭৭৪ সাল) ও দিনাজপুর কাউন্সিলের বিচার (১৭৭৭ সাল) ভূটিয়াদের পক্ষে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করলেও ১৮০৯ সালে ইংরেজ কমিশনের মি. ডিগবীর সুপারিশ অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকাররা 'মরাঘাট' এলাকা কোচবিহার মহারাজকে প্রদান করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মি. ডিগবীর অস্থায়ী দেওয়ান হিসেবে রামমোহন রায় (পরে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হয়) ১৮০৯ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৮১১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময় তিনি কোচবিহার রাজ্যের রাজধানীতে এসেছিলেন। যাইহোক ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্ত ভূটিয়াদের মনঃপুত হয়নি। ১৮১৭ সালে ভুটানের দেবরাজা মি. ডিগবীর দেওয়ান রামমোহন রায় এবং মুন্সী হেমায়েতুল্লার বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের দোষারোপ করে মরাঘাট অঞ্চলের উপর পুনরায় দাবি জানাতে থাকে এবং সিদ্ধান্তকে পুনর্বিবেচনার আর্জি জানান। অতঃপর কোম্পানি কর্তৃপক্ষ রংপুরের জজ মি. স্কটকে হস্তক্ষেপের নির্দেশ দেন। মি. স্কট মরাঘাট সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মত প্রকাশ করেন এবং সরকারের নিকট তার সুপারিশ প্রেরণ করেন। মরাঘাট সম্পর্কে মি. স্কটের বক্তব্য হল, মরাঘাট রাজার প্রাপ্য হলেও তার কেবল 'মৌজা মরাঘাট'। মৌজা মরাঘাট হচ্ছে কতকগুলি চালা বা ভূমি খন্ডের সমষ্টি। এক্ষেত্রে বাইশটি চালার উল্লেখ পাওয়া যায়। মৌজা মরাঘাটকে বেষ্টন করে যে এলাকা তা গ্রের্দ মরাঘাট নামে পরিচিত অর্থাৎ পরগনা মরাঘাট। মি. স্কট দোর্দ মরাঘাট এলাকাকে ভুটানের দেবরাজের হাতে সমর্পণ করার জন্য সুপারিশ করেন। উল্লেখ্য মৌজা মরাঘাট নামক চালাগুলি গাদং, গোসাঁইহাট ও মাগুরমারি তালুকে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ ১৮১৭ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সিদ্ধান্তকৃত ভুটানি এলাকা গের্দ মরাঘাট অন্তর্গত বাইশটি চালাযুক্ত 'মৌজা মরাঘাট'-ই পরবর্তীকালে কোচবিহার মহারাজার ভূখণ্ড হিসাবে 'বাইশচালা ট্রাক' নামাঙ্কিত হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ১৮৬৪ সালে সমগ্র দুয়ার এলাকা ব্রিটিশ সরকারের হস্তগত হবার পর ১৮৬৯ সালে আত্মপ্রকাশ করে জলপাইগুড়ি জেলা। অতঃপর 'বাইশচালা ট্র্যাক' ব্রিটিশ বাংলার জলপাইগুড়ি জেলার অভ্যন্তরে কোচবিহার রাজ্যের ছিটমহল মর্যাদা লাভ করে। উত্তর স্বাধীনতা পর্বে কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলায় পরিণত হবার পর ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি বিজ্ঞপ্তির মধ্যে দিয়ে (Notification No. 2115 PL. dt 20 May 1955, Govt. of W.B. Home (Police) Department) কোচবিহার জেলার ৩৪ টি ছিটমহল জেলার সঙ্গে যুক্ত হয় যার মধ্যে কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা থানার অন্তর্গত মাগুরমারি নামাঙ্কিত সাতটি ছিটমহল (ছিট নং ১০৩ থেকে ১১১) জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি থানা এলাকায় যুক্ত হয়। বাকী সব ইতিহাস।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থ সমগ্র ঃ

ক) The Cooch behar State and its Land Revenue Settlement (1903) - H.N. Choudhury.

খ) প্রাচীন কোচবিহারের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত – স্বপন কুমার রায়।

গ) ব্রাত্যজনের বৃত্তান্ত ঃ প্রসঙ্গ ভারত-বাংলাদেশ ছিট মহল – দেবব্রত চাকী

ঘ) কিরাত ভূমি ঃ জলপাইগুড়ি জেলা সংকলন – সম্পাদক ঃ অরবিন্দ কর

❋❋❋❋❋

স্মৃতির সারণি বেয়ে নর্থবেঙ্গল ইউনিভার্সিটি ল'কলেজ ও জলপাইগুড়ি ল' স্টুডেন্টস ফোরাম

সুব্রত ভট্টাচার্য্য

উত্তরবাংলার 'আইন' সংক্রান্ত পড়াশোনার ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আইন মহাবিদ্যালয় এক উজ্জ্বল নাম। অবিভক্ত ভারতবর্ষে সেই ১৮৬৯ সালের পয়লা জানুয়ারি উত্তর বাংলার প্রধান জেলা সদরে জলপাইগুড়ি জেলার সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে ইংরেজ আমল এবং পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি – এই বিস্তীর্ণ সময়কালে জলপাইগুড়ি জেলা আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে উকিল, মোক্তারদের এক অসামান্য অবদান চোখে পড়ে। মূলত ধনাঢ্য বাবু উচ্চবর্ণ সম্প্রদায় থেকে এই উকিলবাবুরা উঠে আসলেও সামাজিক, প্রগতিশীল আন্দোলনে এই শিক্ষিত উকিলবাবুদের ভূমিকা এক দৃষ্টান্ত হিসেবেই দাঁড়িয়ে আছে এখনও।

একদিকে জেলাজুড়ে বিস্তৃর্ণ চা বাগানগুলোর হেড অফিস জলপাইগুড়িতে, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কেন্দ্রস্থল এর সাথে সাথে নানা সওদাগরী ও বেসরকারি কোম্পানির সদর দপ্তরও জলপাইগুড়ি শহরে। গোটা জেলার গ্রামীণ ক্ষেত্রে ধনী রাজবংশী সম্প্রদায়ের জোতদার, মহাজন, জেলা শহরে চা বাগান মালিক, প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তি, খানবাহাদুর, নবাব বাহাদুর, রাজপরিবার – সবকিছু নিয়ে এক রমরমা স্বর্ণালী সময়। স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতার আগে রাজশাহী বিভাগের প্রধান শহর জলপাইগুডি এবং স্বাধীনতার পর খন্ডিত জলপাইগুড়ি উত্তরবঙ্গ বিভাগের প্রধান সদর দপ্তর হওয়াতে ফৌজদারি এবং দেওয়াণী বিচারালয় মামলা-মোকদ্দমার পাহাড় লেগেই থাকত। তারও আগে সাবেক কোচ রাজ্যের কাছারিবাডি ও এই জেলা শহরে ছিল।

জলপাইগুড়ি শহরে আইনজীবী তথা উকিলদের সামাজিক সম্মান যে জায়গায় ছিল অবিভক্ত বাংলার অনেকখানেই তা ছিল না। আর্থসামাজিক গতিশীলতার ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষেত্রেও জলপাইগুড়ি আদালতে ব্যবহারজীবিদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

আমার ব্যক্তিগত ভাবে মনে হয় জলপাইগুড়ি জেলা শহরে এবং জেলা জুড়ে বিভিন্ন প্রধান প্রধান গঞ্জ এলাকাতে প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে আইন নিয়ে পড়াশোনা করে ব্যবহারজীবী হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করবার একটা স্বভাবজাত প্রবণতা ছিল। একটা সময় ছিল যখন কলকাতা ছাড়া আইন নিয়ে পড়াশোনা করবার সুযোগ উত্তরবঙ্গে ছিলনা। জলপাইগুড়িতে উচ্চশিক্ষার বিকাশ অন্যান্য জেলার তুলনায় কিছুটা দ্রুতগতিতে হলেও আইন মহাবিদ্যালয় স্থাপন করার উদ্যোগ দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে এবং পঞ্চাশের দশকেও নজরে পড়ে না।

আইন নিয়ে পড়াশোনো করে স্থানীয় আদালতে আইনজীবী হিসাবে পেশা গ্রহণ করবার ইচ্ছা থাকলে ছুটতে হত কলকাতায়। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন কলেজ প্রতিষ্ঠা হলে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। এখন ভাবতে অবাক লাগে মালদা থেকে জলপাইগুড়ি এই বিশাল এলাকায় আইন কলেজ স্থাপন হতে এত দিন কেটে গেল!

দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার শিবমন্দিরে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রথম আইন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও দার্জিলিং, শিলিগুড়ি এলাকা থেকে অনেক বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী জলপাইগুড়ি শহর ও জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভর্তি হয়েছিল ধারাবাহিকভাবে। এটা কি সেই পুরনো ট্র্যাডিশন ধরে রাখার প্রয়াস না অন্যকিছু - এই বিষয়টি নিয়েও বস্তুনিষ্ঠ অনুশীলন ও অনুসন্ধান প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক চালচিত্রে সত্তর দশক এক ঝড়ের সময়। শুধু পশ্চিমবঙ্গ বলাটা মনে হয় একদম ভুল হল - গোটা দেশ এবং পৃথিবী এই দশকে এক উত্তাল সময় প্রত্যক্ষ করেছে। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২, এই ছয় বছরের আগুন ঝরানো উত্তাল সময়ের ''এপিসেন্টার'' হিসাবে পরিচিত নকশালবাড়ির একদমই কাছে অবস্থিত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজ ও তার প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৭৪ সাল থেকেই এই সামগ্রিক এলাকার আর্থসামাজিক চিন্তা ধারা উৎসারণের এক এপিসেন্টার বললে মনে হয় ভুল বলা হবে না।

জরুরি অবস্থার দিনগুলাতেতে যে অদ্ভুত এক অবস্থা গোটা দেশে নেমে এসেছিল, তার ছোঁয়া উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও আইন কলেজে আছড়ে পড়েছিল।

আইন কলেজে ছাত্র রাজনীতি আর সাধারণ কলেজে ছাত্র রাজনীতির মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত মানুষজন গ্রাজুয়েট, পোস্ট গ্রাজুয়েট, ছেলেমেয়েরাই তখন ভর্তি হত। স্বাভাবিকভাবেই একটা পরিণত মনস্কতা ও সামগ্রিকতার ছাপ ছাত্র রাজনীতির মধ্যে ছিল। আবেগ ও রোমাঞ্চ এর উপর ভিত্তি করে আইন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা কমই ছাত্ররাজনীতিতে আসতো। আমাদের সময় আইনপড়া অনেক ছাত্রছাত্রী পরবর্তী সময়ে উত্তর বাংলার প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শ গত প্রচন্ড বিভেদ থাকলেও তা কখনো হানাহানি বা ব্যক্তিগত সংঘাতের পথে যায়নি।

তাছাড়া এই কলেজের প্রথিতযশা অধ্যাপকেরা যখন শ্রেণিকক্ষে আইনের নীরস বিষয়গুলো বোঝাতেন তখন তার সাথে সাম্প্রতিক সামাজিক পরিস্থিতি যেভাবে প্রেক্ষিতের সাথে উল্লেখ করতেন, তা এককথায় অভূতপূর্ব। সেই আলোচনাগুলো আজও যেন আমাদের নতুন ভাবে ভাবতে শেখায়।

সময়টা ছিল ১৯৭৮ সাল। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আইন মহাবিদ্যালয় এ ভর্তি হলাম। আইন মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত ছিল। সময়টা মে কি জুন মাস হবে। সেই সময় আইন মহাবিদ্যালয় পুরুষ ছাত্রাবাসের যাওয়ার আগে আর্টস বিল্ডিং এর নীচতলায় অর্থাৎ

গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত ছিল। আইন কলেজের পাঠের সময় ছিল সন্ধা ৫.৪৫ মি. থেকে রাত্রি ৮.৩০মি. পর্যন্ত।

এখন ডিপার্টমেন্ট অফ ল হিসেবে আলাদা নিজস্ব বিল্ডিং-এ সাউথ ক্যাম্পাসে অবস্থিত। এই অবস্থা ২০০০ সালে উন্নীত হয়।

১৯৭৪ সালে ইউনিভার্সিটি ল কলেজ নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন মাননীয় অম্লান দত্ত মহাশয়। পরবর্তীকালে প্রসাদ ঘোষ মহাশয় আসেন। যখন আইন মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন বিশ্ববিদ্যালয় আইন মহাবিদ্যালয় এর অধ্যক্ষ ছিলেন মাননীয় এস ব্যানার্জি মহাশয়।

পরবর্তীকালে বিচার বিভাগ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেপুটি রেজিস্ট্রার হিসেবে দেবব্রত পাল মহাশয় আসেন এবং তিনি ইউনিভার্সিটি ল কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। দেবব্রত পালের পর সি.পি. মিশ্র আইন মহাবিদ্যালয় এর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

জলপাইগুড়ি থেকে এই ইউনিভার্সিটি আইন কলেজে অনেক ছাত্র এবং ছাত্রী কঠোর পরিশ্রম করে যাতায়াত করতেন। অনেকের কথাই এখন মনে পড়ে। বরুণ দাশগুপ্ত (প্রথমে স্কুল শিক্ষকতা, পরে পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন এবং সর্বশেষে জয়েন্ট সেক্রেটারি পঞ্চাযেত এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং অবসর গ্রহণ করার পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত দপ্তরের সিনিয়র অফিসার হিসাবে আবার কাজ করেন এবং প্রভূত সম্মানের সাথে জলপাইগুড়ি কোচবিহার এবং বিভিন্ন জেলায় তিনি প্রশাসনে কর্মরত ছিলেন।) রাম অবতার শর্মা (জলপাইগুডি বার অ্যাসোসিযেশনে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে হিলা চা-বাগানে সিনিয়র ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি। আসাম, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির বিভিন্ন চা বাগানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এবং ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স এসোসিয়েশনের বীরপাড়া শাখার সাথে যুক্ত ছিলেন। আমাদের আজকে বলতে গর্ববাধে হচ্ছে তিনি চা গবেষক হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে চা-রত্ন সম্মান পেয়েছেন। চা পাতা, প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি বেশ কয়েকটি গবেষণামূলক বই লেখেন, যেগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়), প্রদীপ ব্যানার্জ (অত্যন্ত খুশি মেজাজের মানুষ ছিলেন। আমাদের বন্ধু স্থানীয় ছিলেন। শিরিষতলায় এক মেসে থাকতেন। মাঝেমধ্যে শনিবার, রোববার পড়াশোনা করার জন্যই মেসে যেতাম এবং খুব সুন্দর বোঝাতে পারতেন কোন জিনিস। পরবর্তীতে কিছুদিন জলপাইগুডি বার অ্যাসোসিয়েশনে যোগদান করেন এবং পরে স্মল সেভিংস অর্গানাইজার হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট-এর অধীনে কাজ করেন (প্রদীপ ব্যানার্জি আজ আমাদের মধ্যে নেই), সুবর্ণ রঞ্জন রুদ্র (রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের অধীনে জলপাইগুড়ি হসপিটালে কাজ করতেন। জলপাইগুড়ি আইন কলেজে অবৈতনিক লাইব্রেরিয়ান হিসেবে বহুদিন কাজ

করেছিলেন। জলপাইগুড়ি জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি সমাজ সেবায় যুক্ত।), সুনীল চক্রবর্তী (এল.আই.সি.-তে চাকরি করতেন এবং তিনি আজাদ হিন্দ পাঠাগারের সম্পাদক ছিলেন। জলপাইগুডিতে বুদ্ধিজীবি মহলে তিনি অত্যন্ত পরিচিত ছিলেন। জলপাইগুড়ি আইন কলেজের প্রাণপুরুষ ছিলেন। কিছুদিন জলপাইগুড়ি আইন কলেজে অধ্যাপনার কাজে যুক্ত ছিলেন। জলপাইগুড়ির বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। জলপাইগুড়িবাসী হিসাবে সুনীল চক্রবর্তীর জন্য গর্ববাধে করি।), নৃপেন্দ্র চন্দ্র সরকার (কর্মচারী আন্দোলনের সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত ছিলেন। জলপাইগুড়ি জেলা কো-অর্ডিনেশন অন্যতম প্রতিষ্টাতা কমিটির। সদস্য ও পরবর্তীতে সভাপতি ছিলেন। ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন। নৃপেনদার অভাব আজ বড় অনুভব করি। দৃঢ়চেতা মানুষ হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন। আজ এরকম মানুষের বড়ই অভাব। সেইসময় ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়োজিত করার জন্য তার উদার ও বলিষ্ঠ মানসিকতাকে আমি নমস্কার জানাই।), নিরঞ্জন চক্রবর্তী (মাস এডুকেশন ডিপারমেন্ট এ কাজ করতেন। এবং সর্বশেষে জয়েন্ট বিডিও পদে উন্নীত হন। নিরঞ্জন চক্রবর্তী আজ আমাদের মধ্যে নেই।), শ্রী কল্যাণ চক্রবর্তী (উত্তম), (সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কমিটির উচ্চ পদে আসীন ছিলেন। আইন কলেজের ছাত্র পরিষদের মূল সংগঠক ছিলেন। বর্তমানে কল্যানবাবু আমাদের মাঝে নেই।) স্বপন দত্ত (মালদা থেকে এসেছিলেন এবং জলপাইগুড়িতে থাকতেন। আমাদের সঙ্গে বাসে করে যেতেন এবং ল পাশ করার পরে তিনি বারে জয়েন করেন এবং পরে তিনি জুডিশিয়ারি সার্ভিস যোগদান করেন এবং বর্তমানে তিনি অবসর জীবনযাপন করছেন।)

প্রণব দাশগুপ্ত (পরবর্তীতে মৎস দপ্তরে আধিকারিক ছিলেন। বর্তমানে অবসর যাপন করছেন।) বিশ্বজিৎ বসু (বর্তমানে জলপাইগুড়ি জেলার একজন বরিষ্ঠ ব্যবহারজীবী), সুজিত ঘোষ, ওমরেল খেতাব আহমেদ (মৌলানিতে বাড়ি)। জলপাইগুড়ি কামারপাড়ায় এক মেসে থাকতেন। পড়াশোনায় খুব মেধাবী ছিলেন। আইনের স্নাতক হবার পরে জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হন। বর্তমানে বরিষ্ট আইনজীবী), মিতা চক্রবর্তী, রত্না আচার্যী (পরবর্তীতে সেচ দপ্তরে কর্মরত ছিলেন), বাসবী ঘোষ (শিক্ষকতায় যুক্ত ছিলেন), কিশোর মারোদিয়া (বর্তমানে বরিষ্ট ইনকাম ট্যাক্স আইনজীবী), অসীম সরকার (বর্তমানে বরিষ্ট ইনকাম ট্যাক্স আইনজীবী), মানবেশ চন্দ্র চক্রবর্তী (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য দপ্তরের অধীনে প্রশাসনিক পদে ছিলেন, অবসর গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে সামাজিক বিভিন্ন কাজে যুক্ত। কলেজ জীবনে স্টুডেন্ট ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন।) বাপি সরকার (বর্তমানে বাপি আমাদের মধ্যে নেই। কলেজে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখত), রাধেশ্যাম শর্মা (বর্তমানে বরিষ্ট ইনকাম ট্যাক্স আইনজীবী), বিষ্ণুপ্রসাদ আগরওয়াল, শ্রী বিনোদ শা, প্রভাস বোস (কিনুদা)

(বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স অফিসার হয়েছিলেন), শ্রাবণী চক্রবর্তী, এণাক্ষি ঘোষ, শেখর বাগচী, শ্রী রামগোপাল আগরওয়ালা (বর্তমানে হায়দ্রাবাদ থাকেন), দীনেশ পাল (সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের উপকার করার জন্য ভাবেন। বর্তমানে অবসর যাপন করছেন), সবিৎ কুমার গুহ (চা বাগানের কমী ছিলেন ও চা বাগিচা আন্দোলনের সাথে নিজেকে নিয়োজিত করেন। জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন), মানস গুহ (চা বাগানের কর্মী ছিলেন ও চা বাগিচা আন্দোলনের সাথে নিজেকে নিয়োজিত করেন। জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন), শচিন্দ্র নাথ লালা (আইন বিভাগে কর্মরত ছিলেন। জলপাইগুডি বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হয়েছিলেন এবং বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন।), যতীন্দ্র নাথ চক্রবর্তী (এল.আই.এই.সি.তে কর্মরত ছিলেন। জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হয়ে ছিলেন। এখন অবসর যাপন করছেন।), প্রেম চৌধুরী (জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হয়ে ছিলেন। বর্তমানে ব্যাঙ্গালুরু তে থাকেন।), অশোক পাল (এল. আই.সি.তে কর্মরত ছিলেন। এখন অবসর যাপন করছেন।), অরূপ বিশ্বাস (পরবর্তীতে এল. আই.সি.তে উচ্চ প্রশাসনিক পদে আসীন হন), জিমুত মোহন বসু (বিমল) (চা বাগিচার কর্মী ছিলেন) ও আরো অনেকে।

আমি যখন ১৯৭৮ সালে আইন মহাবিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি হলাম, তখন সঞ্জীব বসু (বর্তমানে জলপাইগুডি বার অ্যাসোসিয়েশন এ বরিষ্ঠ আইনজীবী এবং নোটারি), রাহুল হোড় (বর্তমানে জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশন এ বরিষ্ট আইনজীবী), পদ্মনাভ চক্রবর্তী (পরবর্তীতে শিক্ষা দপ্তরের কাজ করেন। বর্তমানে জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশন এ আইনজীবী) প্রত্যেকেই আমার কলেজ বন্ধু ছিল ও আইন কলেজ এ একবছরের সিনিয়র ছিল। রাম অবতার শর্মা, সুবর্ণ রঞ্জন রুদ্র, অশোক পাল প্রমুখ কলেজে আমার একবছরের সিনিয়র ছিলেন। সুব্রত সাহা (শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, মেখলিগঞ্জ আদালতে এ.পি.পি হিসেবে কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি আমাদের মধ্যে নেই।), বরুন দাশগুপ্ত, বিশ্বজিৎ বসু, প্রণব দাশগুপ্ত, সুনীল চক্রবর্তী আরো সিনিওর ছিলেন।

আরো মনে পড়ছে অনেকের কথা, বিজয় দত্ত (সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন এবং বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করছেন), স্বপন প্রসাদ রায় (জেলা সমাহর্তার করণে কাজ করতেন। বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করছেন), পুষ্প সরকার (শিক্ষা দপ্তরের কাজ করতেন), প্রফুল্ল সরকার, (ডিভিশনাল কমিশনার-এর স্টেনোগ্রাফার ছিলেন), অখিল রঞ্জন সরকার (এল.আই.সি-তে কর্মরত ছিলেন। এখন অবসর যাপন করছেন), শিবেন্দ্র তালুকদার (আইন স্নাতক হবার পর জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হয়েছিলেন) ও আরো অনেকের কথা।

জলপাইগুড়ি থেকে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপার্টে কর্পোরেশন

এর একটি বাস প্রতিদিন স্ট্যান্ড থেকে বিকাল ৪.৩০ মিনিটে রওনা হয়ে কদমতলা হয়ে যাত্রা করতো। আমরা সাড়ে পাঁচটার সময় পৌছে যেতাম আইন কলেজে। সামনেই ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিন ছিল। সেই ক্যান্টিনে আমরা এক কাপ চা খেয়ে যে যার ক্লাসে ঢুকে যেতাম একনাগাড়ে ক্লাস হোত, মাঝখানে কোন টিফিন ব্রেক বা রিসেস ছিল না। বাসটি দাঁড়িয়ে থাকতো আমাদের সামনে। ক্লাস শেষ হওয়ার পরেই আমরা এক কাপ চা ও টিফিন প্রায় গ্রোগ্রাসে গিলে বাসে উঠে পড়তাম এবং জলপাইগুড়িতে সাড়ে নয় টার মধ্যে পৌঁছে যেতাম, যদি না অন্য কোন কারনে বাসটি দেরি হতো। ফেরার পথে বাসটি ইউনিভার্সিটি থেকে রওয়ানা হয়ে শিলিগুড়ি থানার সামনে বাসস্ট্যান্ডে কিছুক্ষণ দাঁড়াতো। ওখান থেকে যাত্রী তুলে আমরা রওনা দিতাম। জলপাইগুড়ি থেকে এই আসা যাওয়ার পথে আমরা বেশির ভাগই স্টুডেন্ট ছিলাম।

একদিন জলপাইগুড়ি থেকে রওনা দেওয়ার সময় রাজগঞ্জে রাস্তার পাশে একটু দূরে কোন বাড়িতে আগুন ধরেছিল। এতদিন পরে আজকে মনে পড়ছে যে আমরা সমস্ত স্টুডেন্ট নেমে সেই বাড়িতে আমরা আগুন নির্বাপনে ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং আগুন নেভানোর পর আবার রওয়ানা দেই এবং সেদিন আমরা প্রায় এক ঘণ্টা দেরিতে কলেজে পৌঁছেছিলাম। দুটি ক্লাস করতে পারিনি। কোন কোন দিন এমনও হয়েছে যে রাস্তায় বাসটির চাকা পাংচার বা গাড়ি খারাপ হয়েছে, আমাদের বাড়িতে ফিরতে প্রায় মধ্য রাতে গড়িয়ে গেছে।

আজ অনেকের কথা মনে পড়ছে। নৃপেন্দ্র চন্দ্র সরকার, প্রদীপ ব্যানার্জি, কল্যাণ চক্রবর্তী (উত্তম), নিরঞ্জন চক্রবর্তী, শম্ভু ঘোষ ও আরো অনেকে, যারা আজ আমাদের মধ্যে নেই।

আমাদের কলেজে স্বনামধন্য কিছু শিক্ষক ছিলেন। প্রথমে স্মরণ করি জলপাইগুডির মাননীয় পরেশ চন্দ্র মিত্র মহাশয়, বীরেন বোস মহাশয়, বিভূতি ভূষণ ঘোষ মহাশয, শিলিগুড়ি থেকে মাননীয় গোপেশ চন্দ্র রায়, দিবিশ চন্দ্র রায়, স্বদেশ রঞ্জন সরকার, স্বপন কুমার সরকার, সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নির্মল কুমার মৈত্র, দেবব্রত পাল ও আরো অনেকে। সিনিয়রদের কাছে শুনেছি, সিকিম হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি সম্মানীয় আনন্দময় ভট্টাচার্য মহাশয় নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি ল কলেজে প্রথমদিকে পড়াতেন।

দেবব্রত পাল সিভিল প্রসিডুয়োর কোড, পরেশ চন্দ্র মিত্র হিন্দু পারিবারিক ও ইংলিশ সংবিধান, দিবিস চন্দ্র রায় ট্রানসফার অফ প্রপারটি অ্যাক্ট, হাইকোর্ট রুলস এন্ড সুপ্রিম কোর্ট রুলস, গোপেশ চন্দ্র রায় আই.পি.সি এবং এভিডেন্স অ্যাক্ট, স্বদেশ রঞ্জন সরকার কনস্টিটিউশন, ড্রাফটিং, স্বপন কুমার সরকার, ইন্ডিয়ান কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট, সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, বিনয় সাহা কোম্পানি আইন ও নির্মল কুমার মৈত্র আয়কর পড়াতেন।

পরেশ চন্দ্র মিত্র জলপাইগুড়িতে বামফ্রন্টের নেতৃত্বে ছিলেন এবং কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া মারক্সিস্ট এর একজন বলিষ্ঠ নেতা ছিলেন কিন্তু আমাদের ছাত্র এবং শিক্ষক এর সম্পর্কে কোন দিন রাজনীতি তিনি আনেননি। কোন ক্লাসে বা ক্লাসের বাইরেও তিনি রাজনীতি নিয়ে কোন কথা বলতেন

না। অনেকে জলপাইগুড়ি থেকে স্যারের সাথে গাড়িতে যেতেন এবং কোন সময় আমার সৌভাগ্য ও হযেছিল উনার সঙ্গে একসঙ্গে একই গাড়িতে আইন কলেজ থেকে জলপাইগুড়ি আসার সৌভাগ্য ও হয়েছিল। অধ্যাপক মহাশয়ের প্রাঞ্জল ও উদার কথাবার্তার মধ্যে আমরা অনেক কিছুই শিখেছি।

শিলিগুড়িতে আমাদের সহপাঠী এবং সিনিয়রদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে শ্যামল সেনগুপ্ত, বিপ্লব দাসগুপ্ত, কাঞ্চন রায়, শ্রীমতি গঙ্গোত্রী দত্ত (শিলিগুডি বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যা এবং একজন সিনিয়র আইনজীবী। তিনি শিলিগুড়ির মেয়র ছিলেন ২০০৯ সাল থেকে ২০১৪ সালের মে পর্যন্ত)। স্বপন কয়াল, আশীষ সিনহা, প্রবীর সিকদার, সদানন্দ পাল, প্রশান্ত জোয়ারদার, উষা রঞ্জন মৈত্র, শ্রী রতন বণিক প্রমুখ। সুহৃদ মজুমদার, অশেষ চক্রবর্তী মহোদয়গণ আইন কলেজ এ পড়তেন। বর্তমানে উভয়েই আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে বরিষ্ট আইনজীবী।

বিপ্লব সেনগুপ্ত ইউনিভার্সিটি ল কলেজে স্টুডেন্ট ইউনিয়ন এর সম্পাদক হয়েছিলেন। দীপঙ্কর ঘোষের কথা মনে পড়ে, আমাদের দু'বছর সিনিয়র ছিলেন। তিনি পরবর্তীতে শিলিগুড়িতে পি.পি. হয়েছিলেন এবং শিব মন্দিরে থাকতেন। তিনি অকালে প্রাণ হারান।

সেই সময় ছাত্র আন্দোলনে অনেকের কথাই মনে পড়ছে। ল' কলেজের সিদ্ধার্থ বিশ্বাস, রাম অবতার শর্মা, গঙ্গোত্রী দত্ত, পদ্মনাভ চক্রবর্তী, মানবেশ চক্রবর্তী, কাঞ্চন রায়, বিপ্লব সেনগুপ্ত, শ্যামল সেনগুপ্ত ইত্যাদি।

আইন কলেজ ইউনিয়নে সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছিলেন শ্যামল সেনগুপ্ত এবং সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন দীপঙ্কর ঘোষ। শ্যামল সেনগুপ্ত পর পর দুই টার্মে অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে দুইবার সেক্রেটারি হয়েছিলেন। জলপাইগুড়ির বিমলেন্দু দে সহ-সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি চা-কর বীরেন ঘোষের স্টেনোগ্রাফার ছিলেন।

পদ্মনাভ চক্রবর্তী তিনবার ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়েছিলেন এবং পরপর দুবার ম্যাগাজিন সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রণব দাশগুপ্ত ও সহসভাপতি হয়েছিলেন। সমকালীন ছাত্র ইউনিয়নের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ছিল চিপ ক্যান্টিন, স্টুডেন্টস এইড ফান্ড, ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা গ্রহণ। পদ্মনাভ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রথম ম্যাগাজিনের নাম ছিল "স্ফুলিঙ্গ"।

ইউনিভার্সিটির ললিত বিহানী, যদিও সিনিয়র ছিলেন, তপন দাস (শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ করে বর্তমানে ইসলামপুরে আছেন।) অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ ছাত্র নেতৃত্বের কথা স্মরণ করছি।

ইউনিভার্সিটি ল কলেজ জীবনে প্রফেসর দেবব্রত পাল-এর পরিচালনায় আমরা প্রায় ৩০ জন পুরীতে গিয়েছিলাম। কিশোর মারোদিয়া, শিবেন্দ্র তালুকদার, বিপ্লব সেনগুপ্ত, গঙ্গোত্রী দত্ত সহ অনেকে একসাথে গিয়েছিলাম। আমরা সকলেই ইয়ুথ হস্টেলে ছিলাম ও এই ট্যুর উপভোগ করেছিলাম।

মানবেশ চক্রবর্তী ও পদ্মনাভর কাছে শুনেছি ১৯৭৯ সালে প্রফেসর দেবব্রত পাল-এর পরিচালনায় একটি এক্সকার্শন ট্যুর হয়। তাঁরা লখনৌ, দেরাদুন, মুসৌরি, নৈনীতাল, হরিদ্বার, ঋষিকেশ প্রভৃতি জায়গায় গিয়েছিলেন।

কলেজে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক শিক্ষাবিদ এসেছিলেন। ১৯৮১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় আইনমন্ত্রী এবং কলকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী মাননীয় হাসিম আব্দুল হালিম মহাশয় আমাদের কলেজে এসেছিলেন। "প্রফেশনাল এথিকস" এর উপরে একটি দীর্ঘ বক্তব্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীগণ ও অধ্যাপকগণ এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

১৯৮০ সালের ১৪ই মে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে জলপাইগুড়ি বাসীর কাছে এক গভীর দুঃখের দিন। এই দিনে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজে পাঠদানের উদ্দেশ্যে জলপাইগুড়ি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় আইন মহাবিদ্যালয়ে পাঠদানের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে আমাদের দুই জন অধ্যাপক জলপাইগুড়ির দুই জন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত আইনজীবী বিভূতি ঘোষ এবং শ্রী পরেশ মিত্র মহাশয় দুজনেই এক পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন। সেই দিনই অধ্যাপক বিভূতি ঘোষ মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরদিন সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীগণ অধ্যাপকের বাড়ির সামনে জড় হই ও শেষকৃত্যে অংশ গ্রহন করি।

বিভূতি ঘোষ মহাশয় কোম্পানি আইন পড়াতেন এবং তিনি জলপাইগুড়ি জেলার প্রাক্তন সরকারী উকিল অর্থাৎ G.P. ছিলেন। খুবই গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কম কথা বলতেন। পড়ানোর সময় ক্লাসের মধ্যে অদ্ভুত এক নীরবতা বজায় থাকত এবং অসম্ভব ছাত্রদরদী ছিলেন।

সাত দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে একুশে মে, পরেশ মিত্র মহাশয় পরলোকগমন করেন। এই দিন আমরা আইন কলেজের ছাত্রগণ প্রিয় অধ্যাপক-এর মরদেহ নিয়ে শিলিগুড়ি হাসপাতাল থেকে শিলিগুড়ি মর্গ হয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আইন মহাবিদ্যালয়, শিলিগুড়ি এবং বিভিন্ন জায়গা পরিক্রমা করে জলপাইগুড়িতে আসি শেষকৃত্যে অংশ গ্রহন করি। শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির আপামর ছাত্র-ছাত্রীগণ এই শেষকৃত্যে অংশ গ্রহন করেন। আইন কলেজের ছাত্র - ছাত্রীদের কাছে শ্রী পরেশ মিত্র মহাশয় একজন কেবলমাত্র অধ্যাপক ছিলেন না, তিনি সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। শুনেছি, তিনি কারাগারে থাকাকালীন পড়াশানো করেছিলেন। কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের স্নাতক হন । প্রথমে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দপ্তরের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্র কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হন । এবং একজন ব্যস্ততম লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী হিসেবে পরিচিত হন।

জলপাইগুড়ি থেকে ইউনিভার্সিটি ল কলেজে যারা পড়াশোনা করতেন তারা সকলে মিলে ১৯৭৪-৭৫ সালে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন গঠন করেন। তার নাম ছিল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় জলপাইগুড়ি ল' স্টুডেন্টস ফোরাম।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় জলপাইগুড়ি ল' স্টুডেন্টস ফোরাম সেই সময়ে দাবি করে ছিল যে জলপাইগুড়িতে একটি আইন কলেজ হোক এবং এই মর্মে, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ডিস্ট্রিক্ট

ম্যাজিস্ট্রেট, জলপাইগুড়ি এবং ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছিল। ফোরামের মিটিং বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হত, তার মধ্যে জলপাইগুডি আজাদ হিন্দ পাঠাগার, এ.সি. কলেজ অফ কমার্স ইত্যাদি। এছাড়া, ফোরামের মধ্যে বাসে যাতায়াত এর সুবিধা ও অসুবিধা বাস ভাড়া এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আমরা নিজেরা আলোচনা করতাম। জলপাইগুডির ল' স্টুডেন্টসদের নিয়ে ফোরাম গঠন করার ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহন করে ছিলেন সর্বশ্রী মাননীয় সুনীল চক্রবর্তী, আক্রাম হোসেন (বর্তমানে জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের লব্ধপ্রতিষ্টিত আইনজীবী), আশুতোষ ঘোষ, তাপস গাঙ্গুলী, হীরেন গুহ ঠাকুরতা, (বর্তমানে জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের লব্ধপ্রতিষ্টিত আইনজীবী), সুপ্রিয় ব্রক্ষ, বিমলেন্দু দে, অজিত বসাক, অমল সরকার, মিহির ব্যানার্জি প্রমূখ। ১৯৭৭ সাল থেকে ফোরামের ঐতিহ্য বহন করেন সর্বশ্রী সত্যজিৎ বসু (বর্তমানে প্রয়াত), রাম অবতার শর্মা, সুবর্ণ রঞ্জন রুদ্র, রাহুল হোড়, পদ্মনাভ চক্রবর্তী, মানবেশ চক্রবর্তী, পুষ্প সরকার, রত্না আচার্য, প্রভাস বোস প্রমুখ। এই সময় সভাপতি ছিলেন বিমলেন্দু দে ও সচিব ছিলেন রাম অবতার শর্মা। শ্রীশর্মা ক্রমান্বয়ে দুইবার সচিব ছিলেন। পরবর্তিতে, মানস গুহ সচিব নির্বাচিত হন। নৃপেন্দ্র চন্দ্র সরকার পরবর্তীতে সভাপতি হয়েছিলেন।

এখানে একটি কথা বলা বিশেষ উল্লেখযাগ্যে যে ল' স্টুডেন্টস ফোরাম থেকে আইন কলেজের জন্য আলাদা ভবন, ছাত্রাবাস ও এল.এল. এম. কোর্সের জন্য উপযুক্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এবং সর্বোপরি জলপাইগুড়িতে ল' কলেজে স্থাপন করবার জন্য তদানীন্তন উপাচার্য, মাননীয় অম্লান দত্ত মহাশয়, জেলা শাসক, দার্জিলিং, তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিল। এই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় জলপাইগুড়ি ল' স্টুডেন্ট ফোরামের সদস্য হই ও ১৯৮১ সালে আইনের স্নাতক হওয়া পর্যন্ত ফোরামের প্রতিটি কাজে অংশ গ্রহন করি। যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মিতা চক্রবর্তী, রত্না আচার্য্য, বাসবী ঘোষ, বারিণ চন্দ্র সাহা ও আরো অনেকে ফোরামের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন। মনে পড়ে, একবার ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে গিয়ে আমাদের মান্থলি ভাড়া কত হবে বা প্রতি কিলোমিটার অনুযায়ী নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন কতখানিক ছাত্র ছাত্রীদের ছাড় দিতে পারে; এই ব্যাপারে আমরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেই আলাচেনায় গিয়েছিলেন নৃপেন্দ্র চন্দ্র সরকার মহাশয়, যতীন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, রাম অবতার শর্মা, পদ্মনাভ চক্রবর্তী, সুবর্ণ রঞ্জন রুদ্র, সবিৎ কুমার গুহ ও আরো অনেকে।সকলের কথা মনে পড়ছে না। ১৯৭৮ সালে আমাদের রাজ্যে দক্ষিণের জেলাগুলাতে প্রলয়ংকারী বন্যা পরবর্তী কালে মূখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে কিছু অর্থ দেওয়া হয়েছিল।

ফোরাম থেকে আমরা দুবার ফাংশন করেছিলাম একবার রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে। আরেকবার, মনে পড়ছে না। এখানে এটা বলা উল্লেখযোগ্য যে, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় জলপাইগুড়ি ল' স্টুডেন্ট ফোরাম-এর সেক্রেটারি এবং প্রেসিডেন্ট কখনোই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনে দাঁড়াননি কারণ আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এটাই যে ফোরামের মধ্যে একতা এবং সকল

সদস্যদের মধ্যে একটা ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখা।

পরবর্তীতে, ১৯৮২ সালে জলপাইগুড়ি ল' কলেজ স্থাপন হবার ফলে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় জলপাইগুড়ি ল' স্টুডেন্টস ফোরামের প্রাসঙ্গিকতা আর থাকে না।

স্মৃতিচারণ করা বড় কঠিন। স্মৃতির উপরে নির্ভর করেই লিখেছি। হয়তো বিন্যস্ত হয়নি। সাহায্য করেছেন অনেকেই তথ্য দিয়ে, কারণ সাহায্য না করলে এই লেখা তৈরি করা হয়তো সম্ভব হতো না। পদ্মনাভ লেখাটি পড়ে কিছু তথ্য সংশোধন করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আরো আবদ্ধ করেছেন।

তবে একটা কথা আজকে মনে পড়ছে যে আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে জলপাইগুড়ি থেকে নর্থবেঙ্গল ইউনিভার্সিটি ল' কলেজে পড়াশোনা করবার সময় বিশেষ করে সান্ধ্যকালীন সময়ে পড়াশোনা করবার সময় কিছু অসুবিধা অনুভব করতাম; তখন মোবাইল ছিল না, ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপ ছিলনা, রাজনীতির ঘেরাটোপে জটিল আকারে ধারণ করেনি, মতানৈক্য ছিল কিন্তু মনান্তরে পরিণত হয়নি। বন্ধুদের মধ্যে একটা ভ্রাতৃত্ববোধ এবং অধ্যাপক মহাশয়দের কাছ থেকে স্নেহ, ভালোবাসা ও দরদী মনোভাব সব সময় পেয়েছি। পড়ুয়াদের মধ্যে আমরা সকলেই একটা ভ্রাতৃত্ববোধে এ আবিষ্ট ছিলাম। এটাই গর্বের।

বিনম্র চিত্তে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি ঃ
পদ্মনাভ চক্রবর্তী, বরুণ দাশগুপ্ত, রাম অবতার শর্মা, সুবর্ণ রঞ্জন রুদ্র, গঙ্গোত্রী দত্ত, মানবেশ চক্রবর্তী, কিশোর মারোদিয়া, মিতা চক্রবর্তী, সুকল্যান ভট্টাচার্য, জীবন কৃষ্ণ মুখার্জী।

❋❋❋❋❋

সরোজেন্দ্রদেব – শতবর্ষাধিক পর্বে মূল্যায়ন

উমেশ শর্মা

তিনি গান্ধীজী থেকে রবীন্দ্রনাথ, শচীনদেব বর্মন থেকে বরোদার গায়কোয়ারের মহারানীর সঙ্গে একসঙ্গে বসেছিলেন। তিনি একাসনে বসেছিলেন প্রান্তবাসী আব্বাসুদ্দীন থেকে কৃষ্ণচন্দ্র দে, কেশরবাঈ, প্রমূখ ভারত সেরা কণ্ঠ শিল্পীদের সঙ্গে। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় সহ বাংলার তাবড় তাবড় রাজনীতিবিদরাও বাদ যাননি। উনি গোলাপের মতো বিদেশ বিভুঁইয়ের জাতক ছিলেন না, জলপাইগুড়ি জল-জঙ্গল-জলার জাতক সরোজ এবং হয়ে উঠেছিলেন সরোজেন্দ্র। হ্যাঁ, আমি জলপাইগুড়ির গর্ব সরোজেন্দ্রদেব রায়কতের কথাই বলতে চাইছি। তাঁর নামেই ২০০৭-১০ সালের মধ্যে গড়ে উঠেছিল জলপাইগুড়ির সাহিত্য ও সংস্কৃতির পীঠস্থান 'সরোজেন্দ্রদেব রায়কত কলাকেন্দ্র' বা আর্ট কমপ্লেক্স। জলপাইগুড়িবাসী তাঁরই আবক্ষমূর্তি কলাকেন্দ্র প্রাঙ্গণে স্থাপন করে নিজেদেরকে ধন্য করেছিল। তারিখটি ২রা জুলাই ২০২১ সাল।

বলা যায়, এই মূর্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জলপাইগুড়িবাসী সরোজেন্দ্রদেবকে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পুনরায় চর্চার, ফিরে দেখার ও গবেষণার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন। একই সাথে জলপাইগুড়ির অপর এক বরেণ্য সন্তান উপেন্দ্রনাথ বর্মনের সঙ্গে তাকে একত্র নিয়ে চর্চিত 'স্মরণে উপেন্দ্রনাথ ও সরোজেন্দ্রদেব' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে সংস্কৃতিচর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচনে প্রয়াসী হয়েছেন। আসুন না, আমরা সরোজেন্দ্রদেব সম্পর্কে সামান্য পরিসরে চর্চা শুরু করি।

প্রাক্কথন ঃ আমরা জানি, বৈকণ্ঠপুর রাজ এস্টেটের সূত্রপাত ঘটেছিল ১৫২৩ খ্রিস্টাব্দে। ঐ রাজবংশের ঊনবিংশতম শাসক যোগেন্দ্রনাথ রায়কত (১৮৬৫-৭৮) ছিলেন অপুত্রক। তিনি ও তাঁর স্ত্রী জগদীশ্বরী দেবী জগদিন্দ্রদেব নামক এক গ্রাম্যবালককে পোষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁকে রাজগদি প্রদানের অঙ্গীকারপত্র সম্পাদন করেছিলেন।

জগদিন্দ্রদেব ছিলেন শিক্ষিত, প্রতিভাবান ও সংস্কৃতিপ্রিয় এক ব্যক্তিত্ব। তবে তাঁর পক্ষে রাজগদি লাভ করা যতটা সহজ হয়েছিল, ঐ রাজগতি রক্ষা করা ততোটাই হয়ে উঠেছিল কঠিন। জলপাইগুড়ির রাজবংশী সমাজে তিনি প্রথম বিলেত ফেরত ব্যক্তি। তাই রাজনীতি ত্যাগ করলেও তিনি স্বমহিমায় হয়ে উঠেছিলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। প্রতিপক্ষ ফণীন্দ্রদেব রায়কতের অকাল প্রয়াণের পর তিনি তাঁর নাবালক পুত্র প্রসন্নদেবের অভিভাবকত্ব লাভ করেছিলেন এবং ঐ নাবালক পুত্রকে শিক্ষিত করতে হয়েছিলেন সচেষ্ট। সাবালক প্রসন্নদেবকে রাজগদিতে বসিয়ে তার উপযুক্ত পাত্রী নির্বাচন করে তাঁকে বিয়ে দিয়ে রাজর্ষি জগদিন্দ্রদেব রাজবাড়ী পরিত্যাগ করে সাধারণ জীবন-যাপন করতে থাকেন। তিনি ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ ও সমাজ

সচেতন এক ব্যক্তি। রাজবংশের ইতিহাসকার, জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রথম সভাপতি, জল্পেশ মন্দিরের ট্রাস্ট কমিটির প্রথম সম্পাদক, মন্দিরের বর্তমান নির্মাতা জগদিন্দ্রদেব রায়কত ক্ষত্রিয় সমিতি, জোতদারস্ অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি বহু সামাজিক সংস্থার সঙ্গে ছিলেন যুক্ত। তবে তার প্রধানতম কীর্তি হল জলপাইগুড়ির মত প্রান্তীয় জনপদে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চার জন্য 'জলসাঘর' স্থাপন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সস্ত্রীক ঐ স্বদেশি সন্ন্যাসীর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। জগদিন্দ্রদেব বিয়ে করেছিলেন ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের জ্ঞাতি ভ্রাতা ষষ্ঠীচরণ সেনের কন্যা সরলতা দেবীকে। কলকাতার নিমতলা স্ট্রিটে হিন্দু মতে ওই বিয়ের আসরে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ঐ দম্পতির চার পুত্র ও দুইজন কন্যা। ঐ পুত্রেরা হলেন – কুমুদেন্দ্রদেব, নলিনীন্দ্রদেব, ক্ষীরোদেন্দ্রদেব এবং সরোজেন্দ্রদেব রায়কত। সরোজেন্দ্রদেবের জন্ম হয়েছিল ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর।

সরোজেন্দ্রদেবের বাল্যজীবন ঃ রায়কতবংশে একমাত্র যিনি রাজগদিতে বসতেন, তিনি রায়কত পদবি গ্রহণ করতে পারতেন। জ্ঞাতিবর্গ দেব পদবি ব্যবহার করতেন। কিন্তু জগদিন্দ্রদেব রায়কতের চার পুত্রই – কুমুদেন্দ্রদেব, নলিনীন্দ্রদেব, ক্ষীরোদেন্দ্রদেব এবং সরোজেন্দ্রদেব 'রায়কত' পদবি গ্রহণ করেছিলেন। কুমুদেন্দ্রদেব ত্রিপুরা রাজ পরিবারে বিয়ে করেছিলেন। ওই সূত্রে প্রবাদপ্রতিম কন্ঠ শিল্পী শচীনদেব বর্মন ছিলেন তার মামাশ্বশুর। নলিনীন্দ্রদেব ছিলেন কুচবিহার মহারাজার এডিকং। ক্ষীরোদেন্দ্রদেব রাজবাড়ী প্রতিষ্ঠিত রাণি অমৃতেশ্বরী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সঙ্গীতসাধক। এই বৃত্তে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সংগীতের অভিজ্ঞতাপূর্ণ বাতাবরণে লালিত ও বর্ধিত হয়েছিলেন সরোজেন্দ্রদেব রায়কত। খেলাধুলা, রাজনীতি, গান-বাজনা, শিকার প্রভৃতির মাধ্যমে আনন্দে দিন কাটতে থাকে তাঁর। স্থানীয় জিলা স্কুলের মেধাবী ছাত্র। ঐ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন (১৯১৫)।

সরোজেন্দ্রদেবের যৌবনপর্ব ঃ সরোজেন্দ্রদেবের সঙ্গীত গুরু তার পিতা জগদিন্দ্রদেব রায়কত। আদর্শ ব্যক্তিও পিতাই। পিতা মনে করতেন যে, কৃষির উন্নতিই দেশের উন্নতি। চাকুরি 'কুকুরের কাজ'। পরাধীন জীবন। সরোজেন্দ্র পিতার আদর্শ মেনে উচ্চশিক্ষার জন্য সচেষ্ট হন। মাতা সরলতা দেবীর নামে বিশাল ভূ-সম্পত্তি – 'সরলতাদেবী এস্টেট'। ঐ জমি জায়গা দেখাশোন দিকে তাঁর মন নেই। রাজকুমারী প্রতিভা দেবীর স্বামী ডাঃ সৌরীন্দ্রকিরণ বসুর সঙ্গে সেখানে গিয়ে তিনি কোন বন্যপ্রাণী গুলি করতে উৎসাহী নন। সঙ্গীত সাধকদের খোঁজে সারা ভারত ঘোরেন। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, ভারত শ্রেষ্ঠ গায়িকা কেশরবাঈ প্রমুখকে রায়কতবাড়ির 'জলসাগরে' আমন্ত্রণ করে আনেন। ছুটে যান ত্রিপুরা। 'সঙ্গীত সমাজ' তার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। ওই প্রতিষ্ঠানে ছুটে আসেন শচীন দেব বর্মন। তিনি ছুটে যান ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাস উদ্দিনের বাড়িতে।

দাদা কুমুদেন্দ্রদেবের শ্যালিকা ইন্দুবালা দেবী তখন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র সান্নিধ্যে থাকতেন। তাঁরই আগ্রহে তিনি দেখা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথকে গান শোনান। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'তুমি আমার পুত্রসম। তোমার বাবার বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম।'

গান্ধীজী ১৯২৫ সালের ১৪ই জুন জলপাইগুড়ির জে.ওয়াই.এম.-এর মাঠে সভা করেছিলেন। সভায় উপস্থিত জগদিন্দ্রদেব ও তাঁর পুত্র সরোজেন্দ্র। গান্ধীজীর সভায় তিনি একটি ভজন গেয়েছিলেন। গান্ধীজি তাঁকে চরকা কাটা থামিয়ে তাঁকে বলেছিলেন 'এত সুন্দর ও শুদ্ধ উচ্চারণে উর্দু ভাষা তুমি কার কাছে শিখেছ?' উত্তরে তিনি তাঁর পিতার কথা বলেন, গান্ধীজী মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'তুমি ভাগ্যবান। পিতার মতো বড় শিক্ষক আর কেউ নয়।'

বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক মান্না দে'র জ্যাঠামশাই কৃষ্ণচন্দ্র দে (১৮৯৩-১৯৬২) সরোজকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়ায় তিনি ঘ্রাণশক্তিতে সরোজেন্দ্রদেবের উপস্থিতি অনুভব করতেন। বাপী লাহিড়ীর মাতা বাসবী লাহিড়ী, চিত্রাভিনেত্রী কনকবালা দেবীর মত সরোজেন্দ্রদেবের বহু ছাত্র-ছাত্রী জয়পুর, বিকানীর, বরোদা, লক্ষ্ণৌ, অসম থেকে দিল্লী – সারা ভারতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। ১৯২৮-২৯ সালে হিজ মাস্টার্স ভয়েজ সরোজেন্দ্রদেবের রেকর্ড প্রকাশ করে।

বরোদার মহারানি দার্জিলিঙে এলে কুচবিহারের মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী মহারানি ইন্দিরা দেবীর অনুরোধে সরোজ দার্জিলিঙে গিয়েছিলেন। বরোদার মহারানীকে (ইন্দিরা দেবীর বৃদ্ধা মাতা) শুদ্ধ শাস্ত্রীয় সংগীত, গজল, গীত ইত্যাদি শুনিয়ে খুশি করেছিলেন। সরোজেন্দ্রদেবের উর্দু গজলের ধ্বনি মাধুর্য, সুরলহরী তাঁকে প্রীত করেছিল। তাঁদের স্টেট সিঙ্গার ফৈরাজ খাঁ সাহেব, কোনরবাঈ কেরকর প্রমুখের সঙ্গে ওই রানীর মাধ্যমেই তার যোগাযোগ গড়ে ওঠে।

রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন ঃ পিতা জগদিন্দ্রদেব রায়কত ছিলেন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে তিনি রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট-এর পদ ত্যাগ করেছিলেন। ১৯১২-১৬ সময়সীমায় সমাজসেবার লক্ষ্যে হয়েছিলেন পৌর সদস্য। সরোজেন্দ্রদেব রায়কতও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত জলপাইগুড়ি পৌরসভার সদস্য পদ গ্রহণ করে সমাজকল্যাণে মনোনিবেশ করেন। তিনি ছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থীরূপে ১৯৫৪ সালে তিনি বিধানসভা উপ-নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন। ১৯৫২ সালে জলপাইগুড়ি আসনে জয়ী হয়েছিলেন রানী অশ্রুমতি দেবী। তিনি ১৯৫৪ সালের ৪ঠা জানুয়ারি প্রয়াত হলে ওই শূন্য পদ তৈরি হয়েছিল। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি পুনরায় প্রার্থী হয়ে দীর্ঘ পাঁচ বছর বিধায়ক হিসাবে রাজ্যে জনসেবা করেছিলেন।

বিয়াল্লিশের আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে মান্যতা

পেয়েছিলেন।

বিবাহিত জীবন ঃ সরোজেন্দ্রদেব রায়কত কুচবিহার রাজবংশের মহাবীর চিলা রায়ের (সংগ্রাম সিংহ) বংশধর ফালাকাটা নিবাসী সুরেন্দ্রনাথ সিংহের কন্যা সুভাষিনী দেবীকে বিয়ে করেছিলেন। ঐ দম্পতির সাত পুত্র ও তিনজন কন্যা। পুত্ররা সমাজে সকলেই প্রতিষ্ঠিত ও স্বনামধন্য। এঁরা হলেন – সমরেন্দ্রদেব (তরু), মুকুলেন্দ্রদেব, শ্যামলেন্দ্রদেব (ভাইয়া), বাসুদেব, পীতাম্বর, উত্তম (মধু) এবং কন্যারা হলেন মনীষা, সীতা ও রীতা। রায়কতবংশ, বীর চিলারায়ের বংশ, জগদিন্দ্রদেব রায়কতের পূর্বপুরুষদের বংশ এবং সরোজেন্দ্রদেব রায়কতের বংশ লতিকা উদ্ধার করেছিলেন বর্তমান প্রাবন্ধিক।

সরোজেন্দ্রদেবের বিবাহিত জীবন খুব সুখের ছিল। তার দাদা ও ভাইয়েরা প্রায় প্রত্যেকেই সংগীতজগতে খ্যাতনামা। এমনকি ঐ বংশের বহু নারী-পুরুষ এখনও সংগীতজগতে মার্গ প্রদর্শন করে থাকেন।

চা-বাগান দেখাশোনা, চা-কোম্পানি অফিস পরিচালনা, সঙ্গীত সাধনা নিয়েই ভোজন রসিক শুদ্ধাচারী সরোজেন্দ্রদেব রায়কতের জীবন অতিবাহিত হয়েছিল। অর্থাগমে, জমিদারিতে তাঁর আসক্তি কোনদিনও ছিল না। স্ত্রী, পুত্র-কন্যা নিয়ে সুখে জীবন যাপন করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাঁর প্রয়াণ তারিখ ১৪.০৯.১৯৬৪।

মূল্যায়ন ঃ এত সংক্ষিপ্ত পরিসরে শতবর্ষাধিক (১৮৯৮-১৯৬৪) বছর পূর্বেকার সংগীত মহাসাধক সরোজেন্দ্রদেব রায়কতের জীবনের মূল্যায়ন করা বা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ভদ্র, বিনয়ী বন্ধুবৎসল, মিশুকে এই উদারহৃদয় সঙ্গীত প্রতিভাকে নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। আত্মাভিমান, স্বাজাত্যবোধ, সাহিত্য-সংস্কৃতি অনুরাগী সরোজেন্দ্রদেব তরাই-ডুয়ার্সের জনপদে এক বিরল প্রতিভা। জলপাইগুড়ির রায়বাহাদুর-খানবাহাদুর শোভিত জনপদে তিনি মাথা উঁচু করে বিদেশি শাসকদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছিলেন। জলপাইগুড়ির বাঈজী নাচের, খেমটার প্রলেপে মাখো মাখো সংগীতের সংকীর্ণতাকে তিনি তাঁর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সারা ভারতে প্রসারিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। গোটা ভারতের সংগীত সাধকদের পীঠস্থান হিসেবে জলপাইগুড়িতে তিনি চিহ্নিত করতে হয়েছিলেন সমর্থ।

ধর্ম নয়, বর্ণ নয়, উঁচু-নিচু ভেদাভেদ নয়, সংগীতের মাধ্যমেই তিনি সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন ও পেরেছিলেন। সংগীতের সাতটি সুরে ও বাইশটি শ্রুতিতে ঘটবে মহামিলন। এটাই তার আদর্শ, এটাই ছিল তাঁর 'The Path of Salvation'। তাইতো তার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে নতজানু জলপাইগুড়িবাসী।

✠✠✠✠✠

ড্রাগনের দেশে নেপালি অভিবাসন

অশেষ কুমার দাস

ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশ হল ভুটান। যার উত্তরে স্বশাসিত তিব্বত বা গণ প্রজাতন্ত্রী চীন, দক্ষিণে ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম রাজ্য। পূর্ব দিকে রয়েছে ভারতের অরুনাচল প্রদেশ ও পশ্চিমে ভারতের সিকিম রাজ্য সহ তিব্বত। অর্থাৎ ভূটান দেশটিকে যেন ঘিরে আছে চীন ও ভারতবর্ষ। যার মোট আয়তন প্রায় সাতচল্লিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার। স্থানীয় বাসিন্দা বলতে রয়েছে নগালং সম্প্রদায় সহ সার্কপিয়া ও খ্যেন জনগোষ্ঠী। তাছাড়াও রয়েছে অল্প পরিমাণে মেচ ও লেপচা জনগোষ্ঠী। নগালং সম্প্রদায় নিজেদের পালডেন দ্রুকপা বলে পরিচয় দেয়। ভূটানের হা, পারো, থিম্পু ও পুনাখাতে দ্রুকপাদের প্রধান বসতি। সার্কপিয়ারা বাস করে পূর্ব ভূটানে। খ্যেনদের ভূটান প্রাচীন জনগোষ্ঠী বলে মনে করা হয়। ভূটানিরা আদর করে তাদের দেশকে বলে ড্রুল-ইয়ুল (DRUL-YUL) বা ড্রাগন ভূমি। রাষ্ট্রসংঘের হিসাব অনুযায়ী এই দেশটির মোট জনসংখ্যা প্রায় সাতলক্ষ তিয়াত্তর হাজার সাতশত আটজন। রাষ্ট্রভাষা হল জংখা (DZONKHA)। তিব্বতীরা নিজেদের দেশকে ভোট বলে ডাকত। এবং টান কথাটির অর্থ হল দেশ। উল্লেখ্য যে তিব্বতী লামাতন্ত্রের হাত ধরে ভূটান দেশটির আনুষ্ঠানিকভাবে পথচলা শুরু হয়। যা হিমালয়ের জলবায়ুর মতনই কুয়াশাচ্ছন্ন।

ড্রাগন ভূমি ভূটান ধর্মের দন্ড যে রাজদন্ডে পরিণত হয়। অনুমান করা হয় যে তিব্বতী ধর্মগুরু দলাই লামার নির্দেশেই ভূটানে আনুষ্ঠানিক রাজতন্ত্রের সূচনা হয়। যদিও এই রাষ্ট্র গঠনে দলাই লামার ভূমিকা নিয়ে ইতিহাস বরাবরই নীরব রয়েছে। কোনভাবেই ধর্মগুরুর জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে নগরোয়াম নামগিয়াল নামে যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ভূটানে এসে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন, তার পিছনে অবশ্যই তিব্বতী রাজতন্ত্রের অনুমোদন ছিল বলে অনুমান করা হয়। যদিও ওর আগমন সম্পর্কে বলা হয় যে তিব্বতের রালুস বৌদ্ধ মন্দিরের প্রধান ভিক্ষু পদ্ম-কারপোর (রিমপোচ) নিরাপত্তা ও দ্রুকপা সম্প্রদায়ের মতামত সম্পর্কে প্রচার করতে তিনি ভূটানে আসেন, নগোয়াম নামগিয়াল নিজে ছিলেন একজন দ্রুকপা সম্প্রদায়ের মানুষ। তিনি ভূটানে এসে ঘোষণা করেন যে তার গোষ্ঠীর মতন করে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করবেন। যার ফলে প্রথমেই তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সমর্থন আদায় করতে সফল হন। অপরদিকে পদ্ম কারপোর আত্মরক্ষার কথা বলে অন্যান্য জনগোষ্ঠীরও সমর্থন আদায় করে নেন। নগোয়াম নিজেকে সবদ্রমু বা অবতার বলে ঘোষণা করে তার অধীনে ধর্মরাজা ও দেবরাজা নামে দুইটি পদ সৃষ্টি করেন। তাদের দুজনের কাজ নিয়ে ধর্ম ও রাষ্ট্র প্রশাসন, দেখভাল করা; জন্ম নেয় ভূটান রাষ্ট্র।

অবতাররূপি নগোয়াম নামগিয়াল এই ভাগাভাগির মধ্য দিয়ে নিজেকে নবগঠিত ভূটান

রাষ্ট্রের জনকরূপে চিহ্নিত হন। ধর্মকে সামনে রেখে তিনি ভূটানকে একসূত্রে গেথে ফেলেন। তার প্রাথমিক লক্ষ্য যেমন ছিল ভূটানকে এক সুসংহত রূপ দেওয়া, তেমনিই আর একটি অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল লামাতন্ত্রের প্রসার ঘটানো। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই কাজে নামগিয়াল সম্পূর্ণভাবে সফল হন, রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে তিনি ছিলেন অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তিব্বতে থাকাকালীন তিনি যে জ্ঞান লাভ করেছিলেন, নবগঠিত ভূটান যেন হয়ে ওঠে তার প্রয়োগ কেন্দ্র। ভূটানের টাঙ্গোতে অবস্থিত বৌদ্ধ মন্দিরের আভ্যন্তরীন সাজসজ্জার জন্য তিনি নেপাল থেকে নিয়ে আসেন নেওয়াড় জনগোষ্ঠীর মানুষদের। এইগোষ্ঠীর মানুষেরা শিল্পী কারিগর হিসাবে পরিচিত ছিল। টাঙ্গোর বৌদ্ধ মন্দিরে আভ্যন্তরীন সাজসজ্জাকে কেন্দ্র করে ভূটানে প্রথম নেপালি অভিবাসন ঘটে ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে নেপালের রাজা হন রাম শাহ। সংস্কারের নামে তিনি শুরু করেন প্রজাপীড়ণ। যার ফলে বেশ কিছু নেপালবাসী ভূটানে অভিবাসনে বাধ্য হয়। রাম শাহ সংস্কারের অন্যতম ছিল ওজন ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস। যার দরুন প্রজাদের ঠকতে হোত।

নগোয়ামের নেতৃত্বাধীন ভূটান কতটা সাবালক হলো, তার পরীক্ষা দিতে হয়েছিল তিব্বতের কাছে। সেই পরীক্ষা নিতেই তিব্বত বিনা কারণে ১৬৩২, ১৬৩৯, ১৬৪০ এবং ১৬৪৭ সালে ভূটান আক্রমণ করে। প্রত্যেকবারই ভূটান উপযুক্তভাবে এর মোকাবিলা করে। সপ্তদশ শতাব্দীর পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভূটানকে পাওয়া যায় এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাষ্ট্ররূপে। ভূটানে অভিবাসনকারী নেপালিদের থিম্পু শহরের উত্তরদিকে বসবাসের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদের স্বার্থেই যে নেপালিদের অভিবাসন দেওয়া হয়েছিল তা বলা বাহুল্য মাত্র। কারণ ভূটানের দেবরাজা ও ধর্মরাজা বহিরাগতদের অভিবাসনের ক্ষেত্রে ছিল ভীষণভাবে কঠোর। হয়ত ধর্মীয় বিশুদ্ধতার কারণেই তারা এমন ছিলেন। ইতিমধ্যে তরাই অঞ্চলের বসবাসরত (বর্তমান শিলিগুড়ি মহকুমা) সন্ন্যাসীদের সাথে ভূটানের আঁতাত গড়ে ওঠে। উভয়েরই নজর ছিল কোচবিহার রাজ্যকে আত্মসাৎ করা। দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রকে কেন্দ্র করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোচবিহার রাজ্যর ডুয়ার্স অঞ্চল দখল করে নেপালী অভিবাসনকারীদের আশ্রয় দেয়। এবং নেপালি অভিবাসনও ক্রমাগত চলতে থাকে ভূটানের বুকে। এই নেপালীরা নিজেদের মত যাপন চিত্র রচনা করেছিল এবং পাশ্ববর্তী রাজতন্ত্রের খবর নিয়মিত ভূটান রাজাকে সরবরাহ করত।

কোচবিহার রাজ্যের থেকে ডুয়ার্স দখলের পর ভূটান সন্ন্যাসীদের সাথে হাত মিলিয়ে দেশীয় রাজ্য কোচবিহার সহ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর বহু এলাকাতে লুঠতরাজ চালাত। এই সময় ভূটানের প্রয়োজন ছিল ডুয়ার্সকে দখলে রাখার। যে কারণে নেপাল থেকে ভূটান ডুয়ার্সে ক্রমাগত অভিবাসনে শুরু হয়, অভিবাসনকারী নেপালিরা ভূটান রাজের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে দ্বিধা করত না। এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিও তারা ছিল সহানুভূতি সম্পন্ন মানুষ। হয়ত

সে কারণেই ভূটানে নেপালি অভিবাসন সহজ হয়েছিল। অপরদিকে ভূটানি উৎপাত থেকে রক্ষা পেতে কোচবিহার রাজ ইংরেজদের সাহায্য চায়। কোচবিহার রাজ্য তার বহু আগে থেকেই ইংরেজদের করদ রাজ্যে পরিণত হয়েছিলো। হয়তো সে কারণেই ইংরেজরাও ভূটান আক্রমণ করতে বাধ্য হয়। সিঞ্চুলা সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে এই ইংরেজ ভূটান যুদ্ধের অবসান হলেও ডুয়ার্স অঞ্চল ইংরেজদের দখলে আসে। ফলে ভূটানে অভিবাসনকারী নেপালিরা দক্ষিণ ভূটানের চিরাং দাগানা, সরভং, ফুন্টসোলিং এবং সামচি জেলাতে আশ্রয় নেয়। ইংরেজরা ডুয়ার্সে চা চাষে উদ্যোগী হয়। ১৮৭২ সালে প্রথম আদম সুমারীতে ডুয়ার্সে নেপালির সংখ্যা ছিল চুয়াল্লিশ জন মাত্র।

১৯০৭ সালে ভূটানের সিংহাসনে জিগমে দর্জি ওয়াংচু। ১৯৫২ সালে তিনি ভূটানে জাতীয় আইন সভা বা NATIONAL ASSEBLY OF BHUTAN প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৮ সালে ভূটান সংবিধানে রাজাকে সাংবিধানিক প্রধান বলে গণ্য করা হয়। এবং বংশ পরম্পরাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। যার ফলে জিগমে দর্জির মৃত্যুর পর তার পুত্র মাত্র ১৬ বছর বয়সে ভূটানের রাজসিংহাসনে বসেন। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে ভূটানের নেপালিরাও অনুপ্রাণিত হন রাজতন্ত্রের থেকে মুক্তি পেতে। তারা ভূটানে গণতন্ত্রের দাবিতে সোচ্চার হন। ১৯৫২ সালে আসামের পাটগাঁওতে ভুটানে বসবাসকারী অনাবাসী নেপালিরা জি.পি. শর্মা ও মসুর ছেত্রীর নেতৃত্বে একটি সম্মেলনে গঠন করেন "ভূটান স্টেট কংগ্রেস"। নবগঠিত এই দলটি ১৯৫৪ সালে ভুটানে বসবাসকারী নেপালিদের নাগরিকত্ব, সরকারী চাকরীসহ প্রশাসনের বিভিন্ন পদে নেপালিদের নিয়োগের দাবিতে ভুটানের সরভং জেলাতে সত্যাগ্রহ শুরু করে। শান্তিপূর্ণ এই সত্যাগ্রহকে ভূটান সরকার কিন্তু ভালো চোখে দেখেনি। ভুটান সরকার ঘোষণা করে, সত্যাগ্রীরা প্রশাসনের কাছে আত্মসমর্পণ করুক অথবা ভারত বা নেপালে গিয়ে বসবাস করুক। বলা বাহুল্য যে এই বছর থেকেই ভূটানে নানারকমের সংস্কার শুরু হয়।

১৯৫২ সালে ভুটানে বসবাসরত নেপালিদের সত্যাগ্রহ যেন ভূটান রাজের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিলো। যদিও ভূটানে বসবাসকারী নেপালিরা সমস্ত রকমের নাগরিক অধিকার ভোগ করত। কিন্তু তবুও তারা কেন সত্যাগ্রহে সামিল হল, এর কোন যুক্তি গ্রাহ্য উত্তর মেলে না। রাজ প্রশাসন ও এবার সাবধানে পা ফেলতে শুরু করলো। ইতিমধ্যে তারা দেখল যে ১৯৭৬ সালে সিকিম ভারতভুক্ত হলো ভূমিপুত্র লেপচাদের পিছনে ফেলে নেপালি সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে ভূটানের ভূমিপুত্ররাও একই আশংকায় ভুগতে থাকলো। ভূটিয়াদের ধারণা সিকিম ভারতভুক্ত হয়েছে সেখানে সত্তর শতাংশ মানুষ নেপাল থেকে অনুপ্রবেশ বা অভিবাসনের কারণে। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে ১৯৮০ সালে ভূটান রাজ লাগু করে 'দ্রিগলাম নামঝা' সমাজ পদ্ধতি। আদতে যা ছিল ভূটানের ভূমিপুত্র দ্রুকপা আভিজাত্য পরিবারের সমাজ পদ্ধতি। এতকাল ভূটানে নেপালি ভাষীরা তাদের নিজ নিজ সংস্কৃতি বজায় রেখে যাপন চিত্র রচনা করতে পারত। কিন্তু দ্রিগলাম

নামঝা চালুর ফলে আর সেই উপায় থাকল না। 'একজাতি এক প্রাণ' মন্ত্রে উজ্জিবীত হয়ে সে দেশে অভিবাসনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হল। সেই সাথে এল নাগরিকত্ব আইন সংশোধন।

জাতীয় আইনসভাতে দক্ষিণ ভূটানের সদস্যরা বিরোধীতা করলেও ১৯৮৫ তে নাগরিকত্ব আইন সংশোধন হল। এই আইন অনুযায়ী ১৯৫৮কে ভিত্তিবর্ষ হিসাবে ধরে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে বলে বলা হল। নাগরিক সুমারীর এই আইন লাগু করতে গিয়ে বলা হয় যে ১৯৫৮ সাল বা তার আগে যদি খাজনা বা কর সরকারকে প্রদানের কোন রসিদ কেউ দেখাতে পারে, তবে তাকেও নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। ১৯৮০ সালের বিবাহ আইন খুবই তৎপরতার সাথে ১৯৮৮ সালে চালু করা হল। সেই আইন অনুযায়ী কোন ভূটানী যদি অভূটানী বিয়ে করে থাকে তবে সে আইন সভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দীতা করতে করতে পারবে না। কর্মস্থলে উন্নতি সহ চিকিৎসা ব্যবস্থা ও বিদেশে পড়াশুনার জন্য সাহায্য ও কৃষি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের ভর্তুকি থেকে সে বঞ্চিত হবে; ১৯৮৮তে আদমসুমারীর দল দক্ষিণ ভূটানের নাগরিকদের সাতভাগে ভাগ করে। ১) ১৯৫৮ সাল ভিত্তি বর্ষ ধরে নির্ণয় হয় প্রকৃত ভূটানি, (২) যারা ভূটান ত্যাগ করে পুণরায় ফিরে আসে, (৩) যারা আদমসুমারীর সময় ছিল না, (৪) একজন অভূটানী নারী যে, ভূটানী পুরুষকে বিয়ে করেছে, (৫) একজন অভূটানী পুরুষ, যে ভূটানী নারীকে বিয়ে করেছে, (৬) অধিগ্রহণ, (৭) বেআইনী অভিবাসনকারী।

খুব স্বাভাবিক ভাবেই নাগরিকত্ব প্রশ্নে নেপালি অভিবাসনকারীদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে এই অভিবাসনকারী নেপালিরা তাদের শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন শুরু করে। বিশেষত দক্ষিণ ভূটানের বিভিন্ন স্থানে তাদের আন্দোলন তীব্র হয়। মিছিল, গণ অবস্থান, সভা সমিতির ঘন ঘন আয়োজন করা হয়। আন্দোলনকারীদের মূল দাবী ছিল, ১৯৮৫ সালের নাগরিকত্ব আইন ১৯৮৮ সালে চালু হয় সেটাকে বাতিল করতে হবে। এই ধরনের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকে সামাল দিতে রাজার নিরাপত্তা বাহিনীকে কাজে লাগায়। ১৯৮৫ সালের নাগরিকত্ব আইন এবং দ্রিগলাম নামঝা সমাজ পদ্ধতি নেপালিদের পক্ষে মেনে নেওয়া কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী নেপালি জনগোষ্ঠী তাদের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে পারলেও কিন্তু ভুটানে বাস করতে হলে তাদের পরম্পরাগত সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিতে হতো। সে কারণেই নেপালি ক্ষোভ ধূমায়িত হয় খুবই শান্তিপূর্ণ ভাবে। আর ভুটান সরকার ভারতবর্ষের সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গের কথা মনে রেখে আন্দোলন দমনে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নেয়। তারা এই ঘটনাকে বিদ্রোহ বলে মনে করে এবং ঘোষণা করে যে ১৯৯১ সালের ১৫ জানুয়ারীর মধ্যে নাগরিকত্বের প্রমাণ না দিতে পারলে ভূটান ছাড়তে বাধ্য করা হবে। ১৯৯০ সালের ১৭ আগস্ট ভূটানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাগো সিরিং এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারী করে, যে সমস্ত নেপালি মানুষ সরকার বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলো, তারা সহ তাদের

আত্মীয় স্বজনকে এই বিজ্ঞপ্তির আওতাভুক্ত করা হয়। এরপর থেকেই নেপালিরা ভূটান ছাড়তে বাধ্য হয়।

ভূটানরাজের এ হেন সিদ্ধান্তে প্রায় এক লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার নেপালি ভাষাভাষী মানুষ ভূটান ছাড়তে বাধ্য হয়। প্রাথমিকভাবে তারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম রাজ্যে কিছুদিন বসবাস করে। পরে তারা স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সহযোগীতায় পূর্ব নেপালের ঝাপা জেলাতে মোট সাতটি শরণার্থী শিবিরে বসবাস শুরু করে। যারমধ্যে বেলডাঙ্গিতে আছে তিনটি শিবির ও বাকি চারটি হল গোলধাপ, টিমাই, খুদনবাড়ি ও শনিচরা। এই শিবিরগুলোতে কত মানুষ আছে তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও ভূটানের একটি মানবাধিকার সংগঠনের মতে এই সংখ্যা হল এক লক্ষ দুই হাজার সাতশত চব্বিশ জন। প্রায় কুড়ি হাজার জন পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্স ও শিলিগুড়ি মহকুমাতে বসতি গড়ে তোলে, তাছাড়াও প্রায় পাঁচহাজার নেপালি, নেপালে উদ্বাস্তু শিবিরের বাইরে বসবাস করে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা হলো ডুয়ার্স ও শিলিগুড়িতে বসবাসরত কুড়ি হাজার বেআইনী অভিবাসনকারীদের নিয়ে স্থানীয় প্রশাসন নীরব।

নেপালি অনুপ্রবেশে জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় ও উপহিমালয় অঞ্চল। ১৯০৭ সালে থেকেই দার্জিলিং জেলাতে নেপালিরা কখনো স্বতন্ত্র প্রশাসন, আবার কখনো বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিতে গোর্খাল্যান্ডের দাবি করে। এদের দাবি যতই উচ্চগ্রামে উঠতে থাকে, ভারত নেপাল মুক্ত সীমান্তের দরুণ ততই যেন নেপালি অভিবাসন বাড়তে থাকে। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষেও মানবিকতার দোহাই দিয়ে 'নেপালি অভিবাসন(?)' নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি। বরঞ্চ অভিবাসনকারীদের যেন ভোট ব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমাতে একটি তথ্য নির্ভর সমীক্ষায় দেখা যায় এই জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। ১৮৯১ সালে মহকুমাতে নয় হাজার তিন শত ছিয়ানব্বই জন নেপালি বাসত করত। আর আজকে সেই সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। মাটিগাড়া থানার খাপরাইল মৌজা ছিল নেপালি শূন্য। আজ সেখানকার মোট জনসংখ্যার দশ শতাংশ মানুষ নেপালি, খোপলাশি মৌজাতে অন্ততঃ কুড়ি শতাংশ নেপালি বাস করেন। মরিণাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বাইশটি মৌজার পনেরোটিতে নেপালিরা হল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। বাগডোগরা থানার ভুট্টাবাড়ির আশি শতাংশ মানুষ নেপালি। আবার এম.এম. তরাই মৌজায় একশো শতাংশ নেপালি বাস করে। ভোট ব্যাঙ্কের স্বার্থে নেপাল থেকে ডেকে এনে তাদের বসতি দেওয়া হয়েছে। ধিমালদের মৌজা ধিমালে কোন নেপালি থাকত না। আজ সেখানে নেপালি জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার পঞ্চাশ ভাগ। ১৯২১ সালে শিলিগুড়ি মৌজাতে নেপালিভাষী মানুষ ছিল মোটে আটশত ছাপ্পান্ন জন। আর আজকে সেই সংখ্যা কত, তা আদমসুমারীর কর্তারাই জানেন। তাছাড়াও বারোভিটা ত্রিহানা, অর্ড টেরাই এর মতন চা বাগানের অর্ধেক জনসংখ্যা হল নেপালি। সবচেয়ে বড় কথা হল মহানদী অভয়ারণ্য সহ বৈকুণ্ঠপুর অরণ্য সংলগ্ন অঞ্চলে বহু নেপালি বসতি শুরু করেছে। যার ফলে অরণ্যের

সংখ্যা কমছে ও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে গোর্খা সন্ত্রাস। ১৯৫০ সালের ভারতনেপাল মৈত্রী চুক্তির পথ ধরে এমনটা হচ্ছে। এরপর ভূটান থেকে বিতাড়িত নেপালিরা আশ্রয় নিয়েছে শিলিগুড়ি ও ডুয়ার্সে। ফলে এই অঞ্চল যেন আর একটা সিকিম হতে চলেছে।

নেপালের উদ্বাস্তু শিবিরে বসবাসরত নেপালিরা আজ চাইছে পুণরায় ভূটান ফিরে যেতে। এ ব্যাপারে তারা ছয়টি সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে 'ফোরাম ফর ডেমোক্রেসি' নামে একটি সংগঠনও তৈরী করেছে। এই ফোরামে আছে, ভূটান পিপ্‌লস্ পার্টি, ভূটান গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট, ড্রুক ন্যাশনাল কংগ্রেস, ভুটানের মানবাধিকার সংগঠন, ভূটানের মহিলা সংগঠন ও বি আর সি সি নামে একটি সংগঠন।

১৯৯৬ সালে ভারতবর্ষকে করিডোর হিসাবে ব্যবহার করে পদযাত্রার মধ্য দিয়ে ভূটানে প্রবেশ করতে চাইলে রাজ্য পুলিশ ও ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আধাসামরিক বাহিনীর তৎপরতায় তা ব্যর্থ হয়। এরপর ফোরামের সদস্যরা ভারত নেপাল সীমান্তে মেচি সেতুর ওপরে (নেপালের দিকে) শান্তিপূর্ণভাবে ধর্নায় বসে। সপ্তাহের প্রতি শুক্রবার। তৃতীয় দফায় উদ্বাস্তুর দল ঐ একই পথে সমবেত হয়ে আগ্রাসী হয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করে। এ ক্ষেত্রেও রাজ্য পুলিশ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আধা সামরিক বাহিনী বাঁধা দেয়। উদ্বাস্তুরাও ব্যর্থ হয়। ২০০৫ সালের ৩ আগস্ট তারিখে এবং ৩২০জন উদ্বাস্তু ভারতবর্ষের মধ্য দিয়ে ভূটান যাত্রা করলে একই পরিণতি হয়। ২০০৭ সালের ২৮ ও ২৯ মে প্রায় পনেরো হাজার উদ্বাস্তু স্থানীয় দুষ্কৃতীদের উস্কানিতে ভূটান যাত্রা করলে রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক যথোচিতভাবে তার মোকাবিলা করে। এরপর এই উদ্বাস্তুরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচারভিযানে নামে। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীকে এই সমস্যা সমাধানের জন্য আবেদন করে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ডুয়ার্সের জয়গাতে ভূটান গেটে কয়েকজন উদ্বাস্তু এবং দিল্লীর যন্ত্রমন্তর এ ধর্না দেয়। দিল্লীতে তারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে সভা করে ভারত সরকারকে চাপ দিতে এগিয়ে আসার আবেদন করে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনকেও তারা স্মারকলিপি দেয়।

নেপালে সাতটি উদ্বাস্তু শিবিরের দেখভাল করে ইউ.এন.সি.এইচ.আর। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক সহযোগিতায় এই শিবিরগুলো চলছে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। সবচেয়ে দুঃশ্চিন্তার হলো যে ভূটান গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের সভাপতি ডি.এন.এস. ঢাকাল জানান যে, এই সমস্যার সমাধান না হলে উদ্বাস্তু যুব সমাজ জঙ্গী আন্দোলনে নাম লেখাবে। ঢাকাল সাহেব আধা সামরিক বাহিনীর এক কর্তাকে একান্ত সাক্ষাৎকারে একথা জানান। অপর একটি তথ্যনির্ভর সূত্রে জানা যায় যে সিপিবি (এম.এল.এম.) এর অধীনে ডাং, রোলপা, রুকুম নামক নেপালের অঞ্চলে আগ্নেয়াস্ত্রর প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। যা আগামী দিনে ভুটান নয় পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় ও উপহিমালয়ের অবস্থা অগ্নিগর্ভ করে তুলতে

পারে। এ প্রসঙ্গে ভূটান রাজের বিবৃতি হল THE MINORITIES NEPALIS WANT TO TURN BHUTAN IN TO A NEPALIS STATES ..... WE DON'T WANT TO BECOME MINORITY IN OUR OWN LAND. MOST OF THOSE WHO LEFT BHUTAN, ARE NOT BHUTANESE NATIONALS. ভূটান রাজ যেন বলেই খালাস। আর ক্রমশঃ অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছে বাংলার ডুয়ার্স দার্জিলিং উপহিমালয় ও উপহিমালয় অঞ্চল। শীঘ্রই যেন শুরু হবে আর একটা রক্তাক্ত অধ্যায়।)

✠✠✠✠✠

তারাশঙ্করের ভারতবর্ষ

উমা মাজী মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষকে দুভাগ হয়ে যেতে। নগরকেন্দ্রিক ভারতবর্ষ ও গ্রামীণ ভারতবর্ষ, ইংরেজী শিক্ষিতের ভারতবর্ষ, ও ইংরেজী অশিক্ষিতের ভারতবর্ষ, তথাকথিত ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ ও ভদ্রোতর সাধারণ মানুষের ভারতবর্ষ। এস্থলে আরেকটি বিষয় বিচার্য, তাহা শিক্ষার বৈষম্য। যে ভালোরূপ ইংরেজী শিখিয়াছে এবং যে শেখে নাই, তাহাদের মধ্যে গুরুতর ব্যবধান গড়িয়াছে। তাহাদের চিন্তাপ্রনালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে। পূর্বে বিদ্বান-মূর্খের মধ্যে এরূপ প্রভেদ ছিলনা। তখন একজন বেশি জানিত, আরেকজন কম জানিত, এইমাত্র প্রভেদ ছিল। এখন একজন একরূপ জানে, অন্যজন অন্যরূপ জানে। এই জন্য অনেক সময় দেখা যায়, উভয়ে উভয়কে জানেনা। সামান্য বিষয়ে পরস্পর পরস্পরকে ভুল বুঝে, এই জন্য উভয়ের তেমন ঘনিষ্ঠভাবে একত্র থাকা প্রায় অসম্ভব! চরঘোষপুরে এসে গারো প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন, কলকাতার বাইরেও এক বিশাল ভারতবর্ষ আছে যার স্বরূপ কলকাতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এ উপলব্দি রবীন্দ্রনাথেরও। ১৮৯০ সালে রবীন্দ্রনাথ জমিদারি তদারকি সূত্রে প্রথম কলকাতার বাইরে বেরোলেন এবং দেখতে পেলেন নাগরিক কলকাতার বাইরে বিশাল ভারতবর্ষকে, আসল ভারতবর্ষকে। সাধারণের ভারতবর্ষকে।

মননশীল লেখক নীরদ সি চৌধুরী এই ব্যবধানের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী পর্যবেক্ষণে। ইংরেজরা আসার আগে পর্যন্ত আমরা ঐতিহ্য সূত্রে যা অর্জন করেছি তা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি নয়, লোকসংস্কৃতি অষ্টাদশ শতাব্দীতে, ইংরেজরা আসার আগে ভারতীয় অভিজাত সমাজে দুটি পরিণত সংস্কৃতি ছিল - একটি ইসলামী সভ্যতা, অন্যটি হিন্দু পন্ডিতদিগের শাস্ত্রালোচনা। কিন্তু তা মুষ্টিমেয় গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এদুটির কোনটিই ভারতবর্ষের বিরাট জনসমাজকে গভীরভাবে স্পর্শ করতে পারেনি। বৃটিশ যুগের প্রাক্কাল পর্যন্ত ভারতের সাধারণ জনসমাজ যে সংস্কৃতিকে বয়ে আনছিল তা প্রিমিটিভ, শিশুসুলভ, লোকসংস্কৃতি মাত্র। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী ভিন্ন প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বহুমুখী কীর্তির কোন অবশেষই ধরে রাখতে পারেনি এই জনসমাজ।

প্রাচীন ভারতবর্ষের সঙ্গে এই বিচ্ছিন্নতার কারণ মুসলমান আক্রমণ। যে হিন্দু শাসক ও অভিজাত সমাজ হিন্দুসভ্যতার অবলম্বনস্বরূপ ছিল, মুসলমানের আক্রমণে উহারা একেবারে বিনষ্ট না হইলেও শক্তিহীন হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় তাহাদের পক্ষে আর হিন্দু সভ্যতার প্রাচীন ধারা অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব হয় নাই এবং এই নেতৃত্ব হারাইয়া ভারতবর্ষের সাধারণ জনসমষ্টি সমস্ত মুসলমান যুগ ধরিয়া কি ধর্মে, কি সাহিত্যে, কি ভাষায়, কি আর্যে, কি আচার ব্যবহারে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার একটা অপভ্রংশ ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারে নাই। অন্তত একথাটা

অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মুসলমান যুগই হিন্দু জন সমষ্টির মধ্যে অগণিত লৌকিক ধর্ম, লৌকিক আচার, লৌকিক সাহিত্য ও লৌকিক সঙ্গীত ইত্যাদির সৃষ্টিকাল।

(নীরদ সি চৌধুরী, বর্তমান ভারতের সংস্কৃতি)

বৃটিশ যুগের প্রাক্কালে এই গ্রাম্য সংস্কৃতিকেই আমরা বহন করে আসছিলাম। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিয়ে যে আধুনিক ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি তৈরী করা হল তা ঐতিহ্যসূত্রে কেউই আমাদের নিকটবর্তী ছিল না। তাই আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের একটা বিচ্ছিন্নতা তৈরী হল।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র আধুনিক সংস্কৃতির জনক। কিন্তু এদের পরিচিতি লোকমানসের গভীরে যুক্ত নয়। সাধারণ মানুষ বিদ্যাসাগরকে মনে রেখেছে কিংবদন্তী হিসাবে - তাদের অভ্যস্ত সহজ সরল চিন্তাধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে –

১। বিদ্যাসাগর গরীব বাড়িতে জন্মে বিশাল বড় হয়েছেন।

২। হাঁটুর উপরে ধূতি, গায়ে চাদর, পায়ে চটি-সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন পদ্ধতি যা সাধারণ মানুষের কাছাকাছি।

৩। বিদ্যাসাগর মার ডাকে চাকরি ছেড়ে ভয়ঙ্কর ভাগীরথী পার হয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাস জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও শরৎচন্দ্রও এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে বাঙালী সমাজকে তুলে এনেছেন - মূলতঃ কুলীন বিধবাদের সমস্যা, স্বাধীন ব্রাহ্মণ্য সমাজের অবক্ষয়ী পচাগলা রূপ, নারীর প্রতি শ্রদ্ধা, নীচুতলার মানুষের প্রতি সহানুভূতি (মহেশ, অভাগীর স্বর্গ), একান্নবর্তী মধ্যবিত্ত পরিবারের মাধুর্য ও দ্বন্দ্ব (রামের সুমতি, নিষ্কৃতি বৈকুণ্ঠের উইল)।

ভারতের সামগ্রিক চেহারা, ভারতবর্ষের বিশাল লোকআত্মার প্রাণভোমরার প্রথম প্রতিফলন ঘটল তারাশঙ্কর এবং বিভূতিভূষণের উপন্যাসে। কোন মহৎভাব, বিশেষ উদ্দেশ্য বা বিশাল কল্পনার প্রাচীর তুলে বাস্তবতা থেকে তাঁদের উপন্যাসকে বিচ্ছিন্ন করে তোলেননি।

সাহিত্যে কোনরকম প্রচারের ভূমিকাকে এরা অস্বীকার করেছেন। এরা মূলতঃ অভিজ্ঞতা নির্ভর লেখক। দ্রষ্টার চোখে বাংলাকে, ভারতবর্ষকে যেমন দেখেছেন, তেমনি ফুটিয়ে তুলেছেন উপন্যাসে। 'মাঝে মাঝে একটা কথা শোনা যায় যে, আমাদের মতো পরাধীন দরিদ্র দেশের সঙ্কীর্ণ সমাজের মধ্যে কথা সাহিত্যের উপাদান তেমন মেলেনা। ....এই ধরনের উক্তির সত্যকার বিচার করতে বসলে দেখা যায় – এসব কথা মাত্র আংশিকভাবে সত্য। বাংলাদেশের সাহিত্যের উপাদান বাংলার নরনারী, তাদের দুঃখদারিদ্রময় জীবন, তাঁদের আশানিরাশা, হাসিকান্না, পুলক-বহির্জগতের সঙ্গোদের রচিত ক্ষুদ্র জগৎগুলির ঘাত-প্রতিঘাত, বাংলার ঋতুচক্র, বাংলা সন্ধ্যাকাল, আকাশ-বাতাস, ফলফুল-বাঁশবনের, আম বাগানের নিভৃত ছায়ায় ঝরা সজনে ফুল বিছানো পথের ধারে যেসব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে - তাদের কথাই বলতে হবে, তাদের সে গোপন সুখ-দুঃখকে রূপ দিতে হবে। (স্মৃতির রেখা - বিভূতিভূষণ

বন্দ্যোপাধ্যায়)। 'আপনার কাছে বলতে আমার কুণ্ঠা নেই, আমি পড়াশুনা বিশেষ করিনি। বাংলা একটু আধটু পড়েছি, ইংরেজী তাও নয়। লেখা পড়াতো শিখিনি। কথায় কথায় ডিকশনারী দেখতে হয়। তা করে কি চলে? রস পাইনি ভালো ভালো বই পড়ে খোরাক সংগ্রহ করে তারপর লিখবো সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত। আমার বই বলুন আর যাই বলুন, সেটা হচ্ছে আমার এই রূঢ় দেশ। এর ভেতরে থেকেই আমার যা কিছু সমন্বয়। এখানকার মানুষ, এখানকার জীবন নিয়ে লিখেছি। তার বেশী আমার আর কিছু নয়।' (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় - সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তকে লিখিত পত্র)

হ্যাঁ তারাশঙ্করের ভারতবর্ষ বলতে রাঢ়দেশ। রাঢ়দেশের ক্ষুদ্র পটভূমিতেই ধরা পড়েছে সমসাময়িক ভারতবর্ষের গ্রামীণ সমাজের পরিপূর্ণ রূপ - অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক রূপরেখা। মূলতঃ দেশকাল আলিঙ্গিত একটি বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানে (রাঢ় দেশে) আরূঢ় গ্রাম-সমাজ-ই (তার পরিবর্তনশীলতা ভাঙন, গতিশীলতা, তার আত্মার গভীর আলোড়ন) তারাশঙ্করের উপন্যাসে প্রধান চরিত্র। আর এই বিশেষ অবস্থানের মধ্যেই মূর্ত হয়ে উঠেছে তৎকালীন ভারতবর্ষের সমগ্রতার আভাস।

তারাশঙ্কর কি একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণে ভারতবর্ষকে দেখেছেন? তারাশঙ্কর প্রথম জীবনে মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর কালেন্দী উপন্যাসে অহীন্দ্র নামে একটি চরিত্রকে দেখতে পাই মার্কসবাদী হিসাবে। মার্কসের প্রতি তারাশঙ্করের শ্রদ্ধা প্রতিফলিত হয়েছে অহীন্দ্রের উক্তিতে - পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর লেখা মা, জাতিতে তিনি জার্মান, তাঁর নাম কার্ল মার্কস। আমরা যাঁদের ঋষি বলি তিনি তাই। পৃথিবীর ছোট বড় ভেদাভেদ, কোটি কোটি লোকের দারিদ্র্য আর মুষ্টিমেয় ধনীর বিলাস, রাজ্যসম্পদ নিয়ে এই যে হিংস্র পশুর মত মানুষের কাড়াকাড়ি, তিনি তার কারণ নির্ধারণ করেছেন এবং নিবারণের উপায় - পথনির্দেশ করে দিয়েছেন কিন্তু মার্কসীয় চেতনা খুব গভীরে সঞ্চারিত হয়নি। তারাশঙ্কর স্বীকার করেছেন, মার্কসের ক্যাপিটাল বা তাঁর কোন বই পড়িনি - "এদেশে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মার্কসবাদের উপর লেখা প্রবন্ধ কিছু পড়েছি মাত্র।" (আমার সাহিত্য জীবন)। গান্ধীজীর প্রভাব তারাশঙ্করের উপর অটুট ছিল আজীবন। ১৯২৮-৩১ দুবছর তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় কর্মী হিসাবে অংশগ্রহন করার ফলে জেলে বন্দী থাকেন। সন্দীপনের পাঠশালায় (১৯৪৬) সীতারাম পন্ডিতের উক্তিতে গান্ধীজীর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ঝরে পড়েছে - 'মহাত্মা গান্ধী সবচেয়ে বড়মানুষ বললে তাদের সাজা হয়না।'

এহোবাহ্য উপন্যাসের মূল সুর কিন্তু মার্কসবাদ বা গান্ধীবাদের অনুসারী হয়ে উঠেনি, গভীর জীবনবোধ, বহুস্তরীয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, সাধারণ মানুষের প্রতি অপার স্নেহ-মমতা এবং নিজস্ব আদর্শবাদের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছে তাঁর উপন্যাস। গান্ধীজীর চিন্তার সীমাবদ্ধতাকে তারাশংঙ্কর যথার্থ ঐতিহাসিক প্রজ্ঞার দুরদর্শিতা অতিক্রম করেছেন অনায়াসে। গান্ধীজী বৃহত্তর

ভারী শিল্প তথা যন্ত্রসভ্যতাকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন, প্রাচীন ভারতীয় কুটির শিল্পকে ঠেকা দিয়ে জনজীবন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছেন যন্ত্রশিল্পকে। কিন্তু তারাশঙ্কর বুঝেছেন যন্ত্রসভ্যতার অনিবার্য প্রভাবকে কিছুতেই এড়ানো যাবে না। এর গতির ধাক্কা সমাজের শেষ তৃণমূলস্তরের জীবনের শেকড় ধরেও নাড়া দেবে, ভেঙে গুড়িয়ে দেবে অচল অনড় পেশাগত ধ্যানধারণা, আলগা করে দেবে গোষ্ঠীগত সংহতির ভিত্তিভূমি, চিরাচরিত ঐতিহ্যের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রবল স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ব্যক্তি মানুষদের অনিবার্যতার উদ্দেশ্যে। এর প্রভাব ভয়ঙ্কর কিন্তু অনিবার্য। আর এই অনিবার্যতার আন্দোলনে ভাসতে ভাসতেই বুক বাঁধতে হবে নতুন অন্বেষণায়। এখানেই তারাশঙ্করের আধুনিকতা, আবার এখানেই তারাশঙ্করের ইতিবাচক শিল্পী প্রত্যয় ভারতীয়তা।

⌘⌘⌘⌘⌘

ললিতমোহন বক্সী ও উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা – একটি বিস্মৃত অধ্যায়

ঋষিকল্প পাল

কুচবিহারের যে কয়েকটি পরিবারের কুচবিহার রাজ-আমল এবং তৎপরবর্তীকালে সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে অবদান রয়েছে তাঁদের মধ্যে বক্সী পরিবার অন্যতম। এই বক্সী বংশের একজন কৃতি সন্তান ছিলেন রায় চৌধুরী মনমোহন বক্সী ও রাজমোহিনী দেবীর দ্বিতীয় পুত্র ললিতমোহন বক্সী। ললিতমোহন ১৮৯৮ সাধারণাব্দের ৬ মার্চ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। (১) অধুনা বাংলাদেশের রংপুরের নাওডাঙ্গা ও ভূতপূর্ব কুচবিহার রাজ্যে বক্সীদের বিস্তৃত জমিদারী ছিলো। জমিদারী থেকে আয় প্রচুর হলেও বাড়ি বসে বিলাসবহুল অলস-জীবন যাপন না করে এই পরিবারের প্রায় প্রত্যেকজন সন্তানই কুচবিহারের কোনো না কোনো রাজপদ পূরণ করতেন। ললিতমোহন কুচবিহারের জেঙ্কিন্স স্কুল থেকে ১৯১৪ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।(২) তিনি পরবর্তীতে বি.এল. (ব্যাচেলার অফ-ল) ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ২৭ অক্টোবর, ১৯২৬ সাধারণাব্দে প্রথম কুচবিহার রাজসরকারের চাকরিতে নিযুক্ত হয়েছিলেন।(৩) চাকরি জীবনে তিনি কুচবিহার রাজসরকারের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল থেকে তাঁর যোগ্যতার স্বাক্ষর রেঁখে গিয়েছেন। তবে কুচবিহার রাজ-আমলে তাঁর সব থেকে উল্লেখ্যযোগ্য অবদান 'কুচবিহার ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট'-এর সূচনা এবং রাজ-আমল পরবর্তীতে সংস্থাটির ক্রমবিকাশের সাথে জড়িত। সাধারণত কুচবিহার রাজপরিবারের কোনো অনুষ্ঠানে অন্যান্য রাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রণ জানানোর জন্য রাজ-প্রতিনিধি-স্বরূপ একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মী ও রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্যকে পাঠানো হতো। কথিত আছে ১৯৪২ সাধারণাব্দে কুচবিহার রাজপরিবারের উল্লিখিত প্রথা অনুযায়ী কোনো একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণের জন্য কুচবিহার রাজ্যের তৎকালীন সিভিল ডিফেন্স কমিশনার ললিতমোহন বক্সী এবং রাজপরিবারের কোনো একজন সদস্য হায়দারাবাদের নিজাম বাহাদুর-কে আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিলেন। সে সময় হায়দারাবাদ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন নিজাম মীর ওসমান আলি খান, সপ্তম আসফ জা (১৯১১-১৯৪৮ সা.অ.)। নিজাম মীর ওসমান আলি খান প্রতিষ্ঠিত 'এন.এস.আর.আর.টি.ডি.' বা 'নিজাম স্টেট রেল অ্যান্ড রোড ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট'-এর সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করে ললিতমোহন উৎসাহিত হন এবং ফিরে এসে কুচবিহারের তৎকালীন মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর-এর (১৯২২-১৯৪৯ সা.অ.) কাছে একটি পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই ললিতমোহন প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি কুচবিহার রাজ-দরবার কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে।(৪) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 'সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার

রিকন্সট্রাকশন স্কিম'-এর মাধ্যমে।(৫) তিনটি "কোউসন থেমস্" বাস (Cousin Theme Bus?) ও তিনটি "ফোর্ড ট্রাক" (Ford Truck?) নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় এই পরিবহন সংস্থা।(৬) ১৯৪৫ সাধারণাব্দের ২৭ মার্চ ডেভেলপমেন্ট কমিশনার ললিতমোহন বক্সী-র নামাঙ্কিত "কুচবিহার-ফালাকাটা মটরবাস সার্ভিস" শীর্ষক একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে আগামী ২ এপ্রিল, সোমবার থেকে জনসাধারণের সুবিধার জন্য কুচবিহার থেকে ফালাকাটা (শৌলমারি) পর্যন্ত একটি মটরবাস পরিসেবা শুরু হতে চলেছে।(৭) শেষোক্ত তারিখ থেকে এই সংস্থাটির প্রথম কার্যকারিতা লক্ষ্য করা যায়। সে সময়ে সংস্থাটির নাম বাংলা এবং ইংরেজিতে যথাক্রমে "কুচবিহার ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট" ।(৮) ও 'Cooch Behar State Transport' মুদ্রিত হয়েছে।(৯) কুচবিহার থেকে পুন্ডিবাড়ি, পাতলাখাওয়া, ফালাকাটা হয়ে শৌলমারি পর্যন্ত কুচবিহার ষ্টেট ট্রান্সপোর্টের প্রথম পরিবহন ব্যবস্থার সূচনা ঘটেছিল।(১০) প্রতিষ্ঠার পর ললিতমোহন এই সংস্থার প্রথম প্রশাসক নিযুক্ত হন। কুচবিহার পরিবহন সংস্থার একটি বাস "কোচবিহার রয়াল মেল সার্ভিস" হিসেবে সেবক ব্রীজ হয়ে কুচবিহার থেকে শিলিগুড়ি যাতায়াত করতো।(১১) ১৯৪৭ সাধারণাব্দে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলে ১৯৪৯ সাধারণাব্দের ২৮ আগস্ট কুচবিহার রাজ্য স্বাধীন ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৯৫০ সাধারণাব্দের ১ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলায় পরিণত হয়। জেলায় পরিণত হওয়ার ফলে পরিবহন সংস্থাটি স্থায়ীভাবে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র (পরিবহন) দপ্তরের অধীনে চলে আসে।(১২) কুচবিহার রাজ্যের ভারতভুক্তি তথা পশ্চিমবঙ্গে যোগ দেওয়ার পর পূর্বতন রাজকর্মীরা স্বাধীন ভারতবর্ষের কর্মী হিসেবে নিয়োজিত হতে শুরু করেন। কুচবিহার রাজ্যের ভারতে অভিগমন বা অ্যাকসেশনের সময় ললিতমোহন কুচবিহারের ডেভেলপমেন্ট কমিশনার এবং রেভিনিউ সেক্রেটারি পদে ছিলেন এবং অ্যাকসেশন ও মার্জার বা ভারতভুক্তির অন্তর্বর্তী সময়ে তিনি ছিলেন চীফ সেক্রেটারি। কুচবিহার পশ্চিমবঙ্গের জেলায় রূপান্তরিত হওয়ার পর ললিতমোহন কুচবিহারের অতিরিক্ত জেলা শাসক নিযুক্ত হন।(১৩) ভারতীয় আই.এ.এস.-এর সদস্যভুক্ত হয়ে অতিরিক্ত জেলা শাসক হওয়ার সাথে সাথে ওই সময় তিনি পরিবহন সংস্থার প্রশাসক হিসেবেও কাজ করছিলেন। ১৯৫৩ সাধারণাব্দে তিনি কলকাতার রাষ্ট্রীয় পরিবহন দপ্তরে ডাইরেক্টর হিসেবে স্থানান্তরিত হন।(১৪) ললিতমোহন কলকাতায় থাকাকালীন ডাইরেক্টর অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও ডাইরেক্টর-ইন-চার্জ লেক ডিপো পদে ছিলেন।(১৫) আনুমানিক ১৯৫৮ সাধারণাব্দে ললিতমোহন রাষ্ট্রীয় পরিবহন থেকে অবসর গ্রহণের পর ১৯৫৯ সাধারণাব্দ নাগাদ কুচবিহারে পরিবহন সংস্থার প্রশাসক হিসেবে তাঁকে নিয়োগ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার মনস্থ করেন। এই সময় কুচবিহার থেকে প্রকাশিত সোশিয়ালিস্ট পার্টির ভাবধারায় পরিচালিত একটি পত্রে ললিতমোহনকে তাঁর 'স্বেচ্ছাচারীতা', 'খাম খেয়ালী' ও 'আমলাতান্ত্রিক উন্নাসিকতা-র দোষে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। একই পত্রের অপর একটি সংখ্যায় ট্রান্সপোর্টে ললিতমোহনের চাকরি প্রদানের বিরুদ্ধে একটি

সংবাদ প্রকাশিত হয়। কুচবিহারে ট্রান্সপোর্টের জনৈক ড্রাইভারের বালুরঘাটে বদলীর আদেশ হয়েছিল। কিন্তু, সেই কর্মীর কন্যা গুরুতর অসুস্থ হলে বদলীর আদেশ একমাস স্থগিত রাখার জন্য তিনি ট্রাফিকে আবেদন জানিয়েছিলেন। আবেদনে, ফল না হওয়ায় সেই কর্মী ললিতমোহনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু, কর্মীর কথায় অবিশ্বাস-জনিত কারণে ললিতমোহন তাঁর বালুরঘাটে স্থানান্তর স্থগিত করেননি। বালুরঘাটে কাজে যোগ দেওয়ার কিছুদিন পর অপ্রত্যাশিতভাবে সেই কর্মী কুচবিহারে আসার জন্য সংবাদ পেলে গিয়ে দেখেন যে ইতিমধ্যে তাঁর কন্যা গত হয়েছেন এবং এই ঘটনার পরে ট্রান্সপোর্ট থেকে তাঁকে বলা হয়েছিল তিনি যেন দশদিনের একটি ছুটির দরখাস্ত করেন ও ছুটি শেষে পুনরায় বালুরঘাটে গিয়ে কাজে যোগদান করেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ললিতমোহনের হৃদয়হীনতা তুলে ধরার জন্য এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল এবং বলা হযেছিল – "এই যে হৃদয় হীনতা এর কি কোন প্রতিকার নাই? হয়তো নাই। তবে শ্রীবকসীর কর্পোরেশনের অধিনে চাকুরী হয়তো মিলিবেই। তাই সরকারকে পূর্ব্ব হইতে জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে এই রকম স্বৈরাচারী আমলাতান্ত্রিক ব্যক্তিকে নিয়োগের পূর্ব্বে দ্বিতীয়বার যেন চিন্তা করেন। (পুরনো বানান অপরিবর্তিত)"।(১৬) ঘটনাটি নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। তবে তথ্যের অভাবে সংবাদটির সত্যাসত্য যাচাই করা এমুহূর্তে সম্ভব নয়। প্রশাসকের জনরঞ্জক হওয়া কঠিন তবে ললিতমোহনের মতো একজন নিরহংকার, কর্মনিষ্ঠ ও পরোপকারী ব্যক্তির সম্বন্ধে এরকম উক্তি অন্যত্র আর কোথাও কেউ করেছেন বলে জানা যায় না। বৃহত্তর জনমানসে বরং এর বিপরীত চিত্রটি আজও প্রচলিত। ললিতমোহন ছিলেন কংগ্রেসপন্থী তবে সক্রিয় রাজনীতি তিনি কখনও করেননি। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুধাংশুমোহন সোশিয়ালিস্ট পার্টির একজন উল্লেখযাগ্যে ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তবে সে নিয়ে বিবাদের তেমন কোনো অবকাশ ছিলো না। রাজন্যশাসিত কুচবিহারের মাটিতে রাজনীতি ছিলো একটি নতুন বস্তু। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে ললিতমোহনের পরিবারগুলির মতো অভিজাত বংশগুলির ক্রমশঃ প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের ফলে বহুক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা দেখা দিয়েছিল। এতকাল যাঁরা ধন-মান-ঐশ্বর্য সম্ভোগ করছিলেন হঠাৎ অবস্থার পরিবর্তনে এক শ্রেণীর লোকে মনে করতেন তাঁদের অপদস্থ করলে হয়তো নিজের বা নিজেদের উত্তরণ ঘটবে। তাঁদের দাবি যে সম্পূর্ণ ভুল ছিলো। তা নয়, কারণ বহুক্ষেত্রে উচ্চশ্রেণীর শোষণও ছিলো মাত্রাবিহীন। কিন্তু বক্সীদের মতো একটি সমাজদরদী পরিবারের ক্ষেত্রে একথা যথাযথ প্রযুক্ত হতে পারে না। তাঁদের অবদানের কথা শুরুতে সংক্ষেপে মাত্র উল্লেখ করা হয়েছে, তার বিস্তার বহুদূর। কিন্তু, এক্ষেত্রে যতটা না কোনো রাজনৈতিক দলগত বা নীতিগত বৈষম্য ছিলো, মনে হয় তার থেকে বহুগুণে বেশী ছিলো পাড়াতুতো প্রতিযোগিতা। বক্সী-দের বাড়ি সংলগ্ন একটি ক্ষমতাসন্ন নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার ক্রমশঃ বক্সীদের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে তাঁদের অবমাননায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। যে কোনো মতাদর্শের মতো রাজনৈতিক মতাদর্শেরও একটি সুবিধা তা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা

নিজের মতো করে ব্যবহার করতে পারেন। ব্যক্তির উদ্দেশ্য সৎ হলে মতাদর্শের উন্নত দিকগুলি প্রকাশ পায়, অসৎ হলে তা আত্মবিধ্বংসী হয়ে ওঠে। কাজেই একটি মাত্র অপবাদে ললিতমোহনের মতো এক ব্যক্তিকে কালিমালিপ্ত করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। উপরন্তু যে অপবাদের উৎস ধারাবাহিক এক অপবাদমালা (!) যার ভিত্তিও নেহাতই প্রশ্নাতীত নয়। ললিতমোহন তাঁর কর্মদক্ষতা-গুণে যথারীতি ট্রান্সপোর্টে পুনরায় নিযুক্ত হন। ১৯৬০ সাধারণাব্দের ১৫ই এপ্রিল প্রায় দেড় দশক পুরনো কুচবিহারের পরিবহন সংস্থাটি ১৯৫০ সাধারণাব্দের বার্ডে ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন অ্যাক্টের তিন ধারা বলে 'নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন'-এ রূপান্তরিত হয়। জে.এন. তালুকদার আই.সি.এস, নবরূপ প্রাপ্ত এই সংস্থাটির প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন এবং তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিবের পদ থেকে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত উক্ত পদে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ললিতমোহন অবসর গ্রহণের পর থেকে ১৯৬৪ সাধারণাব্দে পরিবহন সংস্থার জলপাইগুড়ি ডিভিশন সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত প্রতিবছর এক্সটেনশনের ভিত্তিতে নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্টের প্রশাসক হিসেবে দক্ষতার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছিলেন(১৭) এবং কয়েক বছর উক্ত কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন(১৮)।

ইংরেজ সরকার কর্তৃক কার্য-দক্ষতার জন্য 'রায় সাহেব' উপাধিতে ভূষিত একজন অসামান্য প্রশাসক, সংগঠক, শিক্ষানুরাগী, নাট্যাভিনেতা ও যন্ত্রশিল্পী (বেহালা), অপূর্ব সূপকার, আলোকচিত্র ও উদ্যানপ্রেমী ললিতমোহন প্রায় ৬৭ বছর বয়সে ১৯৬৫ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার, তাঁর তৃতীয় ভ্রাতা নলিনীমোহনের কলকাতার দমদম গোরাবাজারের বাসভবনে সজ্ঞানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।(১৯) তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সেদিন রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্পোরেশনের সমস্ত কার্যালয়গুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় পরিবহনের পক্ষে পাবলিক রিলেশন অফিসার শ্যামল রায় ও সুপারিনটেনডেন্ট অফ অপারেশন সৌমেন মিত্র তাঁর দেহের ওপর মাল্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।(২০) পূর্বতন কুচবিহার রাজ্যের সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা ছিলো ললিতমোহনের মানস-সন্তান। পরবর্তীকালে তাঁরই আমলে বস্তুত উত্তরবঙ্গের তৎকালীন প্রায় সবকটি রুটই জাতীয়করণের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছিল। শুধুমাত্র বালুরঘাট-কলকাতা রুটটির পরবর্তীতে জাতীয়করণ করা হয়েছিল। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার আধিকারিক স্বরাজ সোম লিখেছিলেন - "...উত্তর বঙ্গ রাষ্ট্রিয় পরিবহন কর্পোরেশনকে রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থায় সড়ক পরিবহন পরিচালনার ক্ষেত্রে অগ্রদূত বলা যেতে পারে।"(২১) কুচবিহারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ-এর আগ্রহ ও প্রযত্নে প্রতিষ্ঠিত এই ঐতিহ্যবাহী পরিবহন সংস্থাটির ললিতমোহনই ছিলেন যথার্থ রূপকার।

নির্দেশিকা:

(১) The Cooch Behar Desk Gazetteer For The Year 1934, Published

under Authority of the State, Printed At The State Press, Cooch Behar, 1934, p. 5.

(২) জেঙ্কিন্স স্কুল শতবার্ষিকী স্মরণী ১৯৬১, ৩শরা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১, জেঙ্কিন্স স্কুল, কুচবিহার, Jenkins School, Cooch Behar, Students passing out of the School, Matriculation Examination, p. 71

(৩) The Cooch Behar Desk Gazetteer For The Year 1934, প্রাগুক্ত।

(৪) সোম স্বরাজ, 'উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রিয় পরিবহন কর্পোরেশনের অতীত ও বর্তমান', নারায়ণ দেব (সম্পাদক), উত্তর সীমান্ত বঙ্গ, শিলান্যাস উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা–১৯৯৪, Govt. Regd. No. R.N. 1850371, Postal Regd. No. WB/COB-28, দীপালী প্রিন্টিং প্রেস, নিউটাউন রবীন্দ্রনগর থেকে সম্পাদক কর্তৃক মুদ্রিত ও নর নারায়ণ রোড, কোচবিহার থেকে প্রকাশিত।

স্বরাজ সোম তাঁর প্রবন্ধে ললিতমোহন বক্সী-কে ১৯৪৩ সাধারণাব্দে কুচবিহার রাজ্যের তৎকালীন ডেভলপমেন্ট কমিশনার বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধ পরবর্তী পরিকল্পনা ও পুনর্নির্মাণের জন্য ১৯৪৪ সাধারণাব্দের ১ জুন ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষে 'ডিপার্টমেন্ট অফ প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' গঠন বিষয়ে ঘোষণা জারি করেছিলেন। ('Post-War Reconstruction', Monthly Labor Review, Vol. 60, No. 4, 1945, pp. 800) উক্ত ঘোষণার ফলস্বরূপ যে কুচবিহার রাজ্যের 'ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-টি গঠিত হয়েছিল তা বলা বাহুল্য। সিভিল ডিফেন্স কমিশনার হওয়ার সাথে সাথে ললিতমোহন ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টে 'ডেভেলপমেন্ট কমিশনার হিসেবে ১৯৪৪ সাধারণাব্দে রাজ-সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের অধীনে থাকা ডিপার্টমেন্টস অফ হর্টিকালচার, ইন্ডাস্ট্রিস, মডেল ডেয়ারি ও ভেটেরিনারি-র কার্যভার কুচবিহার রাজ্যের শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছ থেকে এবং শিল্পবিদ্যালয়ের কার্যভার কুচবিহার রাজ্যের স্টেট ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে যথাক্রমে উক্ত সালের ২৮ নভেম্বর ও ২০ ডিসেম্বর গ্রহণ করেছিলেন। (The Annual Report On The General Administration Of The Cooch Behar State For The Year 1944-1945, Cooch Behar: Printed At The Cooch Behar State Press, 1948, Chapter IV, Production And Distribution, p. 19.)

সোম লিখেছেন ১৯৪৩ সাধারণাব্দে ললিতমোহন আমন্ত্রণ জানানোর জন্য হায়দারাবাদে গিয়েছিলেন। সম্ভবত সালটি তিনি অনুমানের ভিত্তিতেই লিখেছেন। কারণ, ১৯৪২ সাধারণাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কুচবিহারের মহারাজকুমারী মেনকা দেবীর সাথে দেওয়াস জুনিয়র শাখার যুবরাজ (পরবর্তীতে মহারাজা) ক্যাপ্টেন শ্রীমান যশবন্ত রাও ভাও সাহেব পাওয়ার-এর বিবাহের পর পরিবহন সংস্থা প্রতিষ্ঠার বছর অর্থাৎ ১৯৪৫ সাধারণাব্দ পর্যন্ত কুচবিহার রাজপরিবারে উল্লেখযোগ্য কোনো অনুষ্ঠান হয়নি। বর্তমান লেখকের কাছে সংরক্ষিত উক্ত বিবাহের

নিমন্ত্রণপত্রে আমন্ত্রণ জ্ঞাপনের তারিখ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের, ২৮ মাঘ বা ১৯৪২ সাধারণাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি এবং পরিণয় ও ভোজের তারিখ যথাক্রমে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ৭ ও ৮ ফাল্গুন বা ১৯৪২ সাধারণাব্দের ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি লেখা রয়েছে। সুতরাং ললিতমোহন বক্সী ১৯৪২ সাধারণাব্দে (১৯৪৪ সা.অ.?) হায়দারাবাদ গিয়েছিলেন এবং উক্ত সালেই তাঁর মানসে কুচবিহারে সড়ক পরিবহন সংস্থা স্থাপনের পরিকল্পনার উন্মেষ ঘটেছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। সোম লিখেছেন - "সেই বছরই (১৯৪৩ সা.আ.) হায়দারাবাদের নিজাম সরকার রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থায় একটি সড়ক পরিবহন প্রতিষ্ঠা করেন। হায়দারাবাদের সেই সরকারী পরিবহন ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করে স্বর্গীয় ললিত মোহন বকসী উৎসাহিত হন এবং ফিরে এসে কোচবিহারের তৎকালীন মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ন ভূপ বাহাদুরের কাছে একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। (বানান অপরিবর্তিত)" এখানে সোম "প্রতিষ্ঠা" শব্দটি যদি সামগ্রিকভাবে হায়দারাবাদের সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার সূচনা অর্থে ব্যবহার করে থাকেন তবে নিঃসন্দেহে সেটি ভ্রান্তিপূর্ণ। কারণ ১৯৩২ সাধারণাব্দে অর্থাৎ প্রায় একদশক পূর্বে হায়দারাবাদের নিজামের 'নিজামস গ্যারেন্টিড স্টেট রেলওয়ে'-র শাখা রূপে 'এন.এস.আর.আর.টি.ডি.' বা 'নিজাম স্টেট রেল অ্যান্ড রোড ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট'-এর সূচনা ঘটেছিল এবং উক্ত সালে এই সংস্থাটিই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম গণ সড়ক পরিবহনকে রাষ্ট্রীয় রূপদান করেছিল। [Nayeem, M.A., The Splendour of Hyderabad, Hyderabad, 2002, (Orig: Bombay, 1987), ISBN 81-85492-204, S.221.]

(৫) Majumdar Durgadas, West Bengal District Gazetteers, Koch Bihar, February 1977, Published by Shri B.R. Chakraborty, I.A.S., State Editor, West Bengal District Gazetteers and Secretary to the Government of West Bengal, Information and Public Relations Department, at 23 Rajendra Nath Mukherjee Road, Calcutta-700001 and printed by the Superintendent, West Bengal Government Press, 38 Gopalnagar Road, Alipore, Calcutta-700027, Chapter VII, Communications, p. 119.

(৬) সোমে স্বরাজ, প্রাগুক্ত।

(৭) The Cooch Behar Gazette, Monday, April 2, 1945, ১৯শে চৈত্র, সোমবার, ১৩৫১ সাল, ৪৩৫ রাজশক, Part II, p. 281.

(৮) তদেব।

(৯) The Cooch Behar Gazette, April 2, 1945, Part I, p. 139 (Cover and former pages not found).

(১০) তদেব।

(১১) সোম স্বরাজ, প্রাগুক্ত।

(১২) ভদেব।

(১৩) The Calcutta Gazette, Extraordinary, Part I, Jyaistha 20, Saka 1889, Saturday, June 10, 1967, Registered No. C207, No. 430(1), Published by Authority, Printed and published by the Superintendent, Government Printing, West Bengal, at the West Bengal Government Press, Alipore, pp. 1792-1794, para nos. 4, 6.

(১৪) সোম স্বরাজ, প্রাগুক্ত।

(১৫) চট্টোপাধ্যায় লক্ষীনারায়ণ (সম্পাদক), শোকবার্তা পত্রক, মুদ্রণ ও প্রকাশক: জগদ্বন্ধু বসু, কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ কর্পোরেশন প্রিন্টিং প্রেস, ৫ নং। নিলগঞ্জ রোডে, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা।

(১৬) বিশেষ প্রতিনিধি, 'ট্রান্সপোর্ট ডিরেক্টর শ্রীবকসির অমার্জনীয় হৃদ্যয়হীনতা', এক্স-রে (নির্ভীক নিরপেক্ষ সংবাদ সাময়িক), পাক্ষিক, ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৮ই শ্রাবণ, ১৩৬৬ (২৫ জুলাই, ১৯৫৯ সা.অ.), Regd. No. 2926/59, পৃ. এক।

(১৭) সোম স্বরাজ, প্রাগুক্ত।

(১৮) চট্টোপাধ্যায় লক্ষীনারায়ণ, প্রাগুক্ত।

(১৯) চক্রবর্তী প্রণতি, (জন্ম: ১৯ মার্চ, ১৯৩৬, লালমণির হাট) রায়পুর, সাক্ষাৎকার: ১৩, ১৬ মার্চ, ২০২১, গ্রাহক: ঋষিকল্প পাল, মাধ্যম: অডিও রেকর্ডিং।

(২০) চট্টোপাধ্যায় লক্ষীনারায়ণ, প্রাগুক্ত।

(২১) সোম স্বরাজ, প্রাগুক্ত।

বিগত বছর (২০২০ সা. অ.) মহামারীর পরিস্থিতিতে সংস্থাটির হীরক জয়ন্তীও নীরবে অতিবাহিত হয়ে গেলো।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : উত্তর বঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার কুচবিহার স্বামী গিরিশাত্মানন্দজী মহারাজ, রবীন গুহ, জয়ন্তী চক্রবর্তী, প্রণতী চক্রবর্তী, শ্যামাদাশ বক্সী, ড. নৃপেন্দ্রনাথ পাল, তপন কুমার সেন, বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, শুভম সরকার।

❋❋❋❋❋

দিনহাটা মহকুমার চা চাষ ও সম্ভাবনা

সুশান্ত দাম

দিনহাটা মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে তামাক চাষ হয়। কৃষি বিভাগের তথ্য অনুসারে, তামাক দিনহাটা মহকুমার অন্যতম অর্থকরী ফসল। এ কারণেই 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চ' দিনহাটায় তামাক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এখানকার উৎপাদিত তামাক অতি উচ্চমানের। তাই উৎকর্ষতার শিরোপাও দিয়েছে। যদিও বেশ কয়েক বছর ধরে তামাক চাষের অগ্রগতি কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের তামাকনীতি। ভবিষ্যতে তামাক চাষ আরো ব্যাহত হতে পারে এখানকার চাষীদের মনে আশঙ্কা।

উক্ত পেক্ষাপটে অর্থকরী ফসল রূপে বিকল্প কি চাষ করা যায় তা নিয়ে চাষিরা দিশাহীন। শাকসব্জি চাষের আর্থিক দিকটা অনেকটা অনিশ্চিত আবহাওয়ার খামখেয়ালীপনা কখনও অধিক ফলন, কখনও আবার বাজারে দাম পাওয়া নিয়ে চরম সমস্যা সব মিলিয়ে কৃষকরা দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত।

এইসব বিবেচনা করে চাষিরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চা বাগান গড়ে তুলে জীবন-জীবিকা নিশ্চিত করতেই ঝুঁকেছে চা চাষে। দিনহাটা মহকুমার চা-চাষের ভাবনা, কৃষি জমির গুণাগুণ বৃষ্টিপাত সর্বোপরি জলবায়ু সহ পাঁচ বিষয়ে প্রথম বিজ্ঞানিক অনুসন্ধান। মাটি পরীক্ষা একাধিকবার জমি পরিদর্শন ইত্যাদি করেছিলেন চা বিশেষজ্ঞ রামঅবতার শর্মা। তবে দিনহাটায় চা বাগিচা একটি আর্থিকভাবে লাভজনক প্রকল্প তা কৃষকদের বোঝানো ও তাদের মনে বিশ্বাস জাগানো ছিল। দিনহাটার তামাক চাষীদের বংশপরম্পরায় মনে গেঁথে থাকা 'তামাক' চাষের বিকল্প 'চা-গাছ' বাগিচা অর্থনীতি তা তারা কিছুতেই জানতে চায় চাননি।

রাম অবতার শর্মার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সাথে টিবোর্ডও একমত। কিন্তু কৃষকদের তাদের জমিতে চা গাছ লাগাতে রাজি করানোর একটি অসম্ভবকে সম্ভব করতে এগিয়ে এলেন দিনহাটা শহরের গোধূলি বাজার নিবাসী পার্থ প্রতিম সরকার। দিনহাটা শহর থেকে ৮ কিমি দূরে অবস্থিত বৃহৎ গ্রাম ব্রহ্মোত্তর চাউলেরপুটি পার্থ বাবুর কৃষিজমি রয়েছে।

পার্থবাবুর বাল্যকালের মনোমোহিনী চা বাগিচার সবুজ গালিচার সাথে অতিশয় যোগাযোগ। চা বিশেষজ্ঞ রামঅবতার শর্মা তার বিশেষ বন্ধুও বটে। পার্থবাবু তার কৃষিজমির একটি অংশে চা গাছ লাগানোর উদ্যোমে শামিল হলেন।

রাম অবতার শর্মা চা-চারা'র ও ব্যবস্থা করলেন। শুরু হলো এক নতুন কর্মযজ্ঞ। এসব ২০১৬ সালের জুন মাসের কথা। ওই অঞ্চলে বার্ষিক গড়ে একশো কুড়ি ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। জল নিকাশি একটি সমস্যা। চা বিশেষজ্ঞ রামঅবতার শর্মা তার আজীবনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ড্রেনেজের ডিজাইন করে নতুন ড্রেন কাটিয়ে জল জমার (ওয়াটার লগিং) সমস্যাও

অনেকটা কমাতে পেরেছেন। পার্থবাবুর নিজে সারাদিন দাঁড়িয়ে থেকে তার চা বিশেষজ্ঞ বন্ধুর সাথে চা গাছ রোপণের জন্য গর্ত করা, তার গোবর সহ অন্য সব সার ও মাটির সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ওষুধ ইত্যাদি মাটিতে মিশিয়ে শখানেক চা চারা রোপণ করলেন। জলসেচও করলেন। পরীক্ষাতে টিবোর্ডের জলপাইগুড়ি কার্যালয় থেকে দু'জন চা পরামর্শ দাতাও সরোজমিন তদন্তে গেলেন। তারা সন্তুষ্ট হয়ে পার্থবাবুর প্রচেষ্টায় সমবেত অন্যান্য কৃষকদের ক্ষুদ্র চা বাগিচার জন্য টিবোর্ডের নিয়ম-কানুন সহ অন্যান্য আর্থিক অনুদান ইত্যাদি বিষয়ে অবগত করান।

পার্থ প্রতিম সরকার তার নিজের জমিতে লাগানো 'চা চারা' বেঁচে আছে – বাস্তবে তা দেখে তার প্রায় ৩০ বিঘা জমিতে ধাপে ধাপে রাম অবতার শর্মার পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে 'চা চারা' উন্নত মানের সংগ্রহ করে 'চা বাগান' গড়ে তোলেন। চা বাগিচার রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধার্থে পার্থবাবু তার চা বাগানেই অস্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। তার বন্ধু রাম অবতার শর্মা ছ'মাস পর 'চা-গাছের' 'সেন্টার আউট' করা থেকে উপরের সবুজ পাতাগুলো কিভাবে চা গাছের প্রাইমারি শাখার সংখ্যা বাড়ানো যায় এসব প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন পার্থবাবুর উপস্থিতিতে তার কর্মী ও শ্রমিকদের।

পার্থবাবুর ৩০ বিঘা চা বাগানের 'চা গাছ' চা পাতা উৎপাদন শুরু হলো। সৃষ্টি হলো দিনহাটায় এক নব যুগের।

'চা পাতা' মূলতঃ দুটি পাতা একটি কুঁড়ি তুলে প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে পাঠানো শুরু হল ডুয়ার্সের কোচবিহার চা বাগান আঞ্জুমান চা বাগানে প্রসেসিং করার জন্য। টি টেস্টাররাও এই পার্থবাবুর চা বাগানের পাতার গুণগতমান নিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

দিনহাটার এই চা বাগানটি 'বাড়ল ক্ষুদ্র চা-বাগান' রূপে নামডাক ছড়িয়ে পড়লো মহকুমার আনাচে-কানাচে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। উৎসাহিত হলেন অন্যান্য কৃষকরাও। তাদের আদর্শ পথপ্রদর্শক পার্থ প্রতিম সরকার। কৃষকদের আপনজন, কারোর সম্মোধন পার্থদা, অধিকাংশই শ্রদ্ধা করে ডাকেন কাকা-জ্যাঠা বলে।

দিনহাটা মহকুমার ক্ষুদ্র চা বাগিচার যাত্রা শুরু ২০১৬ সালে। পার্থবাবুর থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় তিনি ২০১৬-২০১৭ সালে লাগানো চা-গাছ থেকে কাঁচা সবুজ চা পাতা পেয়েছিলেন বিঘা প্রতি ১২ কুইন্টাল, স্বাভাবিক ভাবে আর্থিক ভাবে চা চাষ একটি লাভজনক কর্মযজ্ঞ তা সবাই বুঝতে পেরেছেন। ফলতঃ পার্থবাবুর উদ্যোগে অন্যান্য পাশের বহু কৃষক এগিয়ে এসে তাদের ছোট ছোট জমিতে অর্থকরী ফসল রূপে চা গাছ রোপন করা শুরু করেছেন।

পার্থবাবুর উদ্যোগে সম্প্রতি তার চা-বাগানেই একদিনের 'চা চাষের প্রশিক্ষণের' ব্যবস্থা করেছিলেন টিবোর্ড হতে। অংশগ্রহণকারী কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেন, টিবোর্ডের ডেপুটি ডাইরেক্টর

এম. হাজরা, অবসরপ্রাপ্ত টি.আর.এর প্রদীপ দত্ত, বিজয় চক্রবর্তী, সভাপতি, সিসটা সহ অন্যান্যরা।

দিনহাটায় আগামী দিনে আরও অনেক চা চাষে এগিয়ে আসবেন তা বিশ্বাস করেন পার্থ প্রতিম সরকার।

অস্বীকার করার উপায় নেই আজও রক্ষণশীল বংশপরম্পরায় তামাক চাষে পরিবারের বর্তমান প্রজন্ম। তামাকের বিকল্প 'চা চাষ' কিনা তা বিতর্ক হয়তো চলবে, তবে দিনহাটার চা চাষিরা স্বপ্ন দেখেছেন। পার্থবাবুর জীবদ্দশায় তারা 'স্বনির্ভর গোষ্ঠী' গঠন করে পার্থবাবুর জমিতে একটি সমবায় চা কারখানা করবেন।

ইতিহাস এভাবেই মানুষ সৃষ্টি করেন। দিনহাটার ক্ষুদ্র চা বাগিচা নিয়ে ভবিষ্যৎ বলতে – চা সদা সবুজ চা বাগিচা প্রকৃতি বান্ধব - দূষণমুক্ত পরিবেশ সহায়ক এবং অর্থকরী ফসল। দিনহাটার প্রতিটি পরিবারে চা বাগিচার সুফল একদিন পৌঁছাবে এবিশ্বাস রাখবো।

✱✱✱✱✱

সোনালী পাতায় রূপোলী রেখা-বিস্ময়ের অন্য নাম জনমত

শুভজিৎ দত্ত

শতবর্ষের দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে জনমত। একটা পত্রিকার কাছে এই গরীমা মুক্তো ঝিনুকের মতোই বুকে ধরে রাখার মতো সন্ধিক্ষণ বটে। শুধু এরাজ্য কেন? প্রতিবেশী বাংলাদেশেরও কোন কাগজের এখনো পর্যন্ত এমন রেকর্ড তৈরি হয় নি বলেই তথ্য বলছে। উত্তরবঙ্গে বসে সাংবাদিকতার ধারণা চালুর প্রবর্তক জনমত তাই সমস্ত দিক থেকেই স্বকীয় বৈশিষ্টে উজ্জ্বল। চিরভাস্বর। শুধু জলপাইগুড়িই নয়। গোটা বাংলার নিরিখেই সাহিত্য ও সংবাদমাধ্যমের ইতিহাসে একটি গর্বের আখ্যান।

জ্যোতিষ চন্দ্র সান্যালের হাত ধরে যবে থেকে পত্রিকা চালু হয় তখনো স্বাধীনতা দূর অস্ত। তাই জনমত দেখেছে দেশকে ব্রিটিশ শাসন মুক্ত করার লড়াই। ১৯৪৭ এর স্বাধীনতার পূণ্য লগ্ন ও দেশ ভাগের কালান্তক স্মৃতি, ১৯৫০ এর কোচবিহারের ভারত ভুক্তি, ১৯৫৯ এর খাদ্য আন্দোলন, ১৯৬৮-র লক্ষীপুজোর রাতে জলপাইগুড়ি শহরে তিস্তার সেই ভয়ঙ্কর বন্যা, ১৯৭৫-৭৭ এর জরুরী অবস্থা, ১৯৭৮ এ বাম ফ্রন্টের উত্থান কিংবা হালের বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের দেশ- রাজ্য শাসনের সিংহাসনে পৌঁছে যাওয়ার অভিজ্ঞতার ভান্ডারে উপচে পড়েছে তার ঝুলি। এই নিদর্শন আর কজনের আছে?

একটা সময় ছিল কয়েক হাজার কাগজ ফি সপ্তাহে পৌঁছে যেত উত্তরবঙ্গের আনাচে কানাচে। মালদা থেকে আলিপুরদুয়ার বিভিন্ন স্থানে জনমতের প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁরা সংবাদ সংগ্রহ করে পাঠাতেন। সেটা অবশ্য ই-মেল চালাচালি বা হোয়াটসঅ্যাপের যুগ নয়। হাতে লিখে ডাকে বা বাসে করে সংবাদ পাঠাতেন কাগজের সাংবাদিকরা। জেলা সদরগুলিই শুধু নয়। সেসময় জনমতের কান্ডারিরা প্রত্যন্ত এলাকাকেও যে সমান গুরুত্ব দিতেন তার প্রমান ডুয়ার্সের চা বলয়ের মালবাজার বা নাগরাকাটার মতো স্থানে মহাবীর ছওছড়িয়া, ধীরেন্দ্রনাথ দিগপতিদের কাগজের প্রতিনিধি হিসেবে রাখা। এখনকার মহকুমা শহর মালবাজার তখন কার্যত গ্রামই। চা বাগান-জঙ্গল ঘেরা গন্ডগ্রাম নাগরাকাটার পরিচয় ছিল শুধু ম্যালেরিয়ার আতুড়ঘর হিসেবে।

আলিপুরদুয়ারের সাংবাদিক ছিলেন কমল চক্রবর্তী। কাজের জন্য মস্ত কিছু সান্মানিক যে তাঁরা পেতেন তা কিন্তু নয়। আসলে এটাকে ব্রত বলে ভেবে নিয়েছিলেন সমাজ অন্ত প্রাণ মানুষগুলি। এর মূলে ছিল জনমতের ক্যারিশমা। উত্তরের মানুষের কাছে এই কাগজ ছিল তাঁদের মুখপাত্র। তা না হলে তথ্য বলছে ১৯৫০ সালের যেদিন কোচবিহার ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় সেদিন শুধু ওই জেলাতেই কয়েক হাজার পত্রিকা পৌঁছেছিল দুয়ারে দুয়ারে। দেশে সেসময় আর কোন এমন সংবাদ মাধ্যম ছিল কিনা যারা ওই ঐতিহাসিক ঘটনাকে অক্ষরের ডালিতে

নথিবদ্ধ করে রেখেছে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে বৈকি। আজও বিভিন্ন গ্রন্থাগারে খুঁজলে সেই সংস্করণ মিললেও মিলতে পারে।

ব্রিটিশ ভারতে শাসকের রক্তচক্ষুর সামনেও পড়তে হয়েছিল জনমতকে। ছাপাখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল একসময়। জলপাইগুড়ি শহরের সেই ভয়ঙ্কর বন্যাতেও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় ছাপা খানা। জল নামলে সমস্ত যন্ত্রপাতি আর কলকজাতে তখন পুরু বালির আস্তরণ। জন্মলগ্ন থেকেই জনমত সাপ্তাহিক ভিত্তিতে মুদ্রিত হয়। ১২-১৪ পাতার কাগজ ছাপানো সেসময়ে খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। সেটা করে দেখিয়েছিলেন পত্রিকার প্রাণপুরুষরা। মালদা থেকে কোচবিহার সর্বত্র পৌঁছে যেত জনমত। উত্তরের এমন কোন গ্রন্থাগার বা স্কুল পাওয়া যাবে না যেখানে কাগজ যেতো না। আজও সমাজ গবেষণার মস্ত বড় হাতিয়ার হতো কাগজের পুরনো সংস্করণগুলি। এই পত্রিকার হাত ধরেই উন্মেষ হয়েছে বহু লেখক, কবি, প্রাবন্ধিকের। যারা পরবর্তীতে স্বগুণে আরো প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন সাহিত্য জগতে। জ্যোতিষ চন্দ্র সান্যালের পর সত্যেন্দ্রনাথ মল্লিক, কুমুদিনীকান্ত চক্রবর্তী, ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল, মুকুলেশ সান্যালের মতো ব্যক্তিত্বদের আলিঙ্গণে ধন্য হয়েছে জনমতের প্রতিটি পৃষ্ঠা। কাগজের সাথে সম্পর্ক ছিল মানিক সান্যাল। এমন গুনীজনদের নামের তালিকা লিখে শেষ করার মতো নয়। চা বাগানের মালিক থেকে শুরু করে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি। জনমতের স্পর্শে এসেছেন প্রত্যেকেই। শ্রেণী বৈষম্যকে কোথায় যেন ফুতকারে উড়িয়ে দিতে পেরেছিল এই কাগজ। বয়স স্রেফ একটা সংখ্যা মাত্র। এই আপ্ত বাক্য জনমতের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। যে কারনে ৯৮ বছরের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাওয়ার পরও এখনো সে সমান সতেজ। অন্তহীন পথের পথিক। হয়তো ক্লান্তি নেমে আসে কখনো সখনো। ডিজিটাল আগ্রাসনের সামনে নিজেকে মেলে রাখতেও সমস্যার মুখে পড়তে হয় আকছার। তবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বিশ্বাস করে জনমত শুধু শতায়ু হয়ে রেকর্ডই সৃষ্টি করবে না। চিরসবুজ থেকে এভাবেই এগিয়ে যাবে বছরের পর বছর। শুধু এক জনের হাত থেকে ব্যাটন ধরবেন অন্য কেউ।

কৃতজ্ঞতা ঃ

রাম অবতার শর্মা, সুবর্ণ রুদ্র।

(তথ্যগত কিছু ভুল থাকলে অজ্ঞানতা মার্জনীয়)

✠✠✠✠✠

কোভিড প্রহসন

প্রসূন শিকদার

– আপনার পেশেন্ট কোভিড পজিটিভ। আইসোলেশনে পাঠাতে হবে।

– ওহ, তাহলে কি পেশেন্টের সাথে আর দেখা করা যাবে না?

– না।

– কিন্তু টাকা তো পেশেন্ট পার্টির ঘাড় মটকে .....

– পেশেন্ট সিরিয়াস। তাড়াতাড়ি বলুন।

– তার মানে পেশেন্ট বাঁচতে নাও পারে।

– বাঁচা মরা আমাদের হাতে নেই।

– তাহলে তো আপনাদের পুরোটাই লাভ।

– মানে

– ক'দিন পরে পেশেন্ট কে মেরে দেবেন আর কিডনি, লিভার, চোখ, রক্ত সব বেঁচে দিয়ে আমাদের প্লাস্টিকের মোড়ক দেখিয়ে বলবেন – দূর থেকে দেখে নিন, আপনার রিলেটিভ...

✠✠✠✠✠

A Stretch Into Oblivion
Natasha Sharma

Life can stretch itself to oblivion, losing sight of
Where it began and why it continues its existence.
Every moment feels elongated between two poles,
Both of which ae anchored on the swampy
Grounds of doubt.
Desperation enfolds you, letting you take a peak
Into its deepest recesses.
The eyes rest on a spot.
That spot becomes a screen where a thousand
Different scenes are enacted
It's not a fight against anything,
But a surrender to everything.
You visit the past in new ways everyday,
While the wheels of the present remain stuck.
Such a stretch, of time, space, existence.

Scarecrows!
Vishwajit Sharma

From the inner recesses
Blows forth a fire of anguish,
Kissing everything around it.
You see those without that
Fire : carcasses clothed with
Slabs of flesh here & there.
The amputated soul lingers
Around, waiting to breathe life
Into the scarecrow. A
Scarecrow convincing itself of
Its importance, but withering
Bit by bit, every single second.
Inside, there's a desert with
The oasis having been wiped
Out long time back.

প্রথম রেখা

সলিল আচার্য

অশেষ দুঃখিত, কথা রাখতে পারিনি।
সময় বয়ে গেছে
কালক্ষেপের ছন্দ-লয়ে
বলি, অশেষ দুঃখিত।

* * *

রামায়ণের ভাষ্য পাঠ চলছিল চন্ডীমন্ডবে
ব্যক্তি রামচন্দ্র অবতার রামচন্দ্রে উত্তীর্ণ হলেন
এলো সেই থেকে রামরাজ্য।
হরধনু ভাঙ্গলেন বীর কৌশল্যা-নন্দন সীতা হস্তগত
রাজ কুল নন্দিনী সীতা।
বিবাহ বন্ধনে এলেন দু'জনায়।
তখন, ধাতু অনাবিস্কৃত, কাঠের লাঙলই শস্য দেয়
আরও পরে, অনেক পরে এলো লৌহ ফলার লাঙল
পেলব সোনা মাটির বুকে আঁচর কাটলো লাঙল,
অকৃপণ, অকাতরে সবুজ সমৃদ্ধিতে ভরলো রামরাজ্য।
রামায়ণ লেখা হ'ল চষা মাটিতে।
ভাষ্য পাঠ অবগত করছে জনম দুঃখিনী সীতা
আজও সীতা সীতা সীতা-ই
উত্তর ভারতে এখনো মানুষের দেহাতী ঠোঁটে ঠোঁটে ধ্বনিত,
শস্য ফলানোর উর্বর মাটিতে লাঙলের অক্ষরে লেখা
করতলের নিবিড় নীলিমায় চাষের প্রথম রেখাই হ'ল সীতা
চাষের প্রথম রেখাই হ'ল সীতা
চাষের প্রথম রেখাই হ'ল সীতা।

অন্য গোফুর

প্রতীপ মুখার্জী

গোফুর না?
আরে না,না - এ কি বলছেন?
এ যুগে শরৎ চাটুজ্যের গোফুর কে
আর কোথায় পাওয়া যাবে?
যদিও এখনও ওরা কিন্তু আছে
আর ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে,
আরও বেশী বেশী করেই!
দেখছেন তো সারা দেশেই রোজই
কত গোফুর আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে।
আর মুনিবদের থেকেও হাল খারাপ
– এখন মহেশদের,
যন্ত্রের যুগে ওরাও ক্রমাগতই হয়ে উঠছে অপ্রাসঙ্গিক!
আসলে আমি এক অন্য গোফুরের কথা বলছি –
গোফুর মানে প্যান্ডেল মিস্ত্রি গোফুর শেখ।
ও ধর্মাচারণ করে অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে।
জুম্মাবারে নামাজ পড়ায়
ওর ফাঁক পড়েনা কোনদিনও।
আবার রমজান মাসে রোজাও রাখে।
এতো হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম
তার সাথে উপোস করলে কষ্ট হয় না?
ফুৎকারে সেসব উড়িয়ে দিয়ে জবাব দেয়
উপোসও গরীবকে কাবু করতে লারে দাদাবাবু!
সেই গোফুর যখন বলে ওঠে
ঈদ লয়, সবচেয়ে বেশি আনন্দ করে দুর্গা পূজা এলে
নূতন জামা কাপড়ও পরে - অবাকই লাগে!
যখন বলি - সে কিগো, ঈদের সময় পরো না?
পরিনা বলবো না দাদাবাবু,
ইচ্ছাও থাকে - যা জিনিসের দাম।

তাই সব বছর কিনতে লারি।
আমাদের ঈদ তো আর।
দুগ্গা পূজার মতো লয় গো,
বছরের নানান সময়ে ঘুরায়ে ফিরায়ে আসে।
তাই অনেক ঈদের সময় তো-কাজই থাকে না।
আর দুগ্গা পুজার সময় হয়
কত রকম সব বাহারী প্যান্ডেল।
কাজও জোটে - হাতে পয়সাও থাকে
ছাগুলানকে বৌটাকে জামা জুতা কিনেও দিই
ছা গুলাও ঢাকের তালে তালে পাড়ায় গাঁয়ে
আনন্দে নাচে নাচে ঘুরে বেড়ায়।
কেন গো দাদাবাবু?
দুগ্গা মা কি আমাদের মা লয়?
আর হাতে পয়সা আর পেটে ভাত জুটলে
তবেই তো পরব - লয় কি?
ওর কথা শুনে, শুধু ভাবি,
আর ভেবেই চলি -
গোটা দেশটা যদি
গফুরের মতো ভাবতে পারতো???

স্বপ্নের দৌড়

নিশিকান্ত সিনহা

শূন্য মাসে নাকি বদলে যায় জীবন
রব উঠেছে ঝড়ের বেগে
গুজব ছড়ানোর মতো কথা
জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায় অনেক দুরে
কিছু কথা উপলব্ধির তড়িৎধ্বনি হয়ে
ঘুরপাক খায় মস্তিষ্কের দোড়গোড়ায়
আমি উদ্‌ভ্রান্তের মতো খুঁজে চলেছি
জীবন বদলের চাবিকাঠি
উদ্দেশ্যহীন আঘাত
নির্বিকল্প অসহায়তার আখ্যান করছে বিবৃত
তার মধ্যেই আবর্তিত হচ্ছে জীবনের আহ্নিক গতি
চেনা জীবনের পরতে পরতে খুঁজি অচেনা জীবন
অগাধ স্বপ্ন দেখা আমার অভিমানী মুখ
জীবন মঞ্চে আল্‌তো স্পর্শে বাজায় সেতার
আমার বুকের খাঁজে খাঁজে
আমি আজও খুঁজে চলেছি
জীবন বদলের চাবিকাঠি।

ঋণ

অমিত কুমার দে

আমার একটাই ক্ষেত
আমার স্বরবর্ণ আমার ব্যঞ্জনবর্ণ
সেখানেই প্রোথিত
আমি জল দিই, চারাগাছ
মাথা তোলে
অক্ষরমালায় আমার জৈবিক সার –
আমি মেঘনাকে ডেকে এনে
আলপথের পাশেই বসাই
আমি তিস্তাকে ডেকে এনে
খামারের উঠোনে বসাই
এ দেশের শালিক
ও দেশের দোয়েল
বাংলা বাক্য ঠোঁটে নিয়ে
শ্লোক বলে প্রবাদ ছড়ায়
এখানে সকাল আসে,
রাত ঢলে পড়ে
প্রভাতী মনের সঙ্গে, ঘুম ঘুম
ছন্দে ছড়ায়
আমার শোকের দিন আমার
সুখের দিন
মাতৃভাষার কাছে করে চলে
আকাশের ঋণ।

যদি সেতার বাজাতে জানতাম

রাজা চক্রবর্ত্তী

সেতার বাজাতে জানলে খুব ভাল হতো।
আমার দুঃখ গুলোকে শিবরঞ্জনী ঢেলে দিতাম।
জয়জয়ন্তী কে মলম বানিয়ে সব ক্ষতগুলোকে সারিয়ে তুলতাম।
অভিমান গুলোকে ইমনের খাদে উল্টে দিতাম।
স্মৃতিগুলোকে আরেকবার ঝালিয়ে নিতাম সিন্ধু ভৈরবী সঙ্গে আলাপ করে।
পুরুষের কান্না হয়তো ঢেকে যেত তিলক কামোদ রাগের রিসপের সুরে।
সেতার বাজাতে জানলে খুব ভালো হতো।

রাতের আকাশের তারারা মিটমিট করত সেতারের ঝালাসির সুরে তালে।
দূরে আকাশে চাঁদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব শুনত আর হাততালি দিতো।
রাতে দু-একটা তারা নাচতে নাচতে খসে পড়তে মালকোশের সুরে।
পূর্ণিমার আকাশে জমাটবাঁধা মেঘগুলো বৃষ্টিকে সাথে নিয়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে ও
প্রান্ত দৌড়ে বেড়াতো, মেঘমল্লারের ঝংকারে।
খুব ভালো হতো যদি সেতার বাজাতে জানতাম।

পৃথিবীর যাবতীয় প্রেমের সপ্তডিঙা নিয়ে ডুবে যেতাম।
আমার চোখে তখন শুধুই নারীর মতো পদ্মফুল ফুটে থাকতো আকাশে বাতাসে।
সমস্ত চিন্তা শক্তি জলাঞ্জলি যেত, নর্তকীর মতন নেচে নেচে ঘুরে বেড়াতো এদিক
সেদিক সেতারের আহরণ ও অবরোহনের রাগের মূর্ছনায়।
চোখের চারিদিকে ভাসতো শুধু ঘুঙুর ও ঘাগরার ছোবল।
চলত তবলার লয়কারি।
ঘাগরার ছোবল এদিক সেদিক মারতে মারতে তেহাই তে গিয়ে কখন যে দরবারী
কানাড়ার সোম ও ফাঁকে মিলে যেত।
কি ভালোই না হত যদি সেতার বাজাতে জানতাম।

অধরা

গায়েত্রী দেবনাথ

১

বাঘটা পাগল হয়ে গিয়েছে
হরিণের চারদিকে ঘুরে গজরাচ্ছে
তবুও খাদ্য বানাচ্ছে না।
বেড়ালের শান্তি দেখে বাঘটা
শান্তির নিশ্বাস ফেলছে।

২

চারদিকে মনের, পৃথিবীর, নাম কুমারীর, প্রেমীর আবর্জনা
আবর্জনা আর আবর্জনা, সহ্য করা যাচ্ছে না।
মৃত্যুর দুয়ারে জীবনের দৃষ্টির ক্ষীণ আলো পৌঁছয়
মৃত্যু হঠাৎ কি-বোর্ডের তরঙ্গে
বিবর্ণ হলুদ সংবাদে কিংবা চিন্তামগ্ন অন্ধকারে
অথবা কবির কবিতায় ঈশ্বর হয়ে ধরা দেয়।

পরিচয়

ডঃ আহমেদা আহমেদ্

যে দর্পনে আমার মুখছবি মেলে না,
সে দর্পন সরিয়ে নাও
আমাকে আমার মত থাকতে দাও।
আমি খেলবো ঝরা শালফুল নিয়ে,
গোধূলির উদাসীনতায় দেবো আলিঙ্গন,
কিম্বা বসন্তের বাঁশিতে ভার দেবো আবেগের উচ্ছলতা –
রাত্রির শুকতারা হয়ে ভেসে বেড়াবো
কারো ব্যথার আকাশ কোল ভরে –
এমনি করে নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায় কত পরিচয়ে;
এমনি করে নিজেকে ভালবাসা যায় –
সবার পরিচয়ে রেখে পরিচয়

আগমনীর আনন্দ

পাপড়ি ধর পাপড়ি

জীবন মানে হাঁসি কান্নার ছন্দে ভেসে যাওয়া
আগমনীর দিনগুলো হাতের করে গোনা
আমার পূজা তোমার পূজা সকলের পূজা
নানা দুঃখ কষ্ট মনের গভীরে ব্যথা
সব দুরে ছুড়ে আনন্দ উৎসবে মাতা
সবাই প্রাণ ভরে নাচবে বুনটির নৃত্য
ঢাক বাজাবে ঢাকি মশাই মনে নিয়ে আশ
এই ভাবেতেই আগমনীর দিনগুলো করি অর্ঘ
বারবার আসে ফিরে ফিরে
আমার পূজা তোমার পূজা সকলের পূজা
শারদীয়া উৎসব দুর্গাপূজা।

ইহজন্ম

বাবলি সূত্রধর সাহা

বেঁচে থাকার অবসাদে
জীবনের অনেকটা অংশ
স্থবিরতার শাসনে অনুর্বর থাকে।
ছায়াময় বন্ধন, নীলচে বিশাদ
ভেঙ্গে দেয় সুখের বাতিঘর;
আধখানা চাঁদ ভেসে থাকে
ইহজন্মের নিস্তরঙ্গ জলে –
অনন্ত কালের অপেক্ষা আর
ভুমিহীন নির্মানের প্রত্যাশায়
শধুই অর্ন্তযামীর স্বীকারোক্তি।

নীটফল

মণিভূষণ রায়

আশার মুকুলগুলি ঝ'রে পড়ে।
অজস্র মুকুল থেকে কুঁড়ি আসে
অতি সামান্যই।
কুঁড়িগুলো সব ফল হয় না
তারাও ঝ'রে পড়ে বেশির ভাগই।
থাকে যে ক'টা ফল অবশেষ কালে
তারাই তো এত কিছু উদ্যোগের
নীটফলাফল।

দিলীপ চক্রবর্ত্তী স্মরণে

দয়াল পাল

হে দিলীপ চলে গেছ বহু দূরে
তুমি ছিলে অবহেলিত ধুবড়ী জেলার
সংবাদ জগতের ধ্রুবতারা
কঠোর পরিশ্রম করে বাচিয়ে রেখেছিলে
সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গণচাবুক'
আরও প্রকাশ করিছিলে
'নর্থ ইষ্ট ইকো' মানে
উত্তর পূর্বাঞ্চলের আওয়াজ
বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তির লেখায়
সমৃদ্ধ ছিল কাগজ দুখানি
এই বছর ছিল গণচাবুকের স্বর্ণ জয়ন্তী
প্রস্তুতি নিয়েছিলে ব্যাপক ভাবে
সমস্ত প্রস্তুতি ফেলে রেখে চলে গেলে অকালে
নিঃশেষ করে গেলে তোমার অসমাপ্ত কাজ
দীর্ঘ ৫০ বছরের তোমার উদ্দীপ্ত কলম
শেষ হয়ে গেল কলমের কালি
তোমার বহুমুখী প্রতিভা আজ শূন্য
সাংবাদিকতায় তুমি ছিলে ধ্রুবতারা
অসমীয়া, বাংলা, ইংরাজীতে ছিলে সব্যসাচী
বিভিন্ন ভাষায় গল্প, কবিতা,
প্রবন্ধ আদি লিখেছিলে
আইনজ্ঞ হিসাবেও ছিল তোমার দক্ষতা
তুমি ছিলে অসীম সাহসী
থানা-পুলিশ-কোর্ট-কাছারী
কাউকে রেহাই দেওনি তুমি
ফলে তোমাকে ভোগ করতে হয়েছে
বহু নির্য্যাতন, শারীরিক, মানসিক
তবু স্তব্ধ হয়নি তোমার কলম
বাগ্মীতায় ছিল তোমার অসামান্য পারদর্শিতা
তুমি ছিলে সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে
অসমীয়া-বাঙালী-হিন্দু-মুসলমান
সকলের প্রতি ছিল তোমার সমদৃষ্টি।

বেঁচে আছি

দিলীপ কুমার চক্রবর্ত্তী

বেঁচে আছি
বেঁচে না থাকার মতো
কেবলমাত্র স্মৃতিগুলো স্মরণ করে।

এক অদ্ভুত সময় বর্তমানে
বিশ্বাসহীনতা, ঘৃণা আর বিদ্বেষের
প্রতি মূহূর্তে আতঙ্ক আর ভয়
নিষ্ঠুরতার অন্ধকার
ছেনে ধরে পৃথিবীকে
শান্তি যেন দূর অস্ত।

মরম, ভালোবাসা, স্নেহ, শ্রদ্ধা
ক্রমেই যেন সরে যাচ্ছে
শিশু থেকে বৃদ্ধ
বিশ্রামের সময় নেই
একটু মিষ্টি ডাক দেবার সময় নেই
অথচ শান্তি চায় সকলেই।

অস্থির সময়কে স্থির করার
আর একটি যুদ্ধের বড় প্রয়োজন
শান্তির জন্য, কেবল শান্তির জন্য।

এ এক অন্য পৃথিবী

কল্লোল ভাদুড়ী

মৃত্যুকে কোলে নিয়ে ....
শুধু করেছি এ পথ চলা
বৃষ্টির সূতোর সেলাই করেছি
নদী নালা খাল বিল।
স্থিতধী যৌবন আঁকড় ধরে
চলেছি পথ, কখন এসে
থমকে যাবে নদীর পাড়ে
আশা নিরাশার বাঁকে একফালি
সূর্য উকি – দিয়ে বলে
এসো আলিঙ্গন করো সমষ্টিতে।

রূপকথার গল্প

অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

রাত এখন গভীর।

রাস্তায় কুকুর গুলো কেন জানি তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করছে।

এ পাড়ায় ১৭ নম্বর বাড়ির সব ঘরের আলো নিভানো হলেও দোতলার কোণের ঘরে আলো জ্বলছে।

ঘরে বিছানার উপর দু'জন বসা। ভবতোষ আর স্বর্ণবালা। দুজনের মুখেই ডাবল মাস্ক।

– তাহলে এখন কী হবে? স্বর্ণবালার ভয়ার্ত কণ্ঠস্বরে বিব্রত হয়ে ভবতোষ বললেন, কিই আবার, সবার যা হচ্ছে আমারও তাই হবে। কাল সকালে সূর্য ওঠার আগেই আমাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমি এ্যাম্বুলেন্স ঠিক করে রেখেছি। ঠিক ভোর পাঁচটায় ওরা এসে যাবে।

– কিন্তু এই অসুস্থ শরীর নিয়ে তুমি কোথায় যাবে গো? এমনিতেই তোমাকে রোজ দশটা ওষুধ খেতে হয়। কে তোমাকে নিয়ম করে ওষুধ খাওয়াবে?

কান্না ভেজা গলায় ভবতোষ বললেন, কোথায় যাবো, জানিনা। এখানকার হাসপাতালে কোন জায়গা নেই। শিলিগুড়ির কোন নার্সিংহোমে ভর্তি হতে হবে।

স্বর্ণবালা আবারো উৎকণ্ঠিত হলেন।

– পরীক্ষার সময় তো আমাদের দু'জনেরই নাম-ঠিকানা বিস্তারিত ভাবে জানানো হয়েছিল, তাই না?

ভবতোষ বললেন, হ্যাঁ। সব কিছুই জানানো হয়েছিল।

– সর্বনাশ! ঢুঁকরে কেঁদে উঠলেন স্বর্ণবালা। কাল সকালে যদি মিউনিসিপ্যালিটির লোকজন বাড়ি স্যানিটাইজ করতে এসে কনটেইনমেন্ট জোন বোর্ডটা ঝুলিয়ে দিয়ে যায়, তা হলে? উদ্বিগ্ন হয়ে ভবতোষ বলেন তাহলে কি স্বর্ণ?

– আমাদের মেয়ের বিয়েটাই বন্ধ হয়ে যাবে?

ভবতোষ হাসবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। হাসি এলোনা। মুখখানা কান্না কান্না দেখালো। জ্বর, ডাক্তার, ওষুধ, সোয়াব পরীক্ষার দৌলতে ভুলেই গিয়েছিলাম আগামী মঙ্গলবার অর্থাৎ আর তিনদিন বাদে তাদের একমাত্র মেয়ে বুলুর বিয়ে।

ম্লান মুখে ভবতোষ বললেন, বুলুতো গত একমাস ধরে মামার বাড়িতে আছে। আর বিয়েটা হচ্ছে 'হল' ভাড়া করে, সমস্ত রকম বিধিনিষেধ মেনে। বরযাত্রী আসবে মাত্র ১২ জন। তাহলে বাধা কোথায়?

স্বর্ণবালা চোখের জল আঁচল দিয়ে মুছে বললেন, বাধা তুমি। করোনা পজেটিভ।

– তো কি হয়েছে? তুমি তো নেগেটিভ। যার বিয়ে সে তো একমাস ধরে মামাবাড়িতে। বিয়ে হচ্ছে ভাড়া করা অন্য বাড়িতে। এই বাড়িতে থাকার মধ্যে একমাত্র তুমি। আমিতো হাসপাতালে চলে যাচ্ছি। ভয়টা কিসের?

– কাল সকালে লোক জানাজানি হলেই আমাদের বাড়িটা সোশালি বয়কট হয়ে যাবে। এলাকাটাই কনটেনমেন্ট জোন হয়ে যাবে। পাড়া-প্রতিবেশী, স্বজন-পরিজন–এ বাড়ির ত্রিসীমানায় পা বাড়াবে না। আমি গৃহবন্দী হয়ে যাবো। সমস্ত সম্পর্কের খাঁজে খাঁজে ফুটে উঠবে অনিশ্চয়তা। এই অবস্থায় আমার কি হবে গো। বেঁচে থাকবো তো?

স্বর্ণবালার কথাগুলো যেন কথা নয়, বুকে ছুড়ি বসানো। ভবতোষের মনে হলো, স্বর্ণবালা যা বললেন, তার এক বর্ণ মিথ্যে নয়। এই অতিমারির অনিশ্চয়তায় বাজারে কোন্ ভবতোষ সান্যালের মেয়ের বিয়ে হলো কি হলো না, তার খবর কে রাখবে? সবাইতো গৃহবন্দি! মানুষের এই চরম বিপদের সময় নিয়ে কথা বলার ব্যবস্থা যাদের উপর ন্যস্ত, সেই সোশ্যাল মিডিয়া এই বিষয়টি নিয়ে একেবারে নিশ্চুপ না হলেও সোচ্চার নয়।

স্বর্ণাবালাকে চোখ মুছতে দেখে ভবতোষ বললেন, তুমি কাঁদছো?

স্বর্ণবালা ধরা গলায় বললেন, কাল বিকেলে দাদা বৌদির সঙ্গে বুলু যখন আসবে, তখন উঠবে কোথায়?

এবার ভবতোষেরও চোখে জল এলো।

কী নিষ্ঠুর পরিহাস!

একমাত্র মেয়ের বিয়ে। কোথায় আলোয় মালায় বাড়ি সেজে ঝলমল করে উঠবে, তা নয়। মেয়ে এসে কোথায় উঠবে, তার ভাবনা ভাবতে হচ্ছে।

ভবতোষ বললেন, সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। মানুষ এখন সামাজিক নয়। একটা সর্বনাশা ভয় তাকে ঘিড়ে আছে। তাই যে বাড়িটা বিয়ের জন্য ভাড়া নিয়েছি, সেখানে থাকার ব্যবস্থাও আছে। রান্নার ঠাকুর, কাজের লোক কাল সকালেই এসে যাবে। বুলুরা ওখানেই উঠবে। বাড়িওয়ালাকে আমি বলেছি সব। সে আর তার স্ত্রী ওদের সব ব্যবস্থা করে দেবে। তুমিতো যেতে পারবেনা। তাই ক্লাবের ছেলেরা এসে বিয়ের সবকিছু ওই বাড়িতে নিয়ে যাবে। ভেবো না সব ঠিক হয়ে যাবে। ক্লাবের ছেলেরা তোমার সঙ্গে আছে যখন যেটা প্রয়োজন ওদের টেলিফোন করবে। বুলুকে এখন কিছু ব'লোনা। ওর মন ভেঙে যাবে। হয়তো বিয়েটা ভেঙে দেবে।

স্বর্ণবালা বললেন সেই ভালো বিয়েটা পিছিয়ে দাও।

– এই মুহূর্তে বিয়ে বন্ধ করার অনেক অসুবিধে। দু'পক্ষেরই অনেক ক্ষতি হবে। তাছাড়া আরও একটা কারণ আছে স্বর্ণ, যা শুনতে তোমার খারাপ লাগবে। শুনেছি বয়স্ক মানুষের মৃত্যু হার নাকি বেশি। হাসপাতালে যদি মরে যাই। যদি আর কোনদিন ফিরে না আসি?

ভবতোষ এর মুখের মাস্কের উপর হাত রাখলেন স্বর্ণবালা। 'এ্যাই চুপ করো। মরে যাই বললেই হলো। উপরে ভগবান নেই। কখনো কোনো অন্যায় করনি। ভগবান এতো নির্দয় হবেন কেন?

ভবতোষ ঘামছিলেন

ভগবানকে দোষারোপ করে কি লাভ। বয়েস হয়েছে। দশ রকম অসুখে ভুগছি। কোমর্বিডি পেশেন্ট। ফিরে আসা কঠিন।..........>.

রাত আরোও গভীর হয়ে গেছে। বাইরের আমগাছে কোঁক কোঁক করে একটা প্যাঁচা ডাকছে। স্বর্ণবালা বললেন – ছোটবেলায় মা বলতেন, প্যাঁচার ডাক অমঙ্গলের চিহ্ন। আমার বড় ভয় করছে গো।

ভবতোষ ক্লান্ত স্বরে বললেন, আমি ভাবছি অন্য কথা।

কী এমন কথা, যা এই সময়ে তোমাকে ভাবতে হচ্ছে? যদি আমার কথা হয়, তা হলে ভেব না, আমি ঠিক চালিয়ে নেবো।

তোমার কথা ভাবাতো আমার কর্তব্য। কিন্তু তা নয়, আমি ভাবছি টাকার কথা। বুলুর বিয়ের খরচের জন্য দুটো ফিক্স ডিপোজিট ভাঙিয়ে ব্যাংকের সেভিংস একাউন্টে ৭ লাখ টাকা জমা করেছিলাম। সেই টাকায় এখন হাত পড়েছে। নার্সিংহোমে ভর্তি হতে হলে বেশ কিছু টাকা এ্যাডভান্স করতে হবে। জানিনা সেটা কত। দুটো ব্ল্যাংক চেক সঙ্গে নিয়ে যাবো যদি প্রয়োজন হয়। ক্যাটারিং ডেকোরেটর বিয়ের হল ভাড়া, কাউকেই এখন কিছু দিওনা। সব পরে হবে।..........

আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না ভবতোষ। স্বর্ণলতাকে বুকে টেনে নিয়ে কান্না ভেজা গলায় বললেন কি অদ্ভুত তাইনা? তুমি হোম কোয়ারেনটাইনে থাকবে, আমি নার্সিংহোমে। আর মেয়ের বিয়ে 'উৎসব ভবনে'। ভাগ্যিস মামা-মামীমা সঙ্গে থাকছে। না হলে কন্যা দান করার লোকও থাকত না। হাউমাউ করে দুজনেই কেঁদে উঠলেন।.......

পরের ঘটনা সামান্য।

বুলুর বিয়েটা হয়েছিল। ক্লাবের ছেলেরা পিপি (করোনার পোশাক) পরিয়ে স্বর্ণলতাকে বিয়ের প্রাঙ্গণের কাছে নিয়ে দূর থেকে বিয়ে দেখিয়ে এনেছে। বিয়ে, বাসি বিয়ে একদিনে শেষ করে বর-কনে ভোররাতেই কোচবিহার রওনা হয়ে গেছে!

বর-কনে দুজনেই রুম আইসোলেশনে থাকবে। মুখে মাস্ক! বৌভাত ফুলশয্যা করোনা রিপোর্ট না আসা অবধি হবে না। দুজনে আলাদা ঘরে থাকবে।........

আর ভবতোষ সান্যাল নামে অতি সাধারণ একজন বর্ষীয়ান কোমর্বিডি রুগ্ন মানুষ শিলিগুড়ি শহরের একটি নামি দামী নার্সিংহোমে তেরোদিন ভেন্টিলেশনের ঠাণ্ডা ঘরে হাওয়া খেয়ে গতকাল ভোর চারটে পয়তাল্লিশ মিনিটে চিরকালের জন্য চোখ বুঝেছেন!

আশ্চর্য হল এই, ঐ যে তিনি ভেন্টিলেশনে ঢুকলেন তারপর তাকে দেখা তো দূরের কথা নার্সিংহোমের ডাক্তারবাবু বা নার্সদের কাছে টুকিটাকি খবর পাওয়া ছাড়া – টেলিফোনেও তার কণ্ঠস্বর কেউ শুনলো।......

সকাল আটটা নাগাদ খবরটা এসেছিল।

মৃত্যুর সঙ্গে পাওনার খবর। অগ্রিম টাকা বাদ দিয়ে বকেয়া নার্সিংহোমের বিল ১৪ লাখ ৭৫ হাজার।

সেইদিন মধ্য দুপুরে ক্লাবের দুটো ছেলের সঙ্গে শিলিগুড়ি এসেছিলেন স্বর্ণবালা উপযুক্ত পরিচয়পত্র দেখিয়ে বাড়ি বন্ধকের ১৪ লাখ ৭৫ হাজার টাকার বকেয়া বিল মিটিয়ে সর্বাঙ্গ ঢাকা অবস্থায় একটি মৃতদেহ সংগ্রহ করেছিলেন তিনি।

না, কোন হেলাফেলা নয়। ভবতোষ সান্যালের নামের অতি নিরীহ ভদ্রলোকটিকে দশহাজারি স্পেশাল অ্যাম্বুলেন্সে এনেছিলেন স্বর্ণবালা। দু-ঘন্টা লাইন লাগিয়ে এখন তিনি চুল্লিতে ঢুকেছেন।

একটু দূরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্বর্ণবালা। তাঁর পেছনে ক্লাবের দুটো ছেলে।

স্বর্ণ বালার মতো তাদের মনেও হয়তো ভাবনাটা হয়েছিল। যিনি এখন চিতায় পুড়ছে তিনি ভবতোষ সান্যাল তো?................

፠፠፠፠፠

অগস্ত্যযাত্রা

শ্রীজ্যোতি প্রসাদ রায়

এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে যে বিষয়টি তুলে ধরবার প্রয়াস নিয়েছি, এক কথায় অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমি কামার পাড়ার ভাড়া বাড়ীতে থাকি - তখনও আমার উকিল পাড়ার বাড়ী কমপ্লিট হয়নি। আমাদের বাড়ীর আশে পাশে কিছু বাড়ী ছিল যেগুলো ভাড়া হিসাবে দেওয়া হত। বাড়ীর মালিক কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় বাসিন্দা হলেও অনেকেই আবার জলপাইগুড়ির বাইরে থাকত। আর এই সমস্ত বাড়ীতে যে ভাড়াটিয়ারা থাকত তারা দীর্ঘদিনের ভাড়াটিয়া হিসাবে থাকত। বাড়ীওয়ালা ও ভাড়াটিয়ার মধ্যে সম্পর্ক সব ক্ষেত্রেই যে ভাল ছিল - তা বলা যাবে না। অনেকক্ষেত্রে দেখা যেত - ভাড়াটিয়া ঠিক সময়ে বাড়ীভাড়ার টাকা মিটিয়ে দেয় না। সেই সব ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা যেত। আর এসব ক্ষেত্রে বাড়ীওয়ালা সাধারণত ভাড়াটিয়াকে তুলে দিতে চাইত। কিন্তু সব ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হত না। তাই বাড়ীওয়ালা ঝামেলা মুক্ত হতে অনেক সময় ভাড়াটিয়াকে বাড়ীটি কিনে নেবার প্রস্তাব দিত। এরকমই একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমার এই প্রতিবেদন।

আমাদের বাড়ীর কাছেই বড় জায়গা সমেত একটি বাড়ী ছিল- যার মালিক মোহন্তপাড়ার মানুষ ছিল। সেই বাড়ীতে দুটি ভাড়াটিয়া বসবাস করত। হঠাৎ একদিন সকালে লক্ষ্য করলাম এক আমিন এসে জমি মাপজোক করছে। সেই আমিন আবার আমার পরিচিত। আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করি - কি জন্য জমির মাপ-জোক চলছে। উত্তরে জানাল -জমির মালিক প্লট করে জমিটা বিক্রি করবে। দুই ভাড়াটিয়া ছাড়াও আর দুই ব্যক্তিকে বিক্রি করবে। সেই কারনে জমিটার ম্যাপ তৈরি করে দিতে সে কাজ করে চলেছে।

এরপর কবে কখন জমি রেজিষ্ট্রি হল - আমার জানা নেই। বেশ কিছুদিন পর দেখলাম - ভাড়াটিয়া বাড়ী খালি করে চলে গেল। কারণ তাদের অংশে নতুন বাড়ী তৈরি হবে। তখনও আমার জানা ছিল না কে কোন অংশে বাড়ী তৈরি করবে। তারপর একদিন দেখা গেল একজন বিল্ডিং প্ল্যানার এসে ফাউন্ডেশনের লেআউট দিতে তদারকি শুরু করেছে। বুঝতে পারলাম - বাড়ী তৈরির কাজ শুরু হবে। বেশ কিছুদিন কাজ হবার পর - বাড়ী তৈরী হলে দেখা গেল পুরানো ভাড়াটিয়ার একজন বাড়ী তৈরি করেছে। আর এক ভাড়াটিয়া তার অংশ অন্য একজনকে বিক্রি করে কোলকাতায় স্থায়ী হয়েছে। সে যাইহোক এরপর একে একে প্রায় চারখানা বাড়ী তৈরি হল। চারজন তাদের নিজ নিজ বাড়ীতে গৃহ প্রবেশ করেছে। আমি দেখলাম এই চারজনের মধ্যে আমি তিনজনকে চিনি ও জানি, যেহেতু তিনজনই শহরের বাসিন্দা। আর বাকী একজন - তিনি একসময় চা বাগানের সাথে যুক্ত ছিলেন। বাগানের ডাক্তার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। অবসর জীবনে আমাদের পাড়ায় বাড়ী তৈরি করে হয়ত বাকি জীবনটা কাটাবেন। তার বাড়ীরও

গৃহ প্রবেশ হল। আমার নেমতন্ন ছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বাড়ীর মালিকের সাথে অনেক আলাপ হল। মানুষটি যথেষ্ট বয়স্ক। পরিবার বলতে - একছেলে বর্তমান, আর স্ত্রী বহুদিন আগে গত হয়েছে। বাবা ও ছেলে থাকবে। আরও জানলাম ছেলে কোন কাজ কারবার করে না। এক কথায় বেকার। কিন্তু সেই ছেলেরও বয়স কম নয়। প্রায় আমার সমবয়সী। খুব অবাক হলাম। এরকম বয়স্ক এক ছেলে সে কেন বেকার? যাইহোক সেটা আমার কোন সমস্যা নয়। ইতিমধ্যে গৃহ প্রবেশ হয়ে যাবার পর প্রায় এক মাস হবে। সেই ডাক্তার ভদ্রলোক আমার বাড়ীতে এসে হাজির। কথায় কথায় জানাল সময় কাটাতে আমার বাড়ীতে এসেছে - একটু গল্প গুজব করবে বলে। আমিও খুব খুশী হলাম। আমার মানুষের সাথে আলাপ করতে ভীষণ ভাল লাগে। তাই ভালই হল। আমার মানুষটার সাথে কথা বলে ভাল লাগল। মাঝে মাঝে উনি আসবেন সে কথাও জানিয়ে দিলেন। আমিও সম্মত হয়ে বললাম অবশ্যই আসবেন।

পরবর্তীতে ভদ্রলোকের সাথে বেশ ঘনিষ্টতা হল। ওনার জীবনের অনেক ঘটনার কথা আমাকে বলতেন। কেমন করে ওনার স্ত্রী গত হলেন তার বিষয়। কিন্তু ছেলে সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইতেন না। আমি উপযাচক হয়ে এক সময় জিজ্ঞেস করি ছেলেকে তো বাগানের চাকরীতে ঢোকাতে পারতেন। উত্তরে জানিয়েছিলেন - সেই ব্যবস্থা ও করে ছিলেন। কিন্তু ছেলে বেশীদিন চাকরীটা করতে পারেনি। প্রশ্ন করেছিলাম কেন ইউনিয়ন গত কোন সমস্যা ছিল? কারণ আমার জানা ছিল চা বাগানে কাজে যুক্ত হতে গেল সেই বাগানের শ্রমিক ইউনিয়নের একটা বড় ভুমিকা থাকে উনি জানালেন সে সব কোন সমস্যা ছিল না। ছেলের নেশার প্রতি এমন আকর্ষণ ছিল যে কাজেই যেত না। এরকম আর কতদিন চলতে পারে - তাই একসময় বাগান মালিক সেই ছেলেকে বরখাস্ত করে। ওনার ছেলেকে নিয়ে তাই খুব চিন্তা। এক কথায় বলতে গেলে ছেলেটা বাউন্ডুলে প্রকৃতির। এরকম ছেলেকে নিয়ে বাবার চিন্তা হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।

ভদ্রলোক সপ্তাহে প্রায় তিন চারদিন করে আমার সাথে গল্প করতে আসতেন। আমিও আমার শারীরিক কোন সমস্যা হলে ওনার পরামর্শ চাইতাম। আফটার অল ডাক্তারমানুষ। এরকম ভাবে ভালই চলছে। এরই মাঝে একদিন উনি জানালেন ছেলের বিয়ে দিতে চান - তাতে করে ছেলের মতিগতি যদি বদল হয়। মনে মনে ভাবলাম এরকম বেকার ও বাউন্ডুলে ছেলের জন্য পাত্রী পাওয়াও খুব শক্ত। সে যাইহোকে আমিও ওনাকে উৎসাহিত করলাম।

এসব আলোচনা হওয়ার পর বেশকিছু দিন ভদ্রলোককে আমি দেখতে পাইনি। মনে হলো হয়তো পাত্রীর খোঁজে কোথাও গেছেন। আমার অনুমান সত্যিই হল। এক সন্ধ্যায় আমার বাড়ীতে এসে জানালেন নক্সালবাড়ীর ঐদিককার এক মেয়ে। সে আবার অঙ্গনওয়াড়ী কাজে যুক্ত - তার সাথে বিয়ে দিয়ে ছেলের বউ সমেত ফিরছেন - কোন অনুষ্ঠান হয়নি। তাই পাড়ার আশেপাশের মানুষও জানতে পারেনি ঐবিয়ের ঘটনাটা।

পাড়ার কিছু মানুষ আমাকে পরবর্তীতে জিজ্ঞেস করাতে আমি যতটুকু জানতাম তাদের

জানালাম। ঐ মানুষগুলো জানত - ঐ ডাক্তার ভদ্রলোক পাড়ার মধ্যে আমার সাথেই বেশী মেলামেশা করতেন। এরপর এই নিয়ে আর কারো উৎসাহ আমার চোখে পড়েনি।

ভদ্রলোককে সাময়িক কিছুটা স্বস্তি পেতে দেখলাম। ছেলের বউ চাকরী সামাল দিয়ে পরিবারের দেখভাল করতে লাগল। খুবই ভাল খবর। এরকম বেশ ভালই চলছে। কালে দিনে ছেলের বউ এর এক পুত্র সন্তান হল। ভদ্রলোকে নাতির মুখ দেখলেন। বেশ ভালই চলছিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্য মানুষের পিছু ছাড়েনা। ছেলের বউ হঠাৎ কি এক রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। দুর্জনেরা বলে ছেলে নাকি বউ এর গায়ে হাত তুলত। আমি দেখিনি। ইতিমধ্যে নাতির প্রায় বছর দুয়েক বয়স হয়েছে। হাটতে শিখেছে। ঠাকুরদার সাথে কখন কখন রাস্তায় হেটে চলে বেড়ায়। ভালই লাগত দেখে

নাতি হয়ে যাবার পর ভদ্রলাকে আমার কাছে আর আগের মত আসতে পারে না। আমি ভেবেছিলাম নাতিকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। তাই সময় পান না। এসব ভাবনাকে খারিজ করে একদিন সকাল প্রায় এগারোটা নাগাদ - আমার কাছে কাঁদো কাঁদো মুখে এসে দাঁড়ালেন। আমি ওনাকে ঐ অবস্থায় দেখে প্রশ্ন করি - শরীর ভাল আছে তো? উত্তরে জানালেন - শরীর নিয়ে সমস্যা তো বয়সের কারনে হতেই পারে। যেহেতু বার্ধক্য নিজেই একটি রোগ। তার পাশাপাশি ছেলের অত্যাচার আর সহ্য করা যাচ্ছে না। আমি তো অবাক। আসলে আমাদের মানসিকতার সাথে মিল নেই দেখে। আমার বাবাও তখন বর্তমান। এবং আমার সাথেই থাকেন। বাবা ছেলের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিৎ আমি জানতাম। কিন্তু যে ছেলে বাবার গায়ে হাত তোলে সে যে কত বড় কুলাঙ্গার তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভাবতে অবাক লাগে ছেলের এক পয়সা কামাই নাই বাবার পয়সায় খায়। আবার বাবার উপরই অত্যাচার করে। এসব সহ্য করা যায় না। সবজেনে শুনে আমি হতবম্ব দেখে উনি জানতে চাইলেন আমি কি ভাবে ওনাকে সাহায্য করতে পারি। আমি উত্তরে জানালাম - সব রকম ভাবে সাহায্য করব। কারণ আমারও খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল ছেলের ঐরকম আচরণের কথা শুনে।

কথায় কথায় আমাকে জানালেন বাবার বাড়ীর বাইরে যাওয়া ছেলে পছন্দ করে না। পাশাপাশি কেউ বাড়ীতে আসুক তাও পছন্দ না। আমি প্রশ্ন করি এখন কেমন করে এলেন? উত্তরে জানালেন - নাতিকে নিয়ে ছেলে চাইল্ড স্পেশালিষ্ট এর কাছে গেছে সেই অবসরে উনি এসেছেন। আমাকে আরও জানালেন এরকম ছেলের সাথে বেশীদিন থাকলে বার্ধক্যের কারনে মৃত্যু তো ঠিক আছে কিন্তু অপঘাতে মৃত্যু অনিবার্য। সত্যি বলতে কি আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। আমি বললাম শান্ত হয়ে বসুন। উনি বললেন ছেলে আসার সময় হয়ে যাচ্ছে এখন যেতে হবে। নইলে আবার বিপদ হতে পারে। যাবার আগে আমাকে বলে গেলেন এর থেকে কি ভাবে মুক্তি পেতে পারে - সেই ব্যাপারে তাকে যেন আমি সাহায্য করি। আমি ওনাকে আশ্বস্ত করি। তারপর উনি চলে গেলেন।

উনি চলে যাবার পর আমার মনটা ভীষণ খারাপ লাগল। আমি আমার বাবাকে জানালাম। বাবাও খুব অবাক হলেন। বাবা বললেন এরকম ছেলে থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল একবার ওনার বাড়ী যাই এবং ঐরকম ছেলেকে সোজাসুজি চেপে ধরি। এসব কি হচ্ছে, বাড় বাড়ন্তর একটা সীমা আছে। কিন্তু যেহেতু ছেলের বাবা সেরকম ইচ্ছা প্রকাশ করেনি তাই আমার ইচ্ছা থাকলেও যেতে পারছিলাম না।

দিন সাতেক পর আর এক সকালে এসে হাজির। সেদিন আরো করুন অবস্থায় দেখলাম। সারা শরীর কাঁপছে -আমি তাড়াতাড়ি ওনাকে বসালাম। বউকে চা দিতে বললাম। সংগে কিছু খাবার দিতে বললাম। বউ তাড়াতাড়ি সকালে ব্রেকফাস্টে পরোটা আলুর দম বানিয়েছিল। তাই এনে দিল। সবটাই খেলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন উনি আর বাড়ীতে থাকতে পারছেন না। অত্যাচার এমন জায়গায় গেছে যে বাড়ী ত্যাগ করা শ্রেয়। আমি বললাম বাড়ীতে নিশ্চয়ই আপনার নামে তা ছেলেকে বার করে দিন। উত্তরে জানালেন - যদি বাড়ী থেকে ছেলেকে নাতি সমেত বার করে দিই তবে ভিক্ষা করেও দিন কাটবে না।" তাই বাড়ীটাতে ছেলে থাক নাতিটাও তো আছে। তাই নাতিকে যদি কোন হোষ্টেলে রেখে দেওয়া যায় তারজন্য মাসোহারা যা লাগবে পুরোটাই দিয়ে দেবেন। "শুধু ছেলের হাত থেকে মুক্তি চান।" এবং বাড়ী থেকে যেন ওনাকে পরদিন সকালেই বার করে আনা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল ওনাকে তুলব কোথায় আমি প্রস্তাব দিই আপাতত যদি কোন হোটেলে ব্যবস্থা করা যায়। উনি তাতে রাজী হলেন। আমার সাথে নিরালা হোটেলের মালিক এর হৃদ্যতা থাকায় জানি ওনাকে একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে। আমি কালক্ষেপ না করে হোটেলে ফোন করি এবং ওনার থাকার ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে বলি। এর পাশাপাশি ভদ্রলোক অনুরোধ করলেন লোকাল থানায় যেন একটা খবর দেওয়া হয়। কারণ ভদ্রলাকের আশঙ্কা ছেলে ওনার বাড়ীর বাইরে থাকার ব্যাপারে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই পুলিশ থাকলে ছেলে সেই সাহস পাবে না। এ ব্যাপারেও আশ্বস্ত করলাম। এরপর আমি প্রশ্ন করি আপনি এই সময় কেমন করে আমার বাড়ী এলেন - উত্তরে জানালেন ছেলে নাতিকে নিয়ে পুরসভায় গেছে ভ্যাকসিনের কারণে। সেই অবসরে ওনার আসা। এরপর আর কথা বাড়াইনি। উনি বিদায় নিতেই আমি থানার সাথে যোগাযোগ করি। আই.সি আমার পূর্ব পরিচিত সব খুলে বললাম। আমার সামনেই এক এস. আইকে নির্দেশ দিলেন পরদিন সকাল দশটা নাগাদ ঐ বাড়ী গিয়ে ভদ্রলোককে উদ্ধার করে হোটেলের ঘরে পৌছে দিতে। এরপর থানা থেকে ফিরে আসি।

পরদিন বাড়ীতেই অপেক্ষা করছি। কারণ ভদ্রলোক চাননি আমি ওনার বাড়ী যাই কারনটা উনিই জানেন। সেই যাই হোক আমার বাড়ী থেকে যতটুকু দেখা যায় তাতে দেখলাম পুলিশ বাড়ীর ভিতর গিয়ে ভদ্রলোককে বার করে নিয়ে এল সাথে একটা ছোট সুটকেস। ছেলেকে দেখা গেল না। আমি তাড়াতাড়ি হোটেলের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়লাম। হোটেলে পৌছে হোটেল

মালিককে জানালাম একটু পরেই ভদ্রলাকে চলে আসবেন। তাই সব ব্যবস্থা করে রাখতে। উত্তরে জানাল সব ব্যবস্থা হয়ে আছে। কোন সমস্যা নেই। এরইমধ্যে পুলিশ ভ্যান এসে হাজির। ভ্যান থেকে ওনাকে নামানো হল। ওনার সুটকেস হোটেলের বয় নিয়ে নির্দিষ্ট ঘরে দিয়ে এল। পুলিশ বিদায় নিল। হোটেল ম্যানেজার হোটেলের ফর্মালিটিস সম্পন্ন করল। ভদ্রলোক হোটেল মালিককে প্রশ্নকরলেন মাসে কত টাকা দিতে হবে - উত্তরে জানান ওনার যা ইচ্ছা উনি দেবেন। কোন নির্দিষ্ট পরিমান টাকা দেবার দরকার নেই। ভদ্রলাকে শুনে কেঁদে ফেললেন। আমাকে জানালেন হোটেল মালিক ওনাকে চেনেই না অথচ কত ভাল একটা প্রস্তাব দিল। আর নিজের অর্থে তৈরি নিজের বাড়ীতে বেকার ছেলেকে নিয়ে থাকতে পারলেন না। যাই হোক ওনাকে শান্ত করে বিদায় নিলাম। আর বলে এলাম খুব ভাল থাকবেন মনের আনন্দে থাকবেন। অসুবিধা হলে জানাবেন। আমি ঠিক সময়ে এসে পড়বো। আমাকে অনেক আশীর্বাদ করলেন।

এরপর হোটেলে থাকাকালীন আমি ওনার খবর নিয়েছি। একসময় আমি দিন পনেরোর জন্য উত্তর ভারত বেড়াতে গিয়েছিলাম সপরিবারে। ফিরে এসে ঘরবাড়ী গোছগাছ করে - ২ দিন বাদে হোটেলে যাই - ঐ ভদ্রলোকের খবর নিতে। হোটেলে গিয়ে মালিককে প্রশ্ন করি আমার অতিথি কেমন আছে উত্তরে জানাল, ভালই ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ দিন সাতেক আগে জানায় যে উনি হোটেলে আর থাকবেন না কারও বাড়ীতে জায়গা হয়েছে সেখানেই থাকবে। প্রশ্ন করি কাদের বাড়ীতে গেছে? কোন ঠিকানা রেখে গেছেন? উত্তরে হোটেল মালিক জানাল সে সব কথা হয়নি। বয়স্ক মানুষ যেখানে থাকলে ভাল থাকবেন সেখানেই থাকুক। তাই আর ওনাকে প্রশ্ন করিনি। হোটেলের এক বয় সাথে যায়। কিন্তু ঐ বয়ও চাকরী ছেড়ে ভুটানে চলে গেছে। তাই ঐ বয়কে আর পাওয়া যাবে না। অগ্যতা বিষন্ন মনে বাড়ী ফিরে আসি। এবং বিশদে পরিবারকে জানাই। সবারই মন খারাপ হল। এরপর আমি নিজে উদ্যোগ নিয়ে খোঁজ করেছি কিন্তু কোন সন্ধান পাইনি। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার আজ পর্যন্ত জানতে পারিনি মানুষটার শেষ পরিনতি কি হয়েছিল। কারও মৃত্যু হলে সন্তানরা তার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে। কিন্তু আমি ওনার ছেলেকে ঐ জাতীয় কাজ সম্পন্ন করতে কখনও দেখিনি। তাই মানুষটার কি হল জানতেই পারলাম না। আজও মাঝে মাঝে ভাবি মানুষটা বেঁচে থাকলে এখন কম করে ১০৭ বছর বয়স হত। কোথায় যে লুকিয়ে পড়লেন কোন হসিদ পেলাম না। শুধু একুটু বলব, যে ভাবেই থাকুন যেখানেই থাকুন শান্তিতে থাকুন।

আর ওনার ছেলেকে প্রায় প্রতিদিনই দেখি আমার নতুন বাড়ীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করতে। কিন্তু কখনও ওকে প্রশ্ন করিনি তার বাবার কি খবর কারণ খুবই সহজ। যে ছেলে বৃদ্ধ বাবাকে সুযোগ থাকা সত্বেও দেখভাল করার দায়িত্ব নেয়নি - সেরকম ছেলের সাথে আমার কথা বলার প্রবৃত্তি হয় না। মানুষটার কথা আজও ভীষণ ভাবে মনে পড়ে। যদি শেষ দেখা একবার দেখতে পেতাম।

✠✠✠✠✠

আলোকের পথে প্রভু দাও দ্বার খুলে

গোপা ঘোষ পালচৌধুরী

ভোরে উঠতেই পুব আকাশ ডাক দেয় ভালোবেসে। আর একটু অন্য ভাবে বললে, আমিই ছুটে যেতে চাই ওর মহিমায়, ও সেই কখন থেকে ডাক দিয়ে চলেছে - হ্যাঁরে , এখনও ঘুমোচ্ছিস? চোখ মেলে দেখ কত আলো। এ আলোয় স্নান করবি না তুই?

আমি বলি - ওগো আকাশ, মুক্ত করো আমাকে। মুছে দাও সব কালি, তোমার আলোয় আলোয়।

আকাশ - তোর ঘুম কি সত্যি ভেঙেছে মেয়ে? নাকি এখনো তুই ঘেরাটোপে বন্দী? যেখানে আলো প্রবেশ করে নি কোন দিনও ?

আমি - আমার সর্বাঙ্গে শেকল আকাশ। সেই শতাব্দী প্রাচীন শেকল আমি ভাঙতে পারিনি আজও।

আকাশ - শেকলে কিসের ভয়? এই শেকল ভাঙার সময় যে আজ অনেক সামনে তোর, অনেক সামনে। তাকিয়ে দেখ তুই, তাকিয়ে দেখ নির্ভয়ে, তোর মনের আয়না দিয়ে। সে আয়নায় আমাকেও দেখতে পাবি তুই। আলোর পসরা নিয়ে অপেক্ষা করে আছি আমি কতকাল তোদেরই পথ চেয়ে। ঘুম ভাঙিয়ে চলেছি শত শত কুসুমকলির। তুই তো ওদেরই দলে, পুত্রী।

আমি – কিন্তু আমি কি পারবো আকাশ, আমি কি পারবো এই লৌহকপাট ভেদ করে সুদূরের আহ্বানে সাড়া দিতে? অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই সংশয়ভীরুতা আজো যে অন্ধ করে রেখেছে আমাদেরকে! আমার হাত ধরো আকাশ, আমার হাত ধরো তুমি।

আকাশ – আমি যে সেই অনাদি কাল থেকেই তোদের মাথার ওপর একইভাবে হাত বাড়িয়েই আছি, আলোর দেশে সবাইকে পৌঁছে দেবো বলে। এই ধরিত্রীর বুকে তোরা সবাই যে আমারই সন্তান। আমার কাছে কোন ভেদাভেদ নেই তোদের। ঐ যে সপ্তাশ্ব, আমারই বুকে প্রথম ছড়িয়ে দেয় ওর কিরণমালা। সপ্তাশ্বর এই অসামান্য দানে কোন বৈষম্য নেই। আমিওতো সেই মহাদানেরই ধারক।

আমি – সপ্তাশ্বর সেই মহাদানই যে আমি গ্রহণ করতে চাই আকাশ! মেঘে মেঘে ঢেকে দিও না আমাকে। আর ঝাপসা করে দিও না আমার দৃষ্টি।

আকাশ – আমিও উদার কন্যে। সপ্তাশ্বর মতই আমিও উদার। কখনো তোদের স্নিগ্ধ করি পর্জন্যের স্পর্শে, প্রাণের স্পর্শে উজ্জীবিত করে তুলি ধরণীর বুক সব কালিমা ধুয়ে। আবারো হেসে উঠি আমি সহস্রাংশুর কিরণে। সেখানেও মুক্তির স্পর্শ, ঘুচে যায় সব অজ্ঞতার অন্ধকার।

দেখ না দরজা খুলতে খুলতে আজ একবিংশ শতাব্দীর নতুন পৃথিবীর বিরাট বিস্ময়ের দরজাটা খুলে গেছে। আরো আরো অসংখ্য দরজা খুলে যাবে অচিরেই। অন্ধ কুঠুরী থেকে বেরিয়ে আসতে জানতে হয়। রে কন্যে। বুকে সাহস নিয়ে এগিয়ে আয়। তোর নিজেকেই এগিয়ে আসতে হবে। দেখবি, একসময় তোকেই সেলাম জানাবে পৃথিবী।

আমি – তুমি সত্যি বলছো আকাশ? আমি এগোতে পারবো?

আকাশ – নিশ্চয়ই পারবি। আলোকবর্তিকা হাতে যুগ যুগ ধরে এগিয়ে চলছে নারী নির্ভয়ে, নিঃসংশয়ে, দশপ্রহরণধারিণী হয়ে। তুইও পারবি। তোর অগ্রগতি মানেই এই সমাজেরই অগ্রগতি। তোর মনের ভেতর যে অসীম জগৎ, সে জগৎ যখন আলোকময় হয়ে উঠবে, অন্ধ তিমিরেও তুই পথভ্রষ্ট হবি না আর।

আমি - তোমাকে প্রণাম জানাই আকাশ। প্রণাম তমোঘ্ন সূর্যদেব।

✠✠✠✠✠

টিকিট

ড. শীলা দত্ত ঘটক

– শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় – সিট থেকে উঠে আসুন–, নামুন নামুন–
– দাঁড়াও ভাই নামব
– এই যে দাদা বাসের টিকিটটা
– দূর্ –, ওটা ফেলে দাও লাগবে না, আ–র এই তো নেমেই যাচ্ছি। আর ওটা দিয়ে কি হবে বল –?

বাসটা ট্রাফিক সিগনাল পেতেই জোড়সে এগিয়ে গেল দমদমের দিকে। বাসে ভীড় বেশ একটু কমই ছিল, বিশেষ কারণে সরকারের নিয়ম মেনেই হয়তো। কারণটা তো ভীষণই ভয়ঙ্কর, কারণ বিগত প্রায় সতেরো মাসের বেশী সময় যাবৎ করোনা নামক মারণ ভাইরাসের অতিমারীর কবলে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে মানুষ জীবনযুদ্ধ চালিয়ে পরিশ্রান্ত, হারিয়েছে জীবন ও কর্মের দৈনন্দিন স্বাভাবিক ছন্দ, অসংখ্য ভাইরাস-আক্রান্ত মানুষ মৃত্যকে বরণ করে চলেছে ---- কী অসহনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন অসহায় সকল মানুষ ---- এইসব কথাই বাস থেকে নেমে ভাবতে ভাবতে একটু এগোতেই গুঞ্জনের হঠাৎ দেখা স্কুলের বন্ধু রক্তিমের সাথে---। কয়েক সেকেন্ড হতবাক, এক স্বর্ণালী মুহূর্ত --- মুখের ভাষাও যেন কিছুক্ষণের জন্য উভয়েরই হারিয়ে যায়, তারপর স্বম্বিৎ ফিরতেই আনন্দ আর রোমাঞ্চে আন্দোলিত হয়ে ওঠে দুজনের মন। সঙ্কটময় দুঃসময়ের নিয়মকানুন ভুলে দুজন দুজনকে বুকে জড়িয়ে ধরে আবারও কিছুক্ষণ বাকরুদ্ধ, শেষে পুরানো-নতুন দিনের হাজারো কথা বিনিময়। নিমেষের মধ্যে---। প্রায় ৩০ বছর পর দেখা দুই সহপাঠীর। একথা-সেকথার জাল বুনতে বুনতে বেশ অনেকটা রাতই গড়িয়ে গেল। আনন্দসাগরে ভেসে সময়ের তো আর সময় নেই থেমে থাকার। রাত হয়েছে অনেক, ঘড়িতে নজর পড়তেই রক্তিম গল্পের ইতি টানতে বাধ্য হল। বাড়ীতে ফেরার তাড়া কারণ মা যে খুবই অসুস্থ। মা'র ওষুধ কিনতেই ও এসেছিল শ্যামবাজারে মোড়ের ওষুধের দোকানে---মা'র দুটো ওষুধ যে আবার পাওয়া যায় না সবখানে ---।

--- রাতের শুভেচ্ছা বিনিময় করে দুজনের দূরত্ব বাড়তেই গুঞ্জনের মনে হল, আরে ফোন নম্বরটাই তো নেওয়া হল না রক্তিমের। সকাল হলেই ওর মা'র খোঁজ নেওয়া ---, তার উপর আবার কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের জে.এন.এম. মেডিক্যাল হসপিটালের ও নাকি বর্তমানে একজন বেশ নামী-দামী শল্য চিকিৎসক। রক্তিম তো মা'র কথা ভেবেই বেশ জোর কদমেই পা চালিয়েছে তাই অনেকটা পথই সে এগিয়ে গিয়েছে অল্প সময়ের মধ্যেই। বন্ধুর নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে দৌড়ে গিয়ে গুঞ্জন অবশেষে ধরে ফেলল রক্তিমকে। আচমকা ওকে দেখে বিস্ময়ে ঘুরে দাঁড়াতেই --- আরে! তোর ফোন নম্বরটাই তো দিলি না ---। কিন্তু কাগজ-?

পকেট হাতড়ে টাকা আর খুচরো পয়সা ছাড়া তো একটুকরো কাগজও নেই। যদিও রয়েছে --- কিছু কাগজের টাকা --- কিন্তু টাকার উপর তো আর লেখা যায় না ----। তার উপর আবার ফোন নম্বর। কি ঝামেলায় পড়ল দুজনে ---। কাগজশূণ্য পকেটে হাত দিয়েই গুঞ্জনের হঠাৎই মনে হল ----, ই--স্‌ বাস কন্ডাক্টর ছেলেটি কতবার টিকিটটা দেওয়ার জন্য চিৎকার করেছে--- "ও দাদা! আপনার টিকিটটা নিন--"। কিন্তু অবান্তর ওটা ভেবে, বেশ কিছু তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই তো এড়িয়ে গিয়েছিল ও ছেলেটির হাত থেকে টিকিটটা না নিয়ে বরঞ্চ সেটা ফেলে দিতে বলে কি ভুলই না করেছে গুঞ্জন। আহারে, এ টিকিটখানা সাথে থাকলে ঐ কাগজটুকুই যথেষ্ট ছিল বন্ধুর ফোন নম্বরটা লিখে নেওয়ার জন্য। গুঞ্জন মনে মনে ভাবে ----, আবার প্রকাশ্যেই বন্ধুর কাছে এইসব কথা সরল স্বীকারোক্তি করে বলে --- হয়তো এমনিভাবেই কোনো বিপদে পড়ে মনীষী কবি লিখেছেন ---

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই।
পাইলে পাইতে পারো অরূপ রতন --।" কিংবা

গুরুদেবের সে-ই বাণী - "তুমি যারে নীচে ফেল
সে তামোরে বাঁধিবে যে নীচে--।"

❋❋❋❋❋

অভিনব পদ্ধতিতে চুরি

শ্যামল ভৌমিক

অনিন্দ্য যখন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় স্টার পেয়ে পাশ করল এবং জয়েন্ট এন্ট্রান্স দিয়ে পাশ কবে জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভর্তি হল, তারপর সেখান থেকে পাশ করে হাওড়ার এক মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে চাকুরীতে জয়েন করল। হাওড়ার ঘনসন্নিবিষ্ট এলাকায় যেন হাঁপিয়ে উঠল। চিরকাল শ্যামলিমা এলাকায় জন্ম ও পড়াশুনা, গরম কি রকম তাঁর ধারনা ছিল না। সারাদিন ফ্যাক্টরীতে থেকে গরম হাওয়ার মধ্যে কাজ করতে করতে যেন হাঁপিয়ে উঠল। মনটা আনচান করে, ছোটোবেলায় সে দেখেছে একটু গরম পড়লে বৃষ্টি নেমে যেত। তারপর গরম কমে যেত স্কুল জীবনে দেখছে ৭-৮ দিন ধরে বৃষ্টি হছে তো হচ্ছে, বর্ষাকালে আকাশ সব সময় মেঘলা করে থাকতো। মাঝে মাঝে মন খারাপ হওয়া বৃষ্টি যেন হয়েই চলতো, বাড়ীতে বসে থাকতে হত। এখন হাওড়াতে থাকতে হচ্ছে, মাঝে মাঝে মন টা ছুটে যায় সেইসব দিনের কথা। বৃষ্টির মধ্যে মেদুর বিকালে ফুল প্যান্টটা গুটিয়ে হাওয়াই চপ্পল পরে ছাতা নিয়ে বাবুপাড়ায় করলা নদীর ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে থাকতাম করলা নদী দুকুল ভরে ভীষন স্রোতে বহে চলত। ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে যেত, এই ভাবে কৈশোরে জীবনের নানা কথা মনের মধ্যে ভেসে আসে। এখন বন্ধু বান্ধব হীন অবস্থায় দিন গুলি কেটে যাচ্ছে। ফ্যাক্টরীর মধ্যে কোয়ার্টারে একা থাকে, মেস বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করে। মনটা হাঁপিয়ে উঠেছে। কোথাও যেন পালাতে পারলে ভালো হয়? অনিন্দ্য প্রায় ছয় মাস হল চাকুরীতে জয়েন করেছে। এতদিন কোম্পানি বাইরে যে কাজগুলি পায় সেই কাজে সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার যেত। এক দিন ফ্যাক্টরী ম্যানেজার অনিন্দ্য কে বললেন কলকাতা হেড অফিসে দেখা করতে বলেছেন।

যথারীতি সে কলকাতা গেল। হেড অফিসে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে দেখা করল। চিফ ইঞ্জিনিয়ার বললেন, আমরা এবার উত্তরবঙ্গে একটা বড় কাজ পেয়েছি। একটা চা বাগানের পুরানো ফ্যাক্টরী কে নতুন ভাবে তৈরি করার বরাদ আমরা পেয়েছি। সেখানে নতুন ফ্যাক্টরীর শেড, পুরাণো কলকব্জা সব আধুনিক ভাবে বসাতে হবে। কাজের সময় অবশ্য ছয় মাসের মধ্যে করতে হবে। তোমাকে জলপাইগুড়ি জেলায় যেতে হবে। কারন তুমি জলপাইগুড়ি জেলাতে বড় হয়েছ, সেখানকার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করেছ। শুনেছি যে জায়গায় কাজ হবে সেটা মিশ্র এলাকা। তুমি স্থানীয় লোকের ভাষা, কাজ কর্ম অনেকটা জানো। তোমাকে সেই চা বাগানে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে আমরা পাঠাচ্ছি। অবশ্য তোমার সঙ্গে দুইজন সিনিয়র অফিসার আর তিন জন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার যাবে। তোমাদের সঙ্গে থাকবে ৫০ জন

স্কিলড লেবার। কবে যাবে আমি পরে তোমাকে জানাবো।

হাওড়ায় নিজের কোয়ার্টারে ফিরে আনন্দে মনটা আনচান করে উঠল। আর কয়দিন পরে বর্ষা নামবে। শ্রাবণ মাস শুরু হবে। জীবনের উচ্ছ্বাস থাকলেও দেখা যায় এই শ্রাবণে ঝরো ঝরো আনন্দ ধ্বনি আর বারি ধারার সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া অনুভূতি যেন প্রধান। যে শ্রাবণের আকাশে বিদ্যুৎ চমকিয়া যায়, কবি বলতেন, এই শ্রাবণ বেলা/ বাদল ঝরা/ জুঁই ফুলের গন্ধে ভরা/ কখনো আবার শ্রাবণের আমন্ত্রণে/ দুয়ার কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে/ ঘরের বাঁধা যায় বুঝি আজ টুটে।

রাত্রিতে কোয়ার্টারে ঘুম আসছে না, কত দিন পর মুক্তির আনন্দে মনটা মেতে উঠল। আর সব সহ কর্মীদের মনে সুখ নেই। ওখান থেকে সহজে বাড়ি আসতে পারবেনা। অনিন্দ্যর অবশ্যই আনন্দ হচ্ছে, তবে যেখানে কাজ হবে জলপাইগুড়ি শহর থেকে ১২০ মাইল দূরে। জয়ন্তী পাহাড়ের গায়ে, বাগানটির নাম চুনিয়াঝোরা। এখানে দিন পনেরো পর আমাদের যাত্রার সংকেত দিল। তাঁর আগে একটা রিজার্ভ মাল গাড়িতে বড় বড় বিম, লোহার নানা রকম নাট বল্টু সহ কয়েক শো বান্ডিল টিন নতুন ও পুরানো। সেই সঙ্গে ওয়াগনে দুটি হেভি ক্রেন, দুইটা বড় ট্রাক, ২টা ছোট ট্রাক। দিন পনেরো আগে যাত্রা শুরু করেছে ডুয়ার্সের রাজাভাতখাওয়া রেল স্টেশনের উদ্দেশ্যে। আমরা ৫ জন স্টাফ, ২ জন রাঁধুনি ও ২ জন হেল্পার নিয়ে আলিপুরদুয়ার জংশনের উদ্দেশ্যে কামরূপ এক্সপ্রেসে রওনা হলাম, আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনে নামলাম, দেখি চা-বাগানের লোকেরা "চুনিয়াঝোরা চা-বাগান" লেখা পোস্টার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, চা-বাগনের পাঠানো গাড়িতে আমরা রওনা হলাম।

এক দীর্ঘ ক্লান্তিময় শরীরে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসে মুক্ত ক্যানভাসে। সেখানে নিস্তব্ধতা, সেখানে নীরবতা, সেখানে নিবিড়, নিঃসর্গে নিগড়ে দেওয়া বিস্তীর্ণ, সৌন্দর্য্য, সেখানে খরস্রোতা পাহাড়ী নদীর খেয়ালী প্রবাহ। সেখানে গা ছম ছম করা বন, বনাঞ্চল আর বন্য পশুর পদচারণা, সেখানে রাতের অন্ধকারে ভেসে আসে ধামসা - মাদলের সুর। এই রকম স্থানে আমরা এসে পোঁছলাম, জায়গার নাম হাতিপোতা। হাতিপোতা বাজারে একটা বিরাট কাঠের বাড়ি সেখানে আমাদের থাকার জায়গা হল। আমরা হাতিপোতা বাজার থেকে চাল, ডাল, তরকারি কিনে আনলাম। চা-বাগান থেকে রান্নার কাঠ দিয়ে গেল, আমাদের এখানে এখন কাজ নেই। তবু আমরা একটা গাড়ী ভাঁড়া করে "চুনিয়াঝোরা চা-বাগানের ফ্যাক্টরীতে, চা-বাগানের স্টাফদের সঙ্গে কথা বললাম। ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এর সঙ্গে কথা বললাম। প্রস্তাবিত নতুন ফ্যাক্টরী তে মালপত্র কোথায় রাখা হবে, হাওড়া থেকে যে সব স্কিলড লেবার আসবে তাঁরা কোথায় থাকবে? আমরা গাড়ী করে একটা নির্জন জায়গায় দাঁড়ালাম। গাড়ি থেকে নেমে দেখি দূরে সারি সারি নীল পাহাড় কাঞ্চন মুকুট পরে দাঁড়িয়ে আছে। বিখ্যাত জয়ন্তী পাহাড়ের কোল থেকে কুলকুল ধ্বনি দিয়ে নেমে আসছে চুনিয়াঝোরা।

রাস্তায় পড়বে ঘন জঙ্গল আর আছড়ে পড়া সবুজের রাশি।

আমরা হাতিপোতা বাজারে ফিরে গেলাম। রাত্রিতে অফিসাররা মিলে একটা চিঠি করা হল বন দপ্তরে, যে তাঁরা ছয়মাসের জন্য ঐ ফাঁকা জায়গাটা লিজ নিতে চায়, সেই জন্য তাঁরা প্রয়োজনীয় রাজস্ব দিতে প্রস্তুত। সেই প্রয়োজনীয় কাজের জন্য আলিপুরদুয়ারে যেতে হবে বক্সাদুয়ার ডিভিশন অফিসে, আমরা ঠিক করলাম সোমবার দিন যাবো , কিন্তু বাদ সাধলো, রাস্তায় বেরিকেট দেওয়া। হাতিপোতা বাজার থেকে যে রাস্তাটা রাজাভাতখাওয়ার দিকে গেছে, সেই রাস্তাটা বহু দিন পর ঠিক করা হয়েছে, কিন্তু স্থানীয় মানুষ ঠিকাদারের কাজে তাঁরা সন্তুষ্ট নয়। নিম্ন মানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তাটা তৈরি করা হয়েছে। রাস্তাটা চওড়া করার কথা সেটাও হয় নাই। নানা অভিযোগ নিয়ে তাঁরা মাস পিটিশন করেছে। জলপাইগুড়ি পি.ডাবলু.ডি সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, আলিপুরদুয়ারের এক্সেকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সহ স্থানীয় বিধায়ককে সোমবার দিন বড় বড় সাহেবরা আসবে বলে রাস্তার দুপাশে দুইটা প্যান্ডেল করা হয়েছে। একটা প্যান্ডেলে কাপড় লাগানো হয়েছে। রাস্তার এপারে বেশ দূরে আর একটা বাঁশের ব্যারিকেট করা হয়েছে, প্রচুর লোকজন হৈ চৈ ব্যাপার, আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার থেকে সবারই ব্যস্ততা। রাস্তার দুই ধারে প্রচুর পুলিশে ছড়াছড়ি। হাতিপোতা বাজারে দুই একজনের কাছে পুরানো টেপ ফিতা ছিল, সেইগুলি কৌশল গত ভাবে ৫/৬ দিন আগে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ৯টায় রওনা হয়ে থাকে তাঁর পক্ষে ১২টার আগে পৌঁছানো সম্ভব নয়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোকজনের ধৈর্য্য যখন চরমে, সেই সময় বহু গাড়ি হর্ন বাজিয়ে পৌঁছালো। তাঁরা নেমে কাপড়ের প্যান্ডেলে চেয়ারে বসল। জল খেল, চা-বিস্কুট সহ এলাহি আয়োজন। আধ ঘন্টা পর তাঁরা রাস্তায় নেমে এলেন, রাস্তাটা দেখলেন। তারপর রাস্তা মাপার টেপ চাইলেন, নতুন টেপ রেডি ছিল। সেই নতুন টেপ টি এক্সেকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের হাতে ছিল? এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পলিথিনে মোড়া টেপটি পলিথিন খুলে সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের হাতে দিলেন। সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার কিছুটা খুলে স্যার দের দেখালেন, তারপর সকলে মিলে রাস্তা মাপতে গেলেন। সরকারি নিয়মে সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার টেপ ধরার অধিকারি। এরাই বিল তৈরি করেন। লোক জন দেখে ২০ ফুট রাস্তা ২২ ফুট দেখাচ্ছে, হৈ চৈ থেমে গেল।

এই রহস্য উদ্ধার করতে বেশি সময় লাগল না। আমরা এখানে যখন আসি চার দিন আগে, আমাদের পাড়ায় অর্থাৎ জলপাইগুড়ির এক ঠিকাদারের সঙ্গে বিকেলে হাতিপোতা বাজারে দেখা হল। আমাকে দেখে বলল - তুই, এখানে? আমি বললাম চা-বাগানে নতুন ফ্যাক্টরী বানাতে এসেছি, কোথায় থাকিস? বাজারে কাঠের দোতলা বাড়িতে। শোন আমি তোদের ওখানে যাবো সন্ধ্যা নাগাদ, তোর সঙ্গে কথা আছে। সন্ধ্যায় পলটু দা এলেন, আলাদা ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন - এখান কার স্থানীয় মানুষ অর্থাৎ মেচ, রাভা, বোরো এইসব লোকদের

থেকে সাবধানে থাকবি। ওরা দিনে ভদ্র আর রাতে ভয়ঙ্কর। রাত্রিতে কোন লোক ডাকলে বের হবিনা। আর একটা কথা বলি তোদের কাছে টেপ ফিতা আছে? কেউ টেপ ফিতা চাইতে আসলে বলে দিবি নাই। পরে তোকে সব কথা জানাবো। সাবধানে থাকবি, বলে চলে গেলেন।

যে দিন প্রশাসনের লোকজন এসেছিল, সেই দিন রাতে পলটু দা এলেন, চল তোকে সব কথা বলি, - যখন রাস্তা তৈরি করার টেণ্ডার হয় তখন থেকে তিন জন ঠিকাদার কাজ না করে পালিয়ে গিয়েছিল প্রাণ ভয়ে। পরে প্রশাসনের পি.ডাবলু.ডি থেকে আমাকে এই কাজের ভার দিল, সঙ্গে লোকাল ঠিকাদারকে দেওয়া হল। আমাদের কাজের মালপত্র হাতিপোতা বাজাবে পুলিশ চেকপোস্টের সামনে রাখতাম, আর রাতে আলিপুরদুয়ারে কাছে থাকতাম। এইভাবে আমরা পুলিশ নিয়ে কোন রকমে কাজ শেষ করলাম। স্থানীয় লোকেরা দিনে আমাদের ভয় দেখাতো টাকা না দিলে প্রাণে মেরে ফেলবে। আমরা পুলিশ নিয়ে যাতায়াত করতাম বলে লোকরা টু-টা শব্দ করতে পারেনি। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল আমাদের উপর। প্রশাসনকে জানালো, তদন্ত হবে, জেনে আমরা একটা বুদ্ধি বার করলাম। বাজার থেকে একটা নতুন টেপ ফিতা কিনে সেই টেপ ফিতা থেকে ২ ফুট বাদ দিলাম। সেই কাজ করালাম জলপাইগুড়ির এক অভিজ্ঞ দর্জিকে দিয়ে এমন ভাবে সেলাই করা হল সহজে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। তদন্ত চলার সময় রাস্তার পরিধি ২০ ফুটের জায়গায় ২২ ফুট দেখাল। এখানে কাজ করতে এসে দেউলিয়া হয়ে গেছি। প্রতিদিন আলিপুরদুয়ার থেকে ট্রাক ভাঁড়া করে লেবারদের নিয়ে কাজে আসতাম বেলা ৩টার মধ্যে ফিরে যেতাম। আমাদের বিল আটকিয়ে দিয়েছিল, এই কাজ কে করেছে প্রশাসনের ২ জন আর তুই ছাড়া কেউ জানতে না পারে। আগামী কাল খুব ভোরে পুলিশের গাড়িতে বাড়ি ফিরে যাবো। ভাল থাকিস, এই বলে চলে গেলেন।

✠✠✠✠✠

বিনি সুতায় বিন্না

গায়েত্রী দেবনাথ

তলিয়ে যাওয়া বৃষ্টি ভেজা সকালে বাশির সুর গায়ে জড়িয়ে ফিনফিনে বাতাসের দিকে এক গাল ব্যাঙ্গাত্মক হাসি দিয়ে বিন্না কাজে লেগে পরে। কাজ করার সময় তার মুখ তরুণ তপস্বীর মুখের মতন। যৎসামান্য বেঁচে থাকার জন্য অনর্গল বৃষ্টি, প্যাচপ্যাচে কাদাও তুচ্ছ।

বিন্না কাঠ কেটে দিনমজুর খেটে ভাত জোগাড় করে। হ্যা, শুধু ভোটের জন্যই সাদা শোক গায়ে জড়িয়ে নিস্পলক চোখে জারদৌসি স্বপ্ন দেখে। যে গাছটা তাকে মায়ের আঁচলের মতন স্নিগ্ধ ছায়া দিয়েছে এতকাল। তাকে আজ কুঠারে আঘাত করতে হাত কাঁপছে বিন্নার। গরমে মাঠ ঘাট মাইক্রোওভেন হয়ে ওঠে তখন এই গাছটি তাকে ঠান্ডা ছায়া দিয়েছে এতকাল।

বিন্না সাত ফুট এক ইঞ্চির দেহে মেদহীন *** পেট। কিন্তু পেটের ক্ষিদে এতটাই যে রোজ দুকেজি চালের ভাত ছাড়া সে ক্ষিদের আগুন নিভেনা। শুধু ভাতের জন্য অনেক সময় বিনে পয়সায় লোকের বাড়িতে কাজ করেছে সে।

গোধূলির মায়া কাটিয়ে সূর্য যেমন ডোবে ঠিক তেমনি মর্মর মূর্তি জলজ মাঠে আছার পারে। গাছটিকে কুঠারের আঘাতে মাটিতে এলিয়ে বিন্নার ধুলোমাখা গাল বেয়ে বিন্দু বিন্দু *** হাওমাও করে নিষ্পাপ শিশুর মত দু'দণ্ড চিৎকার করে কেঁদে ওঠে।

স্বাভাবিক হয়ে শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলে। বৃষ্টির দিনগুলোতে কাজ করা খুব কষ্টকর। গ্রাম গঞ্জেও তেমন সুবিধা নেই। তবে স্ত্রী গুলিকে ছেড়ে, ছেলে মেয়েদের ছেড়ে বিন্না কোথাও থাকতে পারেনা। বৃষ্টি ফুরোলেই শরৎ-এর সাদা মেঘ উকি দেবে। ওলিকে আবার জামদানি শাড়ি কিনে দেবে কথা দিয়েছিল।

হরেন কাকার দোকানে জরি দিয়ে কেনা নিখুঁত কাজের জামদানি শাড়িগুলির চোখের আয়নায় নেই কাজের ছবি আঁকা। দোকানে গেলেই এক চোখে পিপাসা নিয়ে ফেলফেল তাকিয়ে থাকে।

ওলির চিকন গাল বেয়ে সারল্য ভরা সাদা বেলি ফুলের হাসি ঝরে পড়ে বিন্না জামদানি এনে দেবে বললেই। বিন্যাস সাদা গেঞ্জি জুড়ে নানা জুরে না বোনা স্বপ্নেদের ছিদ্র। সেই ছিদ্র বেয়ে। জন্মান্তরের অন্ধকার নেমে আসে। শরীর *** মান দৈত্যের মতো চেহারা দেখে কোন জায়গায় কাজও দেয় না। ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছিল পড়ার সব দেখে একজন মালিক তাকে ইংরেজি শিখিয়েছিল। তাতে কি? কত পাস করা ছেলেরা বেকার। দিনমজুরি করছে পেটের আগুন নেভাতে।

টিম টিম তারাদের পসরা। শেষ বেলায় কাজ সেরে চৌপথি থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে বাড়ি ফেরার পালা।

রাস্তার নেড়ি কুকুর গুলোও সন্ধ্যা আড্ডায় ব্যস্ত।

গ্রামের সরু পথ গুলো অন্ধকারে ডুবে যায় পথচারীদের আশার আলো প্রদীপ গুলো ঠিক জ্বলবেই বিন্নার বাড়ির সামনে অনেকগুলো ছেলেছোকরার দল দলা পাকিয়ে বিন্নার বুকের ভিতর ধুকপুক শব্দ বেড়ে গেল। পাওনাদারদের আশঙ্কায় সে বাক বদল করে সমস্যা এড়াতে চায়। হঠাৎ ভোলা পেপার বিন্নাকে ফিরে আসতে বলে। বিন্না না-শোনার ভান করে কিছুটা পথ পার হয়। পেপার সাইকেল চালিয়ে তাড়া করে। বিন্নার পথ রোধ করে সামনাসামনি হয়। বিন্না তারা করার কারণ জিজ্ঞাসা করতেই পেপার বলে, "বিন্নাদা তোমার কপাল খুলে গেছে তুমি বডি বিল্ডিং কম্পিটিশনে স্টেট লেভেল থেকে দারয়ানের পারমিশন পেয়েছো।

বিন্না একটু বিরক্তির সঙ্গে দরাজ গলায় জিজ্ঞেস করে, 'বডি বিল্ডিং? সেটা আবার কি?' 'পেপার জানায় বৌদি কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে তোমার ছবি আর তোমার সমস্ত কাগজপত্র পাঠায়। গ্রামে তুমি সবার সেরা বডি বিল্ডার। কোন ট্রেনিং ছাড়াই পান্তা ভাত খেয়ে আর কাঠ কেটে এই সুঠাম-বলিষ্ঠ শরীর বানিয়েছ। আমাদের সবুজপেরা গ্রামের গর্ব। বৌদি তোমার অনেকগুলো ছবি পাঠিয়েছে যেখানে রোদে পোরে কাঠ কাটার ছবিগুলো আছে। এই কম্পিটিশনে জিতে গেলে তুমি দেশের হয়ে যোগদান করতে পারবে। তখন তোমার টাকার, বাড়ি, ভাত কিছুরই অভাব হবে না।

বিন্না মনে মনে ভাবছে এই লাজুক সহজ বোকা মেয়েটা এতো কিছু কি করে করলো। আসলে বিদ্যা ও মাধ্যমিকে অনেক নাম্বার নিয়ে পাশ করেছিলো। গরীবের মেয়েদের কি আর পড়া হয়। বিন্নার সঙ্গে তার বাবা মা ওলির বিয়ে দেয়। কোনোদিন ও কোন অভিযোগ করেনি। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা নিয়ে খুব সতর্ক। দিন মজুরের বউ বলেও কোনো আক্ষেপ নেই। সবসময় ঠোঁটের কোণে হাসি লেগে থাকে। এই হাসিটুকুই তো বিন্নার অভাবের মধ্যে অমূল্য সম্পদ। কালো অক্ষর পেটে আছে বলেই হাসিমুখে সব করতে পারে। সবাই এন্ট্রি ডকোমেন্টস আর ট্রেনের টিকিট হাতে তুলে দিয়ে চলে যায়। বিন্না ওলিকে সবটা জানায়। ওলি আগে থেকেই সব জানতো। সে হাতের চুড়ি গুলো বিক্রি করে বিন্নার জন্য সব পোশাক, জুতো, ব্যাগ, গাড়ি নিয়ে আসে।

কিছু টাকা ধার নেয় হরেন কাকার থেকে। পূজোর আগে সব শোধ করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েই ওলি এই ব্যবস্থা করে।

বিন্নার চোখে জল বিন্দু বিন্দু ভালবাসার পারো চকচক করে। ওলির একরাশ স্বপ্নেরমান সে রাখতে পারবে তো। নিজের উপর সন্দেহ করলে সবটাই শেষ হয়ে যাবে। তাই পরদিন ভোরেই ট্রেন ধরে সোজা কোলকাতায়। কোচের বাইরে সামনে বিন্নাকে দেখে অন্যান্য প্রতিযোগীদের মনোবল ভেঙে যায়। ওলির বিশ্বাসের মর্যাদা রেখে পান্তা ভাত খাওয়া বিন্না রাজ্যের হয়ে পরে দেশের হয়ে বডিবিল্ডিং কম্পিটিশনে জিতে মেডেল নিযে ঘরে ফেরে।

✠✠✠✠✠

ঐন্দ্র্যজাল

চৈতালী মুখোপাধ্যায়

সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক্– গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা আমাদের একমাত্র কাম্য। আমরা তা গড়বোই গড়বো ....
সমস্বরে – তা গড়বোই গড়বো ......
সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক্ –
সমস্বরে – নিপাত যাক্, নিপাত যাক্।
ভাইসব আরো জোরে – এই আওয়াজ যেন সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিভূমিকে ভূমিকম্পের মত নাড়িয়ে দেয়।
সমস্বরে – নিপাত যাক, নিপাত যাক্।

রাজপথের মূল অংশ অধিকার করে দুপুর বারটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের নিপাতমন্ত্রে ভূপতিত হচ্ছে গণতন্ত্র।

বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত সৌম্য আর পারেনা। দু'দিন হ'ল সংবাদটা পেয়েও হন্তদন্ত হয়ে সুদূর গুজরাট থেকে রওনা দিয়েছে বাড়ির উদ্দেশ্যে। বাবার হার্ট অ্যাটাক করেছে। বাড়িতে একা অসুস্থ বয়স্ক মা – অসহায় ভাবে প্রতিবেশীর ছিটেফোঁটা দাক্ষিণ্যের ভরসায়।

প্রতিবেশীরা সবাই মিটিং মিছিল নিয়ে ব্যস্ত। সামনে নির্বাচন। এই সময় নিজের তৎপরতাটা একটু উঁচু তলার চোখে ফেলতে পারলেই কেল্লাফতে! দল জিতুক না জিতুক – পরবর্ত্তী সময়ে নিজের অবস্থানটা পাকাপাকি করতে এবং ভবিষ্যতের আখের গোছাতে এই সময়টার সদ্ব্যব্যবহার প্রয়োজন। অতএব 'মাতঙ্গিনী মেতেছে আজ সমরাঙ্গণে।'

সৌম্যের স্টেশন থেকে নেমে বাসে চড়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে এখনো তিনঘন্টা লাগবে। বেশ হিসেব কষেই সব চলছিল – ট্রেন ঠিক সময়ে পৌঁছালো স্টেশন থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে সামনের বাসস্ট্যান্ড থেকে ফুলঝুরি গ্রামে বাসটিও পেয়ে গেল।

ঈশ্বরের কৃপায় জানালার পাশে একখানা সিট পেয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেললো সৌম্য। আর মাত্র তিন ঘণ্টার পথ। বাড়ি পৌঁছে পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে ভাবতে ভাবতে মাত্র ১০ মিনিটের পথ অতিক্রম করেছে অমনি রাজপথের মোড়ে বিশাল যানজট। গাড়ি আটকে গেল। রাজপথ আটকে গণতন্ত্রের লড়াই চলছে। এখন এই সবে বিকেল চারটে। জনতার ঢল ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুপুর বারোটা থেকেই কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় করেছে বিবেক স্কোয়ারে। দুর দূর অঞ্চল থেকে প্রচুর মানুষ গাড়ি রিজার্ভ করে এসেছেন। অনেকেই মূল অংশে পৌঁছানোর সুযোগটুকুও পায়নি। হয়তো পাবেও না। তবু আশা ছাড়েনি ধস্তাধস্তিতে রাজপথ বেসামাল।

সৌম্য অবাক হয়ে ভাবে – এত জনসংখ্যা আমাদের দেশে! এ দেশের এত লোক বল! এত সৃষ্টি শক্তিতে ভরদুপুর এ মাতৃভূমি! এরা প্রত্যেকে সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসে মরিয়া, তৎপর গণতন্ত্রের মশাল সঞ্চালনে!

জানালা থেকে মুখ বাড়াতেই ভিড়ে ঠাসা এক যুবকের দিকে দৃষ্টি গেল। চোখে সানগ্লাস, মাথায় চুল বাবরি ছাঁট – গলায় একটা গভীর রঙিন রুমাল ঝুলছে। জামার বোতাম খোলা। হাতে সমর্থকের ঝান্ডা। মাঝে মাঝে মাইকে ভেসে আসা কথার সূত্র ধরে গলা মেলাচ্ছে – 'নিপাত যাক নিপাত যাক'।

সৌম্য ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করল আজকের জনসভায় কে বক্তব্য রাখছেন?

ভিড় দেখে বুঝতে পারছোনা? মাসি - মাসি ......

হঠাৎ একজন বলে উঠলো – 'মামারাও আছেন অনেকে'।

বাসের ভেতর থেকে একজন মন্তব্য করলেন – 'তা বোনপো, ভাগ্নেরা এত দূরে থাকলে জনসভা হবে কি করে?'

ভিড় থেকে চিৎকার করে উঠল – ''আরে একটু দেরী হয়ে গেলো, আমাদের গাড়ির টায়ার পাংচার হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যেই এত ভিড়। বাস গুলোকেও বলিহারি! দেখছে জনসভা – এদিক দিয়ে না গেলেই নয়?''

'সে তো পুলিশের দায়িত্ব – রাস্তাটা তো ওদের ঠিক করে দেওয়ার কথা'– সৌম্য বললো।

'পুলিশ আর কত করবে? ভালোভাবে বলে তো কিছু করতে পারছে না – দু'এক ঘা গাড়ির চালকের ঘাড়ে পড়লেই বেশ বুঝবে বিপত্তি সৃষ্টি করার ফল কি হয়'– ছেলেটা উত্তেজিত ভাবে বলল।

'রাস্তার মাঝে এভাবে জনসভা করা তো অন্যায় – রাস্তা তো হাঁটার জন্য। গাড়ি-ঘোড়া যাওয়া আসার জন্য, নাকি সভা-সমাবেশ করার জন্য ?' বেশ রাগত স্বরেই এক যাত্রী বলে উঠলো।

ছেলেটা গর্জে উঠলো – 'এ জনসভা মানুষের মঙ্গলের জন্য। গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্য। মানুষ তো মৃত – বোধ, ভাবনা, ভালো-মন্দ সব লোপ পেয়েছে। দেখেও দেখেনা , বুঝেও বোঝে না। তাই পথচলতি প্রত্যেককে জাগাতে হবে। প্রত্যেকের কানে এই বার্তা পৌঁছাতে হবে। ফাঁকা স্থান এখানে কোথায়? আর দূরে কোথাও থাকলেও আপামর মানুষের সান্নিধ্য কিভাবে পাওয়া যাবে?'

সৌম্য দেখছে গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষার্থে নিবেদিতপ্রাণ এরা। এদের কি অসম্ভব দায়িত্ববোধ! কোন্ সুদূর থেকে এত সহ্য করে গণতন্ত্রের মন্ত্রে নিজেদেরকে ও অন্যকে চাঙ্গা করতে ছুটে আসা!

এরকম বিশ্বাসী-ভরসার স্থানগুলো থাকে বলেই সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, দেশ পরিচালিত হয়। শাসন ব্যবস্থা অক্ষুন্ন থাকে। সৌম্যর নিজেকে এক অকর্মণ্য, দায়িত্ব-জ্ঞানহীন ব্যক্তি বলেই মনে হচ্ছে। অন্যের বিষয়ে বিন্দুমাত্র ভাবনাও কোনদিন করছে বলে মনে হয় না। সংসার, সমাজ, আপনজন, দেশ সব বলতেই নিজের বাবা, মা ও বোন। তাদের মধ্যেই আটকে আছে। পরার্থপরতা, বলিদান ও হিতকর প্রতিশ্রুতিগুলো, বোনটার বিয়ে হয়ে যাওয়াই গন্ডীটা যেন আরো ছোট হয়ে গেছে। সুদূরে কাজের জন্য থাকায় দায়-দায়িত্বের পরিমাণটা যেন আরও সংকীর্ণ ও সাময়িক হয়ে উঠেছে। অন্যের কথা শোনা বা ভাবার মতো মনোবৃত্তি কোনদিনই তৈরি হয়নি। এই লোকগুলোর কিছু ভালো করার মানসিকতা নিশ্চয় আছে। নইলে এইভাবে ....। নিজেকে বেশ অকর্মণ্য, ভীরু, কর্মবিমুখ মনে হচ্ছে। ভিড়টা 'বন্দেমাতরম্', 'জয় হিন্দ্' সব ধ্বনি দিচ্ছে। স্লোগানের শব্দে সৌম্যের গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল – এই তো দেশপ্রেমিকদের মন্ত্র!

দেশ গড়ার ধ্বনি। কোনদিন এত দরদ দিয়ে, এত আপন করে এভাবে তারস্বরে এ ধ্বনির উচ্চারণ করেনি। ২৬শে জানুয়ারি, ১৫ই আগস্ট স্কুলের অনুষ্ঠানে এ স্লোগান বহুবার করেছে কিন্তু এত প্রাণ থেকে আবেগঘন হয়তো শব্দ বের হয়নি। এরা সত্যি দেশপ্রেমিক, দেশমাতার সন্তান! দেশের কারিগর। নিজের হিতকে তুচ্ছ করে অন্যের জন্য কিছু করার খাতিরে এভাবে শ্রমদান, অধ্যাবসায় – অভাবনীয়। সৌম্যর আজ ওদের প্রত্যেককে স্যালুট করতে ইচ্ছে করছে।

সৌম্য আপন চিন্তাতে বিভোর হঠাৎ প্রচন্ড চীৎকারে সম্বিৎ ফিরে পেল। ভিড়টা যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। প্রবল উত্তেজনা – ঠেলাঠেলি, মারামারি – গুঁতোগুঁতি আরম্ভ হয়ে গেল। মাইকে বারবার কিছু বলা হচ্ছে মানুষের আওয়াজে কান পাতা দায়। যেটুকু বোঝা গেল তা হ'ল কিছু বিরোধীগুন্ডা জনসভায় ঢুকে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। মামা-মাসিদের ওপর আক্রমন করতে গেছে – ওদের শাস্তি দিতেই হবে। অতএব বিরোধীকে দূর্মুস কর। বিশাল অপরিচিত জনতা পরস্পরকে বিরোধী ভেবে আরম্ভ করছে মল্লযুদ্ধ। হাতাহাতি থেকে প্রবল মারামারি। ঠাসা ভিড়ে মা'র না খেয়ে কেউ পালিয়ে যাবে সে উপায় নেই। ফলে প্রত্যেকে প্রত্যেককে পেটাচ্ছে। আক্রান্ত হচ্ছে সবাই। মানুষ বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত ও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। দাঁড়িয়ে থাকা সব যানবাহনের জানালা মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল। উন্মত্ত এলোপাথাড়ি বাড়ি মেরে চলেছে গাড়িগুলোর ওপর। কারো মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে, কেউ চোখে হাত রেখে আর্তনাদ করছে, কারো বস্ত্র ছিন্নভিন্ন। এ কেমন হল? সৌম্য অবাক হয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে জানলার আড়াল থেকে দেখছে। আজ প্রাণ হাতে এখান থেকে মুক্তি পাবে সে আশা ক্রমশঃ দুরাশা হয়ে উঠেছে। চৌমাথা থেকে ভিড়টা ক্রমশঃ পিছু হটছে। ফলে ওদের চতুর্দিকে বিপুল জনতা ক্রমাগত ধেয়ে আসছে। বিরামহীন মানুষের তল – কান্না। চিৎকার আর্তনাদে আকাশ বাতাস

এক হয়ে যাচ্ছে। প্রায় ঘন্টাখানেক হয়ে এল এ-তান্ডব থামাতে কোন পুলিশি তৎপরতা চোখে পড়লো না। আত্মরক্ষার জন্য বেশ কিছু জনতা রাস্তায় গাড়িগুলো আশ্রয় নেওয়ার জন্য শুরু করেছে জোড়া আক্রমণ। ভয়ে আতঙ্কে অনেক যাত্রী গাড়ির জানালা খুলে দরজা খুলে দিয়েছে। সৌম্যদের গাড়ির খালাসী অনেক চেষ্টা করেও গাড়ির দরজা আটকে রাখতে পারল না। বিশাল একটা ভিড় লাঠি-সড়কি হাতে হু হু করে উঠে পড়ল গাড়ির ওপর কিছু বলার অপেক্ষা না করেই শুরু হ'ল নির্বিচারে আক্রমণ। বাসের যাত্রীরা অনুনয়-বিনয় করে শেষ রক্ষা করতে না পেরে মারমুখী হয়ে উঠল। শুরু হ'ল খণ্ডযুদ্ধ। সৌম্য আসন ছেড়ে চালকের আসনে নিচে আত্মগোপন করেছে। মানুষের দাপাদাপিতে গাড়িটা ভীষণ নড়ছে। গাড়ির মাথার উপরে অসংখ্য মানুষের ধস্তাধস্তি; ঠেলাঠেলি চলছে। হঠাৎ প্রচন্ড চোখ জ্বালা শুরু হ'ল। প্রত্যেকে ত্রাহি ত্রাহি রবে প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত। সৌম্য দেখল মানুষ পিছন দিকে ছুটছে। লাভা স্রোতের মতো গড়িয়ে যাচ্ছে ভিড়টা। সামনে থেকে ধেয়ে আসছে ঢাল-বর্মা হাতে পুলিশের দল, সাথে জলকামান ও কাঁদানে গ্যাস। চোখের জ্বালা তীব্র হয়ে উঠল। বাসের ভেতরের দম বন্ধ হয়ে আসছে। সৌম্য গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে বুক। হঠাৎ কে যেন শক্ত হাতে তাঁর হাতখানা চেপে ধরল। তারপর শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে কোথায় যে নিয়ে চলছে বুঝতে পারছেনা সৌম্য। অনেকবার চেষ্টা করল চোখের পাতা খোলার, কিন্তু পাতা গুলো যেন সেলোটেপ দিয়ে আটকে দিয়েছে। শক্ত হাতে তাকে কিছুটা টেনে এনে পেছনে কয়েক ঘা বসিয়ে ঠেলে তুলল একটা গাড়ির উপর। ততক্ষণে সারা গা জলে কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে। গাড়িটা চলতে শুরু করল, 'জিন্দাবাদ', 'বন্দেমাতরম', 'জয় হিন্দ' কত ধ্বনি কানে এসে ভিড় করলো সৌম্যর। তাহলে কি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় শামিল হ'ল? ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছিলনা সৌম্য। পকেট থেকে রুমাল বের করে অনেক পরিচর্যায় চোখ পরিষ্কার করে যখন হালকা দৃষ্টি পেল তখন নিজেকে খুঁজে পেল এক থানা চত্বরে কয়েক শত মানুষের ভিড়ে। ব্যাপারটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই কয়েকজন নেতা গোছের ব্যক্তি স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে এলেন। প্রত্যেকের উদ্দেশ্য বলতে শুরু করলেন – ভাইসব আমরা আছি। তোমরা চিন্তা করো না। যেভাবে তোমরা লড়াই করেছো তা সকল বিরোধীদের ভিত্তিভূমিকে নাড়িয়ে দিয়েছে। গণতন্ত্র ভূলুণ্ঠিত হবে না। আমরা সাম্যের জন্য মানুষের ন্যায্য প্রাপ্য আদায়ের জন্য যে কোন মূল্য দিতে রাজি।

ভিড়টা চিৎকার করে উঠল – হ্যাঁ আমরা রাজি – রাজি।

ভাইসব তোমাদের পাশে আমরা আছি। সকলের জন্যই আমরা জীবনপণ করে কাজ করবো। ভাইসব তোমাদের মুক্তি হয়েছে। পুলিশ ভুল স্বীকার করেছে, চলো সকলে।

সৌম্য সামনে সাইনবোর্ড টার দিকে তাকাল – মাথাটা বন বন করে ঘুরে গেল। 'সোনারদা পুলিশ স্টেশন'। এ তো তার বাড়ির বিপরীতে ৪০ কিমি দূরে। হুড়মুড় করে

জনতা থানা চত্বর থেকে বের হচ্ছে। সৌম্যর মাথায় চিন্তা বাড়ি কী করে যাবে। এখান থেকে যাওয়া মুশকিল – এছাড়া ব্যাগভর্তি জিনিষপত্র কোথায়, কি অবস্থায় আছে কিছুই ঠাহর করতে পারছে না। সাহসে ভর করে এক নেতার কাছে গিয়ে বলল – 'দাদা আমি মিছিলে আসিনি। বাসে ছিলাম। ফুলঝুরি যাচ্ছিলাম। হঠাৎ এসবের শিকার হলাম। আমার ব্যাগ। জিনিসপত্র গাড়িতে ছিল। এখন কোথায় কিছু বুঝতে পারছি না। কি করে বাড়ি যাবো? তাও ......

– 'তো?'

– না – মানে যদি একটু আপনারা ....'

– তোমাকে পৌছে দেব?

– 'হ্যাঁ, মানে ......

– 'স্পর্ধা তো তোমার কম নয়। আমাদের ছেলেদের এখনো উদ্ধার করতে পারিনি। চতুর্দিকে বিপর্যয় আর তোমার জন্য ....

– ''না, আসলে আমার বাবার হার্ট অ্যাটাক করেছে' মা একা – এখনো আইসিইউতে আছেন। তাই ....''

''কখন হ'ল? এরই মধ্যে বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল? আইসিউতে চলে গেলেন?''

– ''না – না – ও তো দু'দিন হ'ল ....'

– চুপ! মারবো এক থাপ্পড়! বেটা কাহানি শোনাচ্ছে! ভাগ এখান থেকে। আর বাড়ি গিয়ে কাজ নেই – যা তোর বাবা ফুটে গেছে! যত্ত সব! চলো সবাই।''

উপস্থিত মানুষগুলো হি হি করে হেসে উঠল। ভিড়টা গায়ে গুতো মেরে হন্ত-দন্ত হয়ে নেতার সাথে বেরিয়ে পরলো। সৌম্যের কানে ভাসতে লাগলো ''সকলের জন্য সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

কবি-সাহিত্যিকরা এসব কথা বানিয়ে কী সাংঘাতিক বিপদ করেছেন–! কথার ফুলঝুরি ফুঁটিয়ে প্রতিনিয়ত ঘা মারছে তথাকথিত সমাজের ধারক ও বাহকের দল। এসব কথা আছে তথাকথিত স্লোগান – মানুষকে বোকা বানানোর এক উপযোগী অস্ত্র। দিনের পর দিন মেকি মানবদরদী। দেশপ্রেমিকের দল স্পন্দনহীন, হৃদয়হীন। মনুষ্যত্বহীন প্রকৃতিকে আড়াল করার জন্য। এ সব কথাকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে যাচ্ছে।

সৌম্য ধীরে ধীরে রাস্তার উপরে উঠে এল। যতদূর দৃষ্টি যায় কোন গাড়ি চোখে পড়ল না। কয়েকটা পুলিশের ভ্যান ঘোরাঘুরি করছে। নিস্তব্ধতা ও নির্জনতার মোড়া চারপাশ। রাত্রি দশটা বাজে। মায়ের কথা মাথায় আসতে ছটফট করে উঠলো মনটা। পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে মাকে ফোন করতে গিয়ে দেখে চার্জ নেই, বন্ধ হয়ে গেছে। ভীষণ অসহায় বোধ করছে সৌম্য। যেন ভিন্ন দেশে এসে পড়েছে। দূর থেকে একটা পুলিশ ভ্যান দেখে সাহসে ভর করে ছুটে গেল। সব কথা জানিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করল। গভীরভাবে পুলিশের দল

জানালো –

'এখন কিছু করা যাবে না। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।' নিঝুম রাত্রিতে উত্তেজনার পারদ চড়িয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেল পুলিশের ভ্যান।

খিদে, তৃষ্ণা, ক্লান্তি ভয়ঙ্কর রূপে গ্রাস করল। সম্মুখে পা যেন আর চলে না। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। শরীরটা কোনরকমে ফুটপাতের এক প্রান্তে টেনে এনেই আছরে পড়ল রাস্তার উপর। ভারী শব্দে ফুটপাতের এক মুটে ছুটে এল। অচৈতন্য গায়ে হাত বুলিয়ে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে সৌম্যকে স্বাভাবিক করে তুলল। সবশুনে নিমের ত্যাবড়ানো কালো টিনের কৌটা থেকে দু'খানা বিস্কুট ও মলিন বোতলের এক গ্লাস জল সৌম্যর সামনে এনে গভীর স্নেহে বলল – 'এটুকু খেয়ে নিন বাবু, শরীরের শক্তি তো চায় দয়া করে খেয়ে নিন।'

নির্বাক সৌম্য নিস্পলক চাউনিতে হাত বাড়ালো বিস্কুট ও জলের দিকে।

এই সুবল আছে – চিন্তা নেই গো। দাদাবাবু কিছু তো করতে পারবো না আপনার জন্য – 'আসুন দেখি আমার রিকশা-ভ্যান উঠে পড়ুন।'

পরম স্নেহে গভীর প্রত্যয়ে নিজের রিক্সাতে সৌম্যকে চাপিয়ে রওনা দিলো গন্তব্যের উদ্দেশ্যে।

একথা সে কথার পর জানা গেল রিক্সাওয়ালা ওই দলের সভাতে গেছিল। কিন্তু গন্ডগোল বাধার পূর্বেই 'তপেন মামা', দলের অন্যতম বড় নেতার বাড়িতে বাগানের গোবর মাটি পৌঁছানোর জন্য চলে এসেছিল। ইচ্ছে ছিল সভায় কে কি বলেন শোনার। কিন্তু তপন মামা বলে ছিলেন – 'ওসব তোদের জন্য নয় সুবল। ফাঁকা পেয়েছিস কাজটা করে দিস্ আমার। তোদের, জন্য তো আমি আছি, ওসব শুনে কি করবি?'

– তাই তপন মামার কথা মেনে ওখান থেকে তিনটে নাগাদ সরে পড়ি। ভাগ্যিস চলে এসেছিলাম, নইলে কি বিপদটাই না হ'তো। তপন মামাকে নমস্কার।

– তপেন মামা তোমার পরিবারের খবর রাখেন?

– হ্যাঁ রাখেন বৈকি।

সুবলের শ্রী তপন মামার বাড়িতে রান্নার কাজ পেয়েছে। মেয়েটাও সেখানে পরিচালিকার কাজ করে। ছেলেটা ওনার গাড়ি চালায়। বাড়ির বাজার হাট সব দায়িত্ব ছেলের। সুবলের বাড়িটা ভেঙে গেছে গত ৩ বছর হলো। তপন মামা বড় নেতা তো! বিশাল জমিদার – উনি সব জানেন। দু'বছর নানা ব্যস্ততার জন্য পারেননি তবে কথা দিয়েছেন আগামী বছর ফাল্গুন মাসের মধ্যেই যেন নতুন বাড়ি পায় তার ব্যবস্থা করে দেবেন।

এক গাল ফাঁকা হাসি হেসে সুবল জানায় –

– আমি এখন ফুটপাতে প্লাস্টিকের সামিয়ানা খাটিয়ে জিনিসপত্র আড়াল দিয়ে থাকি। ওর বউও মেয়ে সারাদিন কাজের তাগিদে তপন মামার বাড়িতেই কাটিয়ে দেয়। রাত্রিতে

হয়তো কোনদিন বউ ফেরে। ছেলেটা গাড়িতেই শোয়।

– বেশ নিরাপদেই আছে ওরা। তাই আমি একটু নিশ্চিন্ত।

– তোমার ছেলে-মেয়ের বয়স কত?

– ছেলেটা এ সবে ষোল, মেয়েটা বারো-তেরো বছর হবে।

– এইটুকু ছেলে গাড়ি চালায়? ওর ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই?

– তার প্রয়োজন নেই। তপন মামা বলেছে বাচ্চু অ্যাক্সিডেন্ট করল করলে উনি আছেন। সর্ব্বময় কত্তা। আর ওর তো বয়স হয়নি তাই ভয়ের কিছুই নেই। কেস হবে না কো!

সুবলের নির্লিপ্ত উত্তর,– তপন মামার ওপর আস্থা সৌম্যকে অবাক করে দিচ্ছে।

– তোমার ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করেনি?

– পড়তো, আমার ছেলেটা ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছে। আর মেয়েটা দু'ক্লাস পর্যন্ত গড়িয়েছে। বুঝতেই পারছেন অভাবের সংসার। সে কথা বলতে তপন মামা বললো – এমনিতে তো কিছু করা যাবে না, আর বসে বসে তুইও তো সাহায্য নিতে পারবি না। ইমানদার মানুষ তুই। ছেলে-মেয়ে গুলোর পড়াশোনার পিছনে ব্যয় করে ভবিষ্যতে কি পাবি? পুরোটাই তো জলে যাবে। অক্ষর পরিচয় হয়েছে। এরপর এক কাজ কর তোর বৌ-ছেলে-মেয়েকে আমার বাড়িতে কাজে লাগিয়ে নিশ্চিন্তে থাক দেখি। কত আর সারা জীবন সংসারটা নিয়ে দিন আনি দিন খাই ভাববি। উনি এভাবে কৃপা করলেন আমায়।

– কি পাও ওদের কাজের বিনিময়?

– হাতে কিছু পায় না বাবু। মাথার উপরে তপেন মামা আছে, এটাই পাওয়া। ওদের সারাজীবন দু'মুঠো খাবার আর রাত্রে মাথাগোঁজার ব্যবস্থা টুকু জোটে। আমার ভাবনা আমি করিনে .....। যখন যেখানে যা পাই তাই দিয়েই ......।

খোলা আকাশের দিকে ছল ছল চোখে তাকিয়ে সৌম্য জিজ্ঞেস করল – সুবলদা তুমি গণতন্ত্র কি জানো? সাম্রাজ্যবাদ কথাটা তোমার ......

সুবল হো হো করে হেসে ফেললো। – কি যে বলেন বাবু? ওসব কি আমাদের কথা? ও হ'ল বাবুদের ভাষা। ওসব জেনে আমরা কি করবো? আমাদের লেখাপড়া কোথায়? আমাদের দুবেলা-দুমুঠো খাবার আর একটু ছেলেমেয়ে বউয়ের মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলেই চলবে। বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে নেই গো! যার যা থাকে তাই মেনেই সন্তুষ্ট হতে হয় যে। তা বাবু গণতন্ত্র মানে কী?

– গণতন্ত্র মানে প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার।

– মানে? একথা আমাদের শাস্ত্ররে বলেছে বুঝি?

– সৌম্য ধৈর্য ধরে সুবলের কাছে গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা করলো। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, সকলের বাঁচার স্বাধীনতার কথা – সমান অধিকারের কথা যা দেশের সংবিধানে

উল্লিখিত।

হাসিতে ভরিয়ে তুলল নির্জন জনপদ।

– এটা কি কখনো হয় বাবু? হাতের পাঁচটা আঙুল কি সমান করা যায়? এই ভাবনাটা যাদের মাথায় প্রথম এসেছে তাদেরকে আমি পাগল ছাড়া কিছুই ভাবতে পারছিনে।

আমি আপনার ঘরে কাজ না করলে কে আপনার ঘরের কাজগুলো করবে বাবু? আমি আপনার কণ্ঠে ফরমাশ না খাটলে কে আপনাকে সেবা দেবে বাবু? আমি চুপ বলেই আপনার মুখে এত ভাষা! সে ভাষার এত কদর – কত মূল্য!

সবাই যদি সমান হয় তবে এই দেশটা চলবে কি করে? ভগবান অনেক ভেবেচিন্তে এসব করেছে – আমাদের মানুষের কি এত বুদ্ধি শক্তি আছে এসব বোঝার!

কিছুক্ষণ চুপ থেকে ধীরে ধীরে বলে – বাবু সত্যিই এমন দিন কি কখনো আসবে, আপনি যেটা বললেন? আমরাও বাড়ি, গাড়ি, লেখাপড়া ..... আমাদের ছেলে-মেয়েগুলো আপনাদের মত ...... এটা কি হবে ....? আমরাও পেটভরে খেতে পাব। ছেলেপিলের চোখে জন্ম থেকেই অভাবের কান্না থাকবে না ...... দুঃসহ যন্ত্রণা পরিবারটাকে টুকরো করবে না ...... এরকম কি .....!

আসুন আমরা সোনার ভারতবর্ষ গড়ি – সাম্যের বাতাবরণে মুড়ে ফেলি – ধনী, দরিদ্র উচ্চ নীচের ভেদাভেদ নয়, সকলের জন্য সকলে আমরা ......' দূর শূণ্য থেকে যেন কথাগুলো ভেসে আসছে সৌম্যের কানে। একী! শরীরের প্রতিটি কোষে যেন উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হচ্ছে। চোখের তারায় ফুটে উঠছে এক এক মুক্তি যোদ্ধার দেশ প্রেমের ছবি। গদগদ স্বরে বলে উঠলো – "নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা

তব আশ্রমে তোমার চরণে হে ভারত, লব শিক্ষা!

* * * * * *

যদি হই দীন, না হইবো হীন, ছাড়িব পরের ভিক্ষা!

নববর্ষে করিলাম পণ, লব স্বদেশের দীক্ষা!"

বিস্মিত সুবল অস্ফুট কণ্ঠে ডাক দিল – 'দাদাবাবু।' সৌম্যের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো। দুই হাত দিয়ে দৃঢ় ভাবে সুবলের কাঁধ চেপে ধরলো।

মধ্যরাত্রির নির্জনতা ও হালকা চাঁদের আলোকে সাক্ষী রেখে গর্জে উঠলো সৌম্যের কণ্ঠে –

বন্দে...মাতরম ..... বন্দেমাতরম্ জয়....হিন্দ – জয় হিন্দ!

৺৺৺৺৺

চৈতী হাওয়া

অজিত কুমার দে

সাধন দত্ত ও বিপিন গুপ্ত পাশাপাশি বাড়ীতে থাকে অকৃত্রিম বন্ধু, তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, পাড়ার নাম রামবামপুর, সংখ্যাগুরুর পাড়ার নাম ষাড়মারা, মহকুমা কামালপুর, জেলা - জয়মনসিংহ। সাধনের স্ত্রীর নাম মহামায়া, দুই পুত্র অলক, তিলক। বিপিনের স্ত্রীর নাম মালতী, তিন মেয়ে, সুন্দরী, অঞ্জু ও মঞ্জু।

ছোট থাকতেই তারা জেনেছে, এদেশটা তাদের দেশ নয়। সাত পুরুষ বা সাতচল্লিশ পুরুষ বাস করেও তারা এ দেশেরে মানুষ হতে পারলো না। কলমের এক খোঁচায় মাতৃভূমি বিদেশ হয়ে গেল। এদেশের তথা পার্শ্ববর্তী - দেশের মানুষ অলিখিত আইন করেছে, এদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর যত অত্যাচার বা অন্যায় করা হোক, প্রতিবাদ, নালিশ, প্রকাশ করা যাবে না।

এক বেগম সাহেবা বিবেক দংশন সহ্য করতে না পেরে একাধিক বই-এ সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের কথা লেখায় দেশ থেকে তাঁকে বহিস্কার করা হয়েছে। অদ্ভুত ব্যাপার, দেশে বিদেশে কেউ তার প্রতিবাদ করেনি। তাই সাধন ভাবে, পৃথিবী কি মানহুশ শূন্য হয়ে গেল।

অনেক অত্যাচার সহ্য করেও সাধনরা ছিল, কিন্তু যেদিন প্রকাশ্য দিবালোকে বিপিনের সুন্দরী মেয়েকে সংখ্যাগুরুর ছেলেরা তুলে নিয়ে গেল। ওর মা হাতে পায়ে ধরে লাথি খেয়েছিল, লাভ হয়নি। পরদিন জগা পাগলা জঙ্গলে ক্ষত বিক্ষত উলঙ্গ সুন্দরীর দেহ দেখে জানায়। কিন্তু কিভাবে যেন পুলিশ জানতে পেরে জঙ্গলে কবর দিয়ে সবাইকে বলে, এবিষয়ে কোন কথা হলে, কপালে অনেক দুঃখ আছে। তখনই দুই বন্ধু জলের দামে সবকিছু বিক্রি করে বিদেশের দিকে রওনা হয়। কিন্তু ঘাতক ধর্ষকরা আগে থেকে নজর রেখেছিলো, তাই রাস্তায় ধরে সবকিছু কেড়ে নেয়।

দুই বৌয়ের কানের আর নাকের গয়না বিক্রি করে দালালদের সাহায্যে জলেশ্বর গ্রামের এক হাট চালায় আশ্রয় নেয়। পাশেই মহেশ্বরের মন্দির। সেখানে প্রতিদিন দুপুরে কাঙালী ভোজন করানো হয়। সেখানে ভরপেট খিচুড়ি প্রসাদ খেয়ে পরদিন সকালে আশ্রয়ের খোঁজে বের হয়। ঘুরতে ঘুরতে মন্ডুককান্দিতে একটা পুকুরের ধারে বট তলায় বসে বিশ্রাম করছিল।

তখন এক ভদ্রলোক কাজের লোক ও একজন ছেলেকে মাছ ধরতে নিয়ে আসে। ভদ্রলোক বলেন, মাছ গুলো তেমন বড় হয়নি। এখন বিক্রি করলে খুব ক্ষতি হয়ে যাবে। গত বছরে তিনবার মাছ চুরি হয়েছে। পাহারাদার রাখলে ... সে ও হয়তো চোর দের সঙ্গে মিলে মাছ চুরি করবে।

ভগিন বলে, বাবু, দুই পুকুরের মাঝখানে কাউকে বাড়ি করে রাখুন। বিশ্বাস তো করতেও হবে। কিছু ভালো লোকও তো আছে।

সাধন বিপিন কথা গুলো শুনে এগিয়ে আসে। বলে, বাবু, আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলতে চাই, যদি দয়া করে ....

– আমার সঙ্গে তোমাদের কিসের কথা ? আমি তো তোমাদের চিনি না। আচ্ছা বলো - । সাধন বিপিন চোখের জল ফেলে সমস্ত সত্য কথা জানায়। একটু আশ্রয় পেলে তারা রাতে পুকুর পাহারা দেবে, দিনে মজুরের কাজ করবে।

– তা বাপু, আমি তোমাদের চিনিনা, জানি না।

দুজনে বলে, বাবু আমরা খারাপ লোক নই। কোথাও আমাদের থাকার জায়গা নেই। দ্বিজেন বাবু নানা ভাবে তাদের কথা বুঝে নেন। লোক এরা খারাপ নয়। তাই বলেন, শোন, আমি আধা বিঘা জমি দেব। দু পাশে দুটো ঘর তুলে নেবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। টিন আমিই কিনে দেবো। আমার আম, জাম, কাঁঠাল, বাঁশ, সুপারী, নারকেল বাগান আছে। বাঁশ কেটে খুঁটি বেড় করে নেবে। আমার বাড়ী থেকে দুজন কাজের লোক দেবো, তারা কাজে সাহায্য করবে। যে কদিন ঘর উঠবে না, সে কদিন আমার বৈঠক খানায় থাকবে, খাবে। আর একটা কথা, যেদিন কাজ পাবে না, সে সব দিন আমার বাড়ির কাজ করবে, অন্যেরা যা দেয়, আমিও তাই দেব।

– বাবু আপনি মানুষ নন দেবতা।

– আরও একটা কথা আছে, তাতে রাজি না হলে চলে যেতে হবে। শোন, আজকাল দেখি, কিছু বাঙালী বৃহস্পতিবার, শনিবার মাছ মাংস খায় না। সেই সব কিপটে লোক থেকে আমি দূরে থাকি। আমাদের বাড়ি দুপুরে বাড়ীর লোক, কাজের লোক সবাই বারান্দায় এক সাথে বসে খাই। প্রতিদিন মাছ বা মাংস থাকবেই। তাই কেউ যদি অন্য রকম হয়, তার থেকে দূরে থাকি। তোমরা?

– আমরা মাছ মাংস খাই বাবু, তবে দিন দেখে নয়। আর প্রতিদিন তো ....

– ঠিক আছে। এখন জমি লিখে আমি দেবো না। আগে কিছুদিন দেখি, কি বলিস, ভগিন? ভগিন বলে, ঠিক আছে, সেটা তো দেখতেই হবে। হঠাৎ কাউকে আজকাল বিশ্বাস করাও যায় না বিপিন বলে, বাবু আপনার বাড়ি যাওয়ার আগে আমাদের ও দুটো কথা আছে, তা আপনাকে মানতেই হবে। আমাদের ....

– সেকিরে ? সবাইতো আমার কথা মেনে চলে। আমি .... আমি, আচ্ছা বল।

বাদল বলে, এক নম্বর আমরা আপনাকে জেঠাবাবা বলে ডাকবো, আর আপনার ইস্ত্রীকে বড়মা বলে ডাকবো। আর একটা করে প্রনাম করবো। এটুকুই।

দ্বিজেনবাবু খুশি হন। বেশ তো, তাই হবে। এখন আমার গাড়ী নিয়ে চলে যা। সবাইকে

নিয়ে আয়।

পাঁচ দিনের মধ্যে ওদের ঘর উঠে যায়। ঘরের ভেতরে থাকার জন্য বাঁশ দিয়ে মাচা করা হয়েছে। বারান্দায় রান্না ঘর, সেখানে দশকেজি চাল, এক কেজি মুশুর, এক কেজি মুগ ডাল, আলু পেয়াজ, তেল, লবন কিছু বাসনপত্র বালতি কিনে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু সংসার করার অর্থ ওরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে, কত জিনিষ যে দরকার। যেমন, তুচ্ছ ন্যাকড়া ঘর মোছার জন্য সেও খুব দরকার। সুপারী খোল দিয়ে পাখা তৈরী করা হয়েছে, পাতা দিয়ে ঝাড়ু ....। তবে জঙ্গলে লাকড়ির অভাব নেই। দুই বন্ধু প্রতিদিন সকালে উঠে কিছু খেয়ে কাজে যায়। কাজ পেলে মন দিয়ে কাজ করে। বাবুরা খুব খুশী। তারাই অন্য বাড়ীতে কাজ জোগাড় করে দেয়। লেবার বন্ধুদের কাছে শুনেছে, কিছু কিছু টাকা জমিয়ে হাঁস, মুরগী, ছাগল, গোরু কিনতে পারলে অনেক টাকা হবে। যদি এক কেজি দুধ হয়, এক কেজি জল মিশিয়ে বিক্রি করতে হয়। অবশ্য ভাতের মাড় মেশালে দুধ ঘন হবে, বিক্রিতে সুবিধা হবে।

বন্ধুদের পরামর্শ ওদের খুব পছন্দ হয়েছে। তবে দুধে জল মেশানোর মত পাপ কাজ করতে তারা রাজি নয়।

মালতী সুযোগ পেলেই বড়মার কাছে চলে যায়। তার কাজে সাহায্য করে। বড় মা খুব খুশি। একদিন মালতী বড়মার কাছ থেকে পুরনো ধূতি, শাড়ি, জামা চেয়ে নিয়ে আসে। বড়মা ভেবেছিল, ব্যবহার করবে। কিন্তু তিন দিন পর এক সুন্দর কাঁথা তৈরী করে বড়মাকে দেয়।

বড়মা বলেন, একী করেছিস? বাজারের চাদরকে তো হার মানায়। খুব সুন্দর হয়েছে। ঘর থেকে ১০০ টাকা এনে দেয়। খুব পরিশ্রম করেছিস, মিষ্টি কিনে খাবি।

আমি সবাইকে বলে দেবো তোর কাছে যাতে কাঁথা তৈরী করে নেয়। পঞ্চাশ টাকা দিতেও বলবো।

সাধনরা দুজনে ভাগাভাগি করে রাতে পাহারা দেয়। দ্বিজেন বাবু গোপনে দেখেছেন, দ্বিজেন বাবু খুব খুশী।

সাধনরা বেশ কাজ পায়, অর্থাৎ কাজের অভাব তাদের হয় না। তাই দুজনেই কিছু কিছু টাকা জমায়। বিপিন মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা জমায়, সাধন ভাবে ছেলেদের স্কুলে ভর্তি করে দেবে, এদেশে অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, বই খাতা ও বিনা মূল্যে দেওয়া হয়। স্থানীয় স্কুলের ধীরেন স্যার তার পরিচিত। কয়েকবার তার বাড়ীতে কাজ করেছে। তার ছেলেরা এক একজন রত্ন। খুব ভালো লোক।

ধীরেন স্যার সব শুনে হাসেন। বলেন, বাড়ী যা, তোদের পক্ষে ছেলেদের পড়ানো সম্ভব নয়। ভর্তি হতে কত টাকা দিতে হয়, জানিস? ছাত্র প্রতি আঠারশ টাকা। দু-চার টাকা

কম হলে হবে না। বই ফ্রি পাবি, তবে সেগুলো বাক্সে তুলে রাখতে হবে। প্রত্যেক বিষয়ের নোট বই কিনতে হবে। তাতে তোর অষ্টম শ্রেণির জন্য হাজার দুই টাকা লাগবে। তারপর স্কুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক নয় প্রাইভেটে পড়তে যাওয়া বাধ্যতামূলক। সব বিষয়ের জন্য আলাদা শিক্ষক নিলে বেশী, তবে একসঙ্গে কোচিং সেন্টারে মাসিক দুই-আড়াই হাজার টাকাতেই হয়ে যাবে। পারবি তো?

– বাবু, এই কি অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা?

– আরে বাপু, সবাইকে তো রাজার হালে বাঁচতে হবে। বই এর দাম যদি ৫০০ টাকা হয়, এখানকার বই বিক্রেতার লাভ হবে ৩০০ টাকা মাত্র।

– বাবু এত টাকা লাভ নেবে কেন ? সরকার ....

– চুপ -যা । আমাদের সাড়ে তিন হাজার ছাত্র, ভর্তির টাকা আছে, সরস্বতী পূজা ১০০টাকা, ম্যাগাজিন, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, লাইব্রেরী ফি ইত্যাদি ১০০ টাকা করে। অথচ লাইব্রেরী বই কেনা বা দেওয়া হয় না, ম্যাগাজিন কখনো ছাপানো হয়, অন্যান্য ব্যাপারে সাড়েতিন লাখ টাকা করে খরচ হয়? হ্যাঁ, কিছু খরচ হয়। প্রধান শিক্ষকের ঘরের সামনে একজন টুল নিয়ে বসে থাকবে, ভেতরে একজন খাতা পত্র এগিয়ে দিতে থাকবে। একজন চা করতে, একজন দারোয়ান .... বুঝেছ, অবৈতনিক কাকে বলে? তারপর প্রাইভেট পড়া বাধ্যতামূলক, স্কুল শিক্ষকদের ক্লাশে পড়ানো বাধ্যতামূলক নয়। তবে লাভ বেশি।

– বাবু, কাল থেকে আমার ছেলেরা স্কুলে নয়, লেবারের কাজে যাবে। মাথানীচু করে স্কুলকে একটা প্রনাম করে সাধন চলে যায়।

শোনা যায়, আগে চিন দেশে শাসকের চেয়ার স্থায়ী করার জন্য প্রচুর নেশার বস্তু এনে সস্তায় দেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি এদেশে ভিক্ষা চালু করে সরকারী সমস্ত কাজে ছোট থেকে বড় সবার ভাগ পাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

স্থায়িত্ব আনতে চেষ্টা করেছেন। এব্যাপারে কালো, সাদা, হলদে, লাল, নীল সবাই এক। অথচ আমেরিকায় ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে বাবা মার কাছ থেকে কিছু নেওয়াকে অপমানজনক মনে করতেন। এদেশে মহা শিক্ষিত থেকে অল্পশিক্ষিত, পদধিকারী থেকে পদহীন সবাই কিছু ভিক্ষা পেয়ে ধন্য হয়ে উঠেছে। সবার মুখ বন্ধ হয়েছে, সত্য, ধর্ম, আদর্শ লুপ্ত হয়েছে ভিক্ষার ঝুলিতে। আর ভিক্ষার নামও অনেক।

সাধন বাড়ী এসে ঘোষণা করে, কাল থেকে অলক-তিলক আমার সঙ্গে লেবারের কাজে যাবে।

জেঠাবাবা বলেছেন, এদেশের আইন বড় কড়া। তাই রেশন কার্ড, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড থাকা বাধ্যতামূলক। যদি না থাকে, সরকার প্রয়োজনে এদেশ থেকে বের করে দিতে পারে। তবে আইনত দশ বছরেও সে সব পাওয়া যাবে না, নানা কারণে আটকে যাবে। আর

টাকা দিলে এক সপ্তাহের মধ্যে হয়ে যাবে। চাল গম সস্তায় পাওয়া যাবে। তাই টাকা দিয়ে জব কার্ড হয়ে যায়। স্থায়ী বাসিন্দার স্বীকৃতি পায়। জেঠা বাবার কাছ থেকে দুই হাজার টাকা হাওলাত করতে হয়েছে, নিজেদের কিছু জমেছিল, তাতেই ঝামেলা মিটেছে।

তবে একটা জিনিষ দেখা যায়, রেশনে পাঁচ কেজি চাল পেলে সেটা অন্যত্র ওজন করলে চার কেজি হয় এবং সেটাই নাকি প্রথা। তা হোক, যে দেশের যে নিয়ম, তা তো মানতেই হবে?

মালতীর কাঁথা তৈরী করে কিছু টাকা হাতে এসেছে, তাই দিয়ে সেদিন নিজেই বাজার থেকে প্লাস্টিকের দুটো চেয়ার, কাপ প্লেট, বটি কিনে যা ছিল, তা দিয়ে জিলিপি কিনে আনে। মেয়েরা আরাম করে জিলিপি খায়।

সাধন-বিপিন ও সেদিন মনের আনন্দে সমস্ত টাকা দিয়ে মাংস, আলু, পেঁয়াজ কিনে আনে। খাসির তেল ও এনেছে। খাসির তেলের বড়া তাদের বড় প্রিয়। কতদিন বড়া খাওয়া হয়নি। কিন্তু বিপিন বাড়ী এসে চমকে ওঠে। অঞ্জু পেটের যন্ত্রনায় চিৎকার করছে।

বিপিনকে দেখে মালতী হাউ হাউ করে কেঁদে বলে, আমার মেয়েকে বাঁচাও। ডাক্তার ডেকে আনো।

বিপিন বলে, আমার কাছে তো একটা টাকাও নেই। সব টাকা খরচ করে এসেছি। মালতী জানায়, সেও বাজারে গিয়ে সব টাকা খরচ করে এসেছে। এমন হবে, বুঝতে পারেনি।

বিপিন জেঠাবাবার কাছে টাকা হাওলাত করতে যেতে চাইলে মঞ্জু জানায় তারা কেউ বাড়ী নেই। মেয়ের বাড়ী গিয়েছে। নাতির জন্ম দিন।

নিরুপায় বিপিন বাজারে যায়। সেখানে রঞ্জন মজুমদারের বাড়ীতে কাজ করছে। তারা তার কাজের খুব প্রশংসা করেছে। বাকীতে কি ২/৪টা বড়ি দেবেনা। নিশ্চয় দেবে। কিন্তু না, ওষুধ তো দিলেনই না, বরং ছোট লোকেরা বাকীর নাম করে টাকা দেয় না বলে গালি দিলেন। তবে দোকানের কর্মচারি স্বপন চক্রবর্তী কেন যেন কথা গুলো খুব মন দিয়ে শুনছিল।

মালতি বুদ্ধি করে তুলসী পাতার রস করে খাইয়েছিল, তাতে উপকার হয়নি। বিপিন ভাবে, সুন্দরী চলে গেছে, এবার কি অঞ্জু ও চলে যাবে? ঘরে কুপির আলো, বাইরে অন্ধকার।

হঠাৎ অন্ধকারে কার কণ্ঠস্বর শোনা যায় - বিপিন! বিপিন আছো? দ্বিজেনবাবুর কাজের লোক তো এই বাড়িই দেখালো। এটাই বিপিনের বাড়ি। বিপিন বলে, কে কে? কে ডাকছেন?

– তোমার মেয়ে কোথায়? আমি শান্তিরাম সেন? চলো, তোমার মেয়েকে দেখি।

বিপিন দেখে একজন বয়স্ক লোক, হাতে ছোট একটা কাঠের বাক্স। চেহারা দেখে ডাক্তার বলে মনে হয় না। শান্তিবাবু তখন ঘরে ঢুকে রোগীর সব কথা শুনে ওষুধ বের করে বলেন, একটু গরম জল আনো।

মালতী ভেতরে ভেতরে রেগে আগুন। কোথাকার কোন বদ্যি না ওঝা ....। এখনই

টাকা চেয়ে গোলমাল শুরু করবে। অথচ এর টোটকায় রোগ সারা অসম্ভব। তবু গরম জল এনে দেয়। তাতে ওষুধ মিশিয়ে শান্তিবাবু নিজেই খাইয়ে দেন। ওষুধ খাওয়ার পর চিৎকার আরও বেড়ে যায়।

শান্তিবাবু বলেন, ওষুধ কাজ হচ্ছে । ভয় নেই, আস্তে আস্তে কমে যাবে। একটু বসতে পেলে ভালো হয়। আমাকে কেমন থাকে দেখে যেতে হবে। ব্যথা কমলেই ঘুমিয়ে পড়বে। অন্ততঃ ৪/৫ ঘন্টার আগে ঘুম ভাঙবে না। পরে অল্প গরম পাতলা দুধ খাওয়াতে হবে। আজ আর ভাত খাবে না।

মালতী নূতন কেনা চেয়ারটা এনে ধপ করে রাখে। শান্তিবাবু বলেন, আমাকে আবার বেলতলী যেতে হবে। সাইকেল চালাতে পারি না। তাই হেঁটেই যাবো। তা একটু চা হলে ভালো হয়।

মালতী রেগে গিয়ে চা এনে দেয়। আবার ওই নূতন কাপ প্লেটে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিতে হয়েছে। শান্তিবাবু আরাম করে চা খান । আর বলেন, বাকীতে ওষুধ আনতে গিয়েছিলে, ২/৩ টা ট্যাবলেট, তাও দেয়নি। যাক, ঘুমিয়ে পড়েছে। আর ভয় নেই মা। কাল সকালে এসে আমি আবার দেখে যাব। এই একশ' টাকা রেখে দাও, কাল সকালে রোগীকে একটু ভাত রান্না করে দিও। আজ শুধু দুধ ....

অন্ধকারে বুড়ো মানুষটা বেলতলী চললেন। ওখানেও হয়তো ... । বিপিন আর মালতী দুজন শান্তিবাবু যেখানে পা রেখে বসেছিলেন, সেখানে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রনাম করে। এদেশে নেতা মন্ত্রীরা কোটি কোটি টাকার হাসপাতাল বানায়, ডাক্তার থাকে না, নেতা মন্ত্রীরা পত্রিকা টিভিতে নিজেদের ছবি ছাপাতেও কোটি কোটি টাকা খরচ করেন, অথচ অর্থাভাবে মৃতদেহ দাহ করতে না পেরে নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে নিন্দিত হতে হয় অসহায় মানুষকে।

পরদিন সকালে শান্তিবাবু এসে দেখে বলেন, আর ওষুধ খেতে হবে না। মালতি জোর করে ভালো চা বিস্কুট খাইয়ে দেয়। অঞ্জু তখন ঘরের কাজে ব্যস্ত।

সাধন কিছুদিন থেকে জ্বর ও কাশিতে কষ্ট পাচ্ছে। কাজে যেতে পারে না। ছেলেরাই কাজ করে বাজার করে আনে। মাঝে একদিন সাধন নিজে সুপার ডুপার পীরপাড়া হাসপাতালে গিয়েছিল। ডাক্তার স্যার জ্বর শুনেই প্রেসক্রিপশন লেখা শেষ করে অন্য রোগী ডাকেন, তাতে কোন কাজ হয়নি। ডাক্তারবাবুদের ওষুধের দোকান আছে তো! ব্যস্ত মানুষ।

বিপিন শান্তিবাবুকে ডেকে আনে। শান্তিবাবু বুঝেন, টিবি হয়েছে। অবস্থা মোটেই ভালো না। তাই শান্তিবাবু দ্বিজেন বাবুর ট্যাক্সী করে কুটবিহারে নিয়ে যায়। জেলা শহরের যক্ষ্মা হাসপাতালের ডাক্তারবাবু শান্তিবাবুর খুব পরিচিত। তিনি দেখেশুনে শান্তিবাবুকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলেন, দু-তিন দিনের মধ্যে মারা যাবে। কিছু করার নেই। আমি ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি। শেষ সময়টায় সবার সঙ্গে আনন্দে রাখুন।

শান্তিবাবু সাধনকে বাড়ী ফিরিয়ে আনে। কিন্তু কাউকে কিছু জানাতে চায় না। কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত রাজ্যে একটা ভয়াবহ খবর ছড়িয়ে পড়ে। আগামী কাল রাত ৯টা ৪৩মি. 'পুতনা' ঝড় আসছে। ঝড়ের গতি হবে ঘন্টায় ১৭০ কিমি।

চারদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। হাজার হাজার স্বেচ্ছা সেবক, পুলিশ, সৈন্য মিলে বস্তীর লোকদের স্কুল কলেজে নিয়ে তোলা হয়। কিন্তু শহর বা কসবা অঞ্চলের আশে পাশের লোক এসব সুযোগ পেয়ে থাকেন। কিন্তু হতভাগা, যাদের খড়ের ঘর, বাঁশের খুঁটি, বেড়া হেঁড়া কাপড়, বা পাতার তৈরী অজগাঁতে থাকেন। তাদের কথা কেউ ভাবে না।

আগে একজন মহাপন্ডিত বিজ্ঞানী দায়িত্বে ছিলেন তিনি ঘোষণা করলেন, ঝড় আসছে ১৭৫ কিমি গতিতে। সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করলেন। কিন্তু যথা সময়ে নাকি মহাঝড় আসতে আসতে হঠাৎ দিক পালটে সমুদ্রে ঢুকে গেছে। এখন তা হয় না। ঠিক সময়ে 'পুতনা' যেন সর্ব শক্তি নিয়োগ করে এলেন, ধংসের দামামা বাজিয়ে চলে গেলেন।

হতভাগাদের বাড়ী ঘর ভেঙ্গে, সর্বস্ব ভাসিয়ে নিয়ে গেল। চারদিকে হাহাকার, হাঁস, মুরগী, ছাগল, গোরু ..... যা, গরীবের অবলম্বন, শেষ হয়ে গেল। সাধন, বিপিনের ঘর উড়ে গেছে, তবে মাথায় বাঁশ পড়ে সাধনের মাথা দু-ভাগ হয়ে গেছে। রাত ১টায় সব শান্ত হলে দ্বিজেন বাবু আসেন। বিপিনেরা বাকী রাত মৃতদেহ নিয়ে কাটায়।

পরদিন দলে দলে মানুষ ধংসলীলা দেখতে আসে। অনেকে পুরনো জামা কাপড় চিড়া মুড়ি, চাল ডাল, তেল লবন এনে বিপন্ন মানুষের হাতে তুলে দেন। কিন্তু সাধনের পরিবারের দিকে সবার নজর, সবাই তাদের সাহায্য করে। এক সঙ্গে থাকার জন্য বিপিনের পরিবারের দিকে কারো নজর পড়ে না জেলাতে মোট সতের জনের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু কলাকাটা ব্লকে মাত্র একজন, সে সাধন দত্ত মারা গেছে।

পুলিশ সকালেই এসে সাধনের মৃত দেহ নিয়ে চলে যায়, পোষ্ট মর্টেম হবে। দুই পরিবার আবার দ্বিজেন বাবুর বৈঠক খানায় আশ্রয় নেয়। তৃতীয় দিনে তিনটে ট্যাক্সীতে করে বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ক্ষিতীশ চন্দ্র রায়, আরও কয়েকজন পদাধিকারী এসে জানায় সাধনের পরিবারকে রাজ্য সরকার পাঁচ লাখ টাকা এবং World Benifecial Fund থেকে পাঁচ লাখ টাকা দিয়েছেন।

ইঞ্জীনীয়ার সুভাষ দে সরকার, কন্ট্রাক্টার দিলীপ লাখোটিয়া, স্থানীয় পঞ্চায়েত পূর্ণেন্দু বাগচী হিসাবপত্র করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেন। বিডিও অফিসের দুজন মহামায়া ও অলককে নিয়ে ব্যাঙ্কে পাশ বই করতে যায়। চেক দুটো আজই জমা দেবে। প্রয়োজনে দুদিন পর ইচ্ছামত টাকা তুলতে ও খরচ করতে পারবে।

বিপিন ভাবে, ভগবান আমাকে যদি তুলে নিতো তাহলে আমার পরিবার সুখে থাকতে পারতো। পাকা ঘরে থাকতে পারতো।

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ছয় কক্ষ বিশিষ্ট পাকা ঘরের কাজ শেষ হয়। কিন্তু 'গুরুদশা' থাকায় গৃহ প্রবেশের অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। তাই দ্বিজেন বাবুর বাড়ীতে থাকতে হলো। বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে বিনামূল্যে বিদ্যুতের যাবতীয় কাজ করে দেয়।

মহামায়ার ইচ্ছায় শ্রাদ্ধের কাজে কোন ত্রুটি রাখা হলনা। সাধনের এখানে কোন আত্মীয় স্বজন ছিলনা। তাই বি.ডি.ও. ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, শ্মশান বন্ধু ব্রাহ্মণ, দ্বিজেনবাবু সপরিবারের লোক শ্রাদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। পুরোহিত সুবীর চক্রবর্তী, গোপাল চক্রবর্তী, স্বপন চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি একুশজন ব্রাহ্মণ ভোজন করানো হয় স্থানীয় কীর্তনের চারটি দল সকাল থেকে কীর্তন গানে মাতিয়ে রাখে। সবাইকে একই খাবার যেমন লুচি, দুই রকমের ডাল, আলু পটলের তরকারী, দুই রকমের মিষ্টি, দই ইত্যাদি দেওয়া হয়।

তারপর গৃহ প্রবেশের অনুষ্ঠান খুব সাধারণ ভাবে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শ্রাদ্ধের কাজে দ্বিজেন বাবু, ক্ষিতীশ বাবু ব্যক্তিগত ভাবে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তাছাড়া উদীয়মান সংঘ এবং শান্তিবাবুর সাঁই সমিতিও উদার হাতে খরচ করেছেন। মহামায়ার পাশবই থেকে শুধু ব্রাহ্মণদের খরচটা তুলে নেওয়া হয়েছে।

গৃহ প্রবেশের আগের দিন অলক বিপিন কাকাকে বলে, কাকা মাথার উপর তুমি আছো। আমাদের দেখা শোনা তো তোমাকেই করতে হবে। আমরা সবাই এক সাথে থাকবো, খাওয়া একখানে হবে। আমাদের দূরে সরিয়ে দিও না।

– এসব তুই কী বলছিস? নানা ঝামেলায় আমাদের ঘর তুলতে দেরী হয়েছে। তবে কাল পরশুর মধ্যে হয়ে যাবে। জেঠা বাবা টিনের অর্ডার দিয়ে রেখেছেন। আমি তো আছি, বিপদে আপদে তোদের পাশে থাকবো।

– শুনছি, সাত পুরুষ তোমরা আর আমরা আত্মীয়ের মত থেকে একে অপরের দুঃখ ভাগ করে নিয়েছি। আজ দুঃখের দিনে দূরে সরে থাকবে কাকা। স্বর্গ থেকে বাবা খুশী হবে?

বিপিন অলককে জড়িয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে।

খুব সাধারণ ভাবে গৃহ প্রবেশের কাজ শেষ করা হয়। বিপিণরা দুটো কোঠায় আর অলোকরা দুটো কোঠায় থাকে। একটা রান্নাঘর করা হয়েছে। ঘরে তখনও সাহায্যের চাল ডাল প্রচুর আছে। বিপিন সেবারের কাজ করে তেল, লবন, শাক সবজি কিনে আনে। আগে কিছু কিছু জমানো যেত, এখন আর তা হয় না। অলকেরা যা পায় মাকে এনে দেয়। মা জমিয়ে রাখে। অঞ্জু-মঞ্জু রান্নার দায়িত্ব নিয়েছে।

আরও কিছু দিন পর দেখা গেল, মহামায়া মাঝে মাঝে কোথায় যেন যায়, দেরী করে বাড়ী ফিরে আসে। কাউকে কিছু বলেনা, এমনিতে মহামায়া স্বল্প ভাষী। এখন আরও কম কথা বলে।

বিপিন মালতী দুজনে ভাবে, এভাবে থাকাটা মনে হয়, মহামায়ার পছন্দ নয়। থাকার

ব্যাপারে মহামায়া একটা কথাও বলেনি। কিন্তু কি ভাবে ছেড়ে যাবে, সেটাও ভেবে পায় না। সেদিন ছিল রবিবার। সকাল ৮টার মধ্যে ক্ষিতীশ রায়, নিবেদিতা চৌধুরী, পঞ্চায়েত, তাপস সরকার, সম্পাদক, উদীয়মান সংঘ, সুবীর চক্রবর্তী, পুরোহিত, দ্বিজেনবাবু, সাঁই সমিতির নূপুর মাদক ইত্যাদি হাজির হন।

বিপিন মালতী লজ্জায় মাথা লুকাতে চায়, অঞ্জু-মঞ্জুও ভাবে পাকা ঘরে থাকার দিন শেষ, সবচেয়ে লজ্জার ব্যাপার বাবামার অপমান হবে, ভেবে চোখের জল আটকে রাখতে পারছে না, মেয়ে দুটো।

মহামায়া সবাইকে নমস্কার করে বলে, আমার মতো তুচ্ছ একজনের ডাকে আপনারা সবাই এসেছেন, সেইজন্য আমি ধন্য। বড়রা আমার প্রনাম নেবেন, অন্য সবাইকে শ্রদ্ধা জানাই। আমি জানি, মানি, আপনারাই আমার একান্ত আপনজন। বিপদে দুঃখের দিনে আপনাদের কাছে পাবোই। আপনারা আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন -

অঞ্জু-মঞ্জু সবাইকে চা বিস্কুট দেয়। দ্বিজেনবাবু বলেন, তোমার সমস্যাটা কি বলো, আমার উপর যে তোমার কোন ভরসা নেই, সে আমি বুঝেছি। তবু ও –

– জেঠা-বাবা! আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। যখন অকুল পাথারে ভেসে হাটের চালা ঘরে সারা রাত কেঁদে ভগবানকে ডেকেছি। ভগবান সাড়া দেয়নি। আপনি ভগবান হয়ে আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, মুখে খাবার তুলে স্থায়ী ভাবে থাকার ব্যবস্থা করেছেন। সেই আপনাকে অসম্মান ...

ক্ষিতীশবাবু বলেন, বেশতো, সমস্যাটা বলো ....

– আপনারা জানেন, আমার স্বামীর বন্ধু সপরিবারে আমাদের সাথে থাকেন। কিন্তু তারা তো আমাদের আত্মীয় নন, তাই এভাবে থাকাটা আমি মেনে নিতে পারছিনে। আমি আশা করছিলাম, ওরা কিছু বলবে, তা বললো না।

দ্বিজেন বাবু চমকে উঠে বলেন, মহামায়া তুমি আজ এসব কি বলছো? বিপিন আমাকে বলেছিল, আমি মত দিয়েছিলাম অলক নিজেই বলেছে, তাছাড়া দুঃখের দিনে একসঙ্গে থাকলে দুঃখটা কিছু কমবে, ভেবেই ...... বিপিন মাথা নীচু করে থাকে।

দ্বিজেনবাবু বলেন, বিপিন, এখনই তোর যা কিছু আছে নিয়ে আমার বাড়ী চলে যা। কালকের মধ্যে তোর ঘর উঠে যাবে।

মহামায়া বলে, জেঠাবাবা, আমার কথা এখনো শেষ হয়নি।

– শেষ বলেই তো মনে হচ্ছে। আমারই ভুল, তোমাকে বুঝতে পারিনি।

মহামায়া বলে, আমার মনে হয়েছে, এভাবে থাকা উচিত নয়। এদেশের রীতিনীতি আমি জানি না। তবে জেঠা বাবার কথার বিরুদ্ধে ....

সবাই স্তব্ধ। কি হচ্ছে, কেউ বুঝতে পারছে না।

মহামায়া বলে, তাই আমি ভেবেছি, অঞ্জু-মঞ্জুকে আমার ছেলেদের বৌ করে নেবো। আমার স্বামীরও এটাই ইচ্ছা ছিল, তাই নিজেদের ছেলেদের চেয়ে অঞ্জু-মঞ্জুকে ভালো বাসতেন। বিয়ের পর বিপিণ দাদা মেয়ে জামাইদের নিয়ে সংসার করুক। মালতী আর আমি কাঁথা শিল্পের দোকান দেবো। আমি হবো ম্যানেজার, মালতী ডিরেক্টার, বড়মা উপদেষ্টা। এখন আপনাদের মতটা.........

দ্বিজেন বাবু দাঁড়িয়ে পড়েন। বলেন, ওরে পাজি মেয়ে! বুড়ো বয়সে তুই এভাবে আমাকে জব্দ করলি? আর জব্দ হয়েও যে এত আনন্দ পাওয়া যায়, জানা ছিল না।

কাঁদতে কাঁদতে বিপিন বলে, মহামায়া, এতদিন তোমাকে ছোট বোনের মতো দেখে এসেছি। বয়সে তুমি আমার চেয়ে ছোট। নাহলে আজ একটা প্রনাম করে তোমাকে ভুল বোঝার প্রায়শ্চিত্ত করতাম।

ক্ষিতীশবাবু বলেন, কিন্তু গুরু দশায় তো বিয়ে হবে না। সুবীর চক্রবর্তী বলেন, মহামায়া আমাকে আগেই বলেছিল। তাই পুরোহিত দর্পন ঘেটে দেখেছি, ব্যবস্থা একটা হবেই।

দ্বিজেনবাবু বলেন, ঠিক আছে, বিয়ে হবেই। আমি বাপু কন্যাপক্ষ। বিয়ে আমার বাড়িতে হবে। বর পক্ষের কোন দাবি থাকলে বলা হোক, সাধ্য হলে ব্যবস্থা করবো।

উদীয়মান সংঘের ছেলেরা বলে, আমরা বর পক্ষ, বিয়েতে খাওয়া দাওয়া ভালো না হলে এমন হৈচৈ বাঁধাব। যেমন আসামাত্র শরবৎ .... মানে বার বার সরবৎ

দ্বিজেন বাবুর সঙ্গে সবসময় মহাদেব নামে একজন লোক থাকে, তাকে বলেন, মহাদেব, একবস্তা চিনি আনবি আর আমার কুয়াতে ঐ চিনি ঢেলে দিয়ে সরবৎ করে রাখবি .... দেখি, কে কত সরবৎ খায়। সবাই হেসে উঠে।

মহামায়া বলেন, আর একটা কথা আছে। আপনাদের মতামত চাই। সেটাও আমার স্বামীর পাগলামি। আপনারা জানেন, ওরা হরিহর আত্মা ছিলেন। ভবতোষ মজুমদারের স্ত্রী নামকরা উকিল। আমি তার সঙ্গে কথা বলেছি। অর্থাৎ এফিডেবিট করে আমাদের পদবী হবে দত্তগুপ্ত।

শান্তিবাবু কোথায় যেন রোগী দেখে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে সব শুনে বলেন, সাধন দত্ত আর বিপিন গুপ্ত - হয়ে গেল দত্তগুপ্ত। সত্যি মহামায়া, লেখাপড়ার সুযোগ পেলে তুমি বাজিমাৎ করতে। তখনই দ্বিজেন বাবুর স্ত্রী, অঞ্জু-মঞ্জু মিষ্টির প্লেট নিয়ে হাজির। সমস্ত ব্যাপারটা মহামায়া শুধু তার সঙ্গেই আলোচনা করেছিলেন।

তারপর হৈ হৈ করে, বিয়ের তারিখ, কিভাবে কি হবে ...... কি কি খাওয়া হবে, টাকার ব্যবস্থা কিভাবে হবে - ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা আর, পাড়ার কজন বৌ এসেছিলেন, তারা শঙ্খ ও উলু ধ্বণিতে মুখর করে তুলল দত্তগুপ্ত বাড়ী।

*****

বাৎসল্য

গোকুল সরকার

ওকড়াবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ধর্ম নারায়নের কুঠি। কৃষি প্রধান গ্রামে অবস্থাশালীদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। বাকী সব খেটে খাওয়া দিন মজুর, মাঝি, বেদে, কুমার সম্প্রদায়ের বসবাস। ধান, পাট, তামাক এখানকার প্রধান অর্থকরী ফসল। এই গ্রামে খট্টু বর্মনদের কয়েক পুরুষের বাস। জমি জিরেত যা ছিল বাপ বেঁচে থাকতেই শেষ করে গেছে। গত সন ছেলের বিয়ে দিতে বাড়ী চালার অর্ধেকটা বেঁচে দিল। এমনই কপাল দিল্লীতে কাজ করতে গিয়ে ছেলেটাও নিরুদ্দেশ হলো। তিন মাস পর খবর এলো মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। ছয় মাসের পোয়াতি বৌ বিধবা হলো। শোকে দুঃখে হার কঙ্কালসার শরীর নিয়ে খট্টু, হাঁটু ভাজ করে দাওয়ায় বসে চিন্তা করে কুল কিনারা পায় না। একাই বসে বসে ভাবে। দিন হাজিরা খাটার সাহস হয় না। সংসারটার কি গতি হবে? মাথার উপর সদ্য বিধবা পোয়াতি বৌ। বাপের বাড়ীতে যে পাঠাবে তার জো নেই। নামেই বাপের বাড়ী। বাপ, মা অনেকদিন আগেই গত হয়েছে। ভাইদের সংসারে কে কাকে দেখে। তাদেরও তো হাজিরা খাটা সংসার। এসময় বৌটাকে ভাল খাবার দেওয়া দরকার। নইলে পেটের বাচ্চাটাও দুর্বল হয়ে পড়বে।

ঘর থেকে বের হয়ে ধীর পায় দাওয়ায় এসে শ্বশুরের পাশে দাঁড়ায় মালতী। খট্টু মালতীকে দেখেই নড়ে চড়ে বসল। কিছু বলতে চাও বৌমা?

হ্যাঁ, বলছি আজকে কাজে যাবেন না?

যাব, তুমি তার জন্য চিন্তা করোনা বৌমা।

আমি ঠিক সময়ে কাজে যাব। তুমি চঞ্চল হইও না।

ধীরে সুস্থে থাক কয়েকটা মাস। অত সব চিন্তা করে কী হবে? যার কেউ নাই তার উপরওয়ালা আছে। এভাবে শ্বশুর ছেলের বৌ-এর দিন কেটে যাচ্ছে।

সময় মত মালতী হাসপাতালে একটি ছেলে সন্তান প্রসব করল। হাসপাতালের আয়া এসে হাঁক দিল খট্টু বর্মন কে আছেন?

খুট্টু উদগ্রীব হয়ে এগিয়ে বলল, আমি..... আমি.....

খট্টু আয়ার পিছনে পিছনে মালতীর বেডের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

আয়া বলল মালতী বর্মনের ছেলে হয়েছে। দেখতে চাইলে ভিতর আসুন।

আয়া মালতি আর তার ছেলের নবজাতককে দেখাল। খট্টু নাতীকে দেখে মালতীর দিকে ফিরে তাকাল। তখনও মালতীর জ্ঞান ফেরেনি।

বাড়ীতে ফিরে খট্টু পাড়ার সবাইকে ডেকে বলতে লাগল - আমার নাতী হয়েছে গো।

বৌমার ছেলে হয়েছে।

সাত দিন পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ীতে ঢুকল মালতী।

এদিকে খট্টু খুশীও হচ্ছে আবার দুঃচিন্তাও করছে। বাচ্চার খাওয়ার যোগাড় হবে কিভাবে? বেশ কিছু দিন যাবার পর মালতিই প্রস্তাব দিল। - "বাবা কারও বাড়ীতে ঠিকা কাজ যোগাড় করেন। আমি কাজ করবো। আমার বাচ্চাটাকে যে করেই হোক বড় করতে হবে। ওর বাঁচার ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে। লজ্জা করে লাভ নাই। কাজ করে খেতে আবার লজ্জা কিসের?" কথা মত খট্টু কয়েক দিনের মধ্যেই কাজ যোগাড় করে ফেলল। গ্রামের একটু দুরে শহরে চাকরী করে নিমাই সরকার। সংসারও খুব বড় নয়। এক ছেলে এক মেয়ে আর বৃদ্ধ মা। মোট চার জনের সংসার। নিমাই সরকার সকালে খেয়ে চাকরীতে যায় আর রাতে ফেরে। অল্প কিছুদিন হলো স্ত্রী মারা গেছে। রান্নার কাজের জন্য একজন লোক দরকার।

মালতী সব শুনে কাজ করতে রাজী হয়ে গেল। নিমাই সরকার বলে দিল একশো টাকা বেতন পাবে আর দু'বেলা খাবার। দুপুরে দুই ঘান্টা ছাড় পাবে। দুঃচিন্তা কিছুটা কমলো মালতীর। ও বাড়ীর খাবার দাবারও ভালই। কিছুদিনের মধ্যেই মালতীর চেহারা ফিরতে লাগল। অল্প বয়সে সদ্য বিধবা। গায়ের লোকে ভাল চোখে দেখছে না। মালতী নিজের মনে কাজ করে বাড়ীর সবার সাথে মিশে যেতে পেরেছে। কোন কোন সময় নিজের ছেলেটিকে নিয়ে আসে। এ বাড়ীর কেউ আপত্তি করে না। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই মালতীর শরীরের দিকে নজর পড়ল নিমাই বাবুর। মাঝে মাঝেই অফিস কামাই করে বাড়ীতে থাকেন নিমাইবাবু। ছেলে মেয়ে স্কুলে যায়। মালতী একা বাড়ীতে। সেই সুযোগ নেবার ফন্ধি আটে। মালতী কোন সুযোগ দেয়না। বুঝতে পারে মালিকের নজর পড়েছে। অভাবী হলে কী হবে স্বভাব চরিত্র নষ্ট করতে নারাজ মালতী, প্রয়োজনে কাজ ছাড়তেও রাজী। যতদিন যায় নিমাইবাবু ধীরে চলাই শ্রেয় মনে করে। মালতী সব ব্যাপারটা বুঝে গিয়েও কিছুই করতে পারে না। কাউকে কিছু বলতেও পারে না। নিজের প্রতি ঘেন্না ধরে যায় মালতীর। কাজ না করলে ভাত জুটবে না। কাজ করতে হলে ইজ্জৎ দিতে হবে। কোন পথে যাবে ভেবে পায় না। এ বাড়ীর কাজটা ছেড়ে অন্য বাড়ীতে নেবে ভাবে, কিন্তু জোটে না।

সে দিন মালতী বাচ্চাটাকে নিয়েই কাজে এসেছে। রান্নার কাজ শেষে নিমাইবাবু খেয়ে অফিসে রওনা হয়ে গেল। ছেলে মেয়েরা স্কুলে চলে যাবার পর, নিজের বাচ্চাকে স্নান করিয়ে দুধ খাইয়ে ঘুম পারিয়ে দিয়ে বাইরের কাজে ব্যস্ত রয়েছে। এদিকে অফিসে না নিয়ে নিমাইবাবু ভর দুপুরে বাড়ীতে ঢুকেছে। সব কিছু দেখে ভাবে বাড়ীতে কেউ নেই। ফাঁকা বাড়ীতে মালতী একাই রয়েছে। নিমাই সরকারের যৌন কামনা হিংস্রতায় পরিনত হয়েছে। যে ঘরে মালতীর বাচ্চা রয়েছে সে ঘরে ঢুকে বাচ্চাটাকে হাত নাড়া চাড়া দিতেই বাচ্চাটা কেদে উঠেছে। বাচ্চার কান্নার আওয়াজ কানে যেতেই দৌড়ে এসে মালতী ঘরে ঢোকে। সাথে সাথে নিমাইবাবু

দরজা বন্ধ করে দেয়। মালতী শয়তানীটা বুঝতে পেরে অনেক অনুরোধ করে ইজ্জত বাঁচানোর জন্য। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না।

মালতী কান্নকাটি করলো। এই জীবন বাঁচিয়ে রেখে লাভ নেই। অমানুষদের ভোগের বস্তু হিসাবে বেঁচে থাকতে চায়না মালতী। মনকে কঠিন করে সিদ্ধান্ত নেয় এ বাড়ীতেই ফাঁসী দিয়ে মরবে ও। রাগে, ঘেন্নায় ফুসতে ফুসতে মালতী দড়ি হাতে সোজা গোয়াল ঘরে ঢুকে পড়ে। অন্য কিছু দেখা বা ভাবার অবকাশ নেই মালতীর। ঢুকেই গোয়াল ঘরের বাটানে দড়ি ছুড়ে দিতেই কি যেন শব্দ হল হঠাৎ। মালতী দেখে পাশেই ছোট্ট একটা কাঠের বাক্সে কবুতরের খোপ করা রয়েছে। একটা কবুতর ভিতরে উড়তে গিয়েও উড়তে পারছে না। এ অবস্থা দেখে মালতী ভাবতে শুরু করল কবুতরটা উড়ে যাচ্ছে না কেন?

মালতী হাত নাড়িয়ে দুরের থেকে চেষ্টা করে। কিন্তু কবুতরটি খোপ থেকে কিছুতেই বেড়িয়ে আসতে চায় না। উড়তে গিয়ে আবার বসে পড়ে। বার কয়েক এরকম চলার পর মালতী একটু কাছে গিয়ে জোড়ে হাত নাড়িয়ে মুখে হিস্‌স্‌ শব্দ করতেই ভয়ে কবুতরটি পাখনা মেলে উড়ে গেল। যাবার সময় পায়ে লেগে একটি ডিম খোপের থেকে মাটিতে পরে গেল। ডিমটি মাটিতে পরে যেতেই ফেটে গিয়ে ওর থেকে একটি বাচ্চা বের হল। এই দৃশ্য দেখে মালতী হতবাক হয়। এ আমি কি করলাম? আত্‌কে উঠে সেই কবুতরের বাচ্চাটি আলতো করে খোপে রেখেই দে ছুট। নিজের বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সোজা নিজের বাড়ীতে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে মালতী।

*****
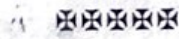
বোধদয়

জাকির হুচেইন

এখন ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকদের রমজান মাস চলছে। প্রায় শেষের দিকে। ঈদুল ফিতরের উৎসবের সপ্তাহ খানেক আগে থেকে বাজারে উৎসবের জন্যে কেনা কাটি চলছে। বাজারে প্রচণ্ড ভীর ভাট্টা এই ছোটো শহরটাতে। বাজারের রাস্তায় হাটা চলা দুষ্কর হয়ে চলছে। অথচ চারি দিকে মহামারী করোনার তাণ্ডব বেড়েই যাচ্ছে। হাজার হাজর লোক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চলছে। এবং রোজ রোজ আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে। শত শত লোক মৃত্যু মুখে পরছে। কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকার প্রতিদিন করোনা ভাইরাস রুখতে দিবা রাত্রি প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। মাইকে, রেডিও, টেলিভিসন, খবরের কাগজ, বেনার-ফেস্টুন জোর কদমে প্রচার চালাচ্ছে করোনা ভাইরাস থেকে কিভাবে সুরক্ষিত থাকা যায়। মাস্ক পরিধান, সেনিটাইজেসন, সামাজিক দুরত্ব মেনে চলা এবং জন সমাবেশ না করা। কয়েক মাস থেকে এরকম ব্যবস্থা চলছে। আজ লকডাউনের সময় কিছু সিথিল করছে রাজ্য সরকার। তাই বাজারে ভীড়। আমি দুই কিঃমিঃ রাস্তা পায়ে হেটে এ.টি.এম. থেকে কিছু টাকা তুলতে বের হলাম। কয়েকটি এ.টি.এম ঘুরলাম। এ.টি.এমে. টাকা নেই। কিছুদুর ঘুরে অবশেষে একটি এ.টি.এমের সামনে লোকের লাইন দেখে আমি লাইনে দাড়ালাম। এখানেও সামাজিক দুরত্ব নেই। অনেক লোকের মুখে মাস্ক নেই। এ.টি.এম-এর সামনে সেনিটাইজারের ব্যবস্থা নেই। দেখলাম মেয়েদেরও একটা লাইন। দশ বারোজন মহিলা লাইনে দাড়িয়ে অবস্থান করছেন। কারো কারো সঙ্গে বাচ্চা ছেলে-মেয়েও আছে। তেনাদের কয়েক জনের মুখে মাক্স, আছে। কিন্তু বেশিভাগ মহিলার মুখে মাক্স নেই, বাচ্চাদের মুখেও মাক্স নেই। তাই দেখে আমি সামনে দাড়ানো এক ভদ্র লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'দাদা আপনি মাক্স পরিধান করেননি? মাস্ক নেই আপনার সঙ্গে?' আমার কথা শুনে ভদ্রলোক বলেন, পকেটে রেখেছি। মাস্ক পরলে আমার দম বন্ধ হয়ে যায়। তাই মাক্স পরিনি। এরপর আমি আর একজন ভদ্রলোককে বললাম, "দাদা আপনি মাক্স পরেননি। করোনা ভাইরাসের ভয় ডর নেই দেখছি। সরকার এত প্রচার চালাচ্ছে।" ঐ ভদ্রলোক আমার কথা শুনে আবার বলেন, "দূর মশাই, সরকারের শুধু ঢাক ঢোল পিটানো।" কথা শুনে আমার চক্ষু চরক গাছ। আমি চুপ করে থাকলাম। পুরুষ লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। এ.টি.এম. থেকে টাকা উঠিয়ে দুই চার জন লোক বের হওয়াতে লাইন ছোট হয়ে আসছে। তা সত্ত্বেও আমি অনেকটাই দূরে আছি। লাইনে সামাজিক দুরত্ব নেই। দুই তিন বার আমি বলাতে তারা কোনো গুরুত্ব দিল না। মহিলা লাইনে আমাব পাশে এক মহিলা দাড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ থেকে। সংগে ছয় বৎসরের একটি মেয়ে। নিজের মেয়ে বলে বোধ হয়। মাঝে মাঝে ছোট মেয়েটি মহিলাকে 'মা, মা' বলে ডাকছেন। 'আর কতক্ষণ দাড়িয়ে

থাকবে বলে' বলে জিজ্ঞাসা করছেন। মা মেয়ের মুখে কোনো মাস্ক নেই। ভদ্র মহিলার বেশ ভূষা দেখে ও কথাবার্তা শুনে মুসলিম মহিলা বলে মালুম হল। পড়া-শুনাও অল্প-সল্প জানে মনে হল। আমি ভদ্র মহিলাকে জিজ্ঞাস করলাম, "কোথা থেকে আসছেন আপনি"? "ভাসানীচর থেকে" ভদ্র মহিলা উত্তর দিলেন। বললাম- "আপনি এত দূর থেকে ভর দুপুরে প্রচণ্ড রৌদ্রে এই মেয়েটিকে সংগে নিয়ে এ.টি.এমে আসছেন টাকা তুলতে আপনার বাড়ীতে কোনো পুরুষ মানুষ নেই? মাস্ক কেন পরিধান করেননি।" মহিলাটির উত্তর বাড়ীতে পুরুষ মানুষ আছে। আমার স্বামী কাঠমিস্ত্রীর কাজ করে। কাজে গেছে। এখানে আসলে হাজিরা নষ্ট হয়ে যাবে, খাবো কি? গত কাল অরুণোদয় হিতাধিকারীর (আসাম সরকারে দেওয়া সাহার্য্য) টাকা একাউন্টে ঢুকছে। তাই আজ আমি মেয়েটিকে নিয়ে টাকা তুলতে এসেছি। এবং এই মেয়েটির জন্যে ঈদের একখানা জামা কিনবো বলে মেয়েটিকে সংগে এনেছি"।

-- "আপনি জানেন না সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাসের কথা। আমাদের এখানেও করোনা ভাইরাস এসেছে। অনেক লোক আক্রান্ত হয়েছে এবং মানুষ মারা যাচ্ছে রোজ। করোনা প্রতিরোধ করতে হলে মাস্ক পরিধান করতে হয়, সামাজিক দুরত্ব মানতে হয়। বার বার সাবান দিয়ে হাত ধুতে হয়। -- আমি বললাম।

– "বাবু, করোনা কি, মাস্ক কি আমরা বুজি না। গ্রাম গঞ্জের চরের মানুষ আমরা। চাল ডালের চিন্তা করতে আমাদের জীবন শেষ। আমরা অত শত জানিনা।"– মহিলা বললেন।

– আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "সারা বিশ্বে করোনা নিয়ে হুলুস্থুল। আপনাদের ওখানে কেউ জানেনা? কেউ জানাননি আপনাদের করোনা ভাইরাসের মারাত্মক ক্ষয় ক্ষতি সম্পর্কে?

– না বাবু, আমাদের ওখানে ভোটের সময়ে লোকজন যায়। নেতারা আর বড় মানুষ যায়, পাঁচ বৎসর পর পর। এবারে কেউ আমাদের এখানে আসেননি এবং কোনো কিছুই জানাননি।

– কি অবস্থা। সাবধান হয়ে থাকবেন। মাস্ক কিনে নিয়ে পরবেন। না হলে কাপোড় দিয়ে বাড়ীতে মাস্ক বানিয়ে পরবেন। নতুন কাপোড় না থাকলে পুরণো কাপোড় দিয়ে বানিয়ে পরবেন। আর ঈদের জন্যে নতুন কাপোড়ের কি দরকার? করোনার জন্যে পবিত্র রমজান মাসের তারাবীর নামাজ (সমবেত নামাজ) নেই মসজিদে। মসজিদে শুধু তিনজন লোক নামাজ পড়তে পারবে। শুধু মুসলমানের জন্যে মসজিদ বন্ধ নয়। হিন্দু, জৈন, শিখ, খ্রীষ্টান ভাইদেরো মন্দির, সত্র, গুরুদ্বার, গীর্জাও বন্ধ রাখার নোটিস দিয়েছে সরকার। আমাদের ভালোর জইন্যে। যাতে বেশি জন সমাগম না হয়। সব ধর্মের উৎসব ক্রমে – ঈদের নামাজ বন্ধ, আমাদের জাতীয় উৎসব বিহু, ফাগুয়া (হোলী), অম্বুবাচী মেলা, দুর্গাপূজার মেলা, ছট পূজার মেলা, ব্রজপুর নদে, অষ্টমীর পূণ্য স্নান ও মেলা বন্ধ। জন সমাবেশ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে

সরকার। সব রকমের সরকারী বেসরকারী অফিস, আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ, মিটিং বন্ধ। এমনকি বিয়া, শ্রাদ্ধতেও নিমন্ত্রিতের সংখ্যা সীমিত করা হয়েছে। খেলাধুলো নিষিদ্ধ। কারণ জন সমাবেশ থেকে করোনা ভাইরাস সংক্রমিত হয়।

আমি অনেক কিছু বললাম চরের এই মহিলাকে। আমার কথা শুনে ঐ মহিলা ফেলফেল করে তাকিয়ে রইলো। প্রচণ্ড রৌদ্রতে মহিলা ও ছোট্ট মেয়েটি লালকাল হয়েছে বুঝতে পারলাম। আমার পাশের লোকেরা আমাকে আস্ত পাগল ভাবছে না কি বুঝতে পারলাম না? যাই হোক, আমার করোনা সম্পর্কে বলা সংক্ষিপ্ত কথাগুলি ঐ মহিলার বোধগম্য হয়েছে কিনা জানিনা। এই কথা গুলি বলতে বলতে আমরা এ.টি.এমের দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছলাম। আমি ভদ্র মহিলাকে আমার আগে টাকা উঠানোর জন্যে এ.টি.এমের ভিতরে যেতে বললাম। "মহিলাকে অগ্রাধিকার সৌজন্যে।" আমাদের দেশে মানুষের কবে যে আসবে হুস – বলা মুস্কিল। আমার দেশের সর্ব স্তরের কল্যাণ হেতু নিঃস্বার্থভাবে কবে যে ওনারা 'ধর্ম থেকে কর্মকে' অগ্রাধিকার দেবে, কবে যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়বে, বোধদয় হবে – সেটাও পরিস্কার নয়।

ঞ্জঞ্জঞ্জঞ্জ

জলসিঁড়ি

সুকান্ত নাহা

শীত পড়তেই চা-গাছগুলো যখন মাথা মুড়িয়ে সন্ন্যাস নেয়, মাইলকে মাইল ছায়াগাছগুলোর মনেও তখন বৈরাগ্য আসে। বসন্তে যখন পাতাহীন শাখামেলে গাছগুলো একতারা হাতে বিবাগী বাউল হয়ে ওঠে, তখন যেন সেই বৈরাগ্যের ছোঁয়াচ লাগে চা-জমির ঢালু প্রান্তভূমি ছুঁয়ে থাকা জলহীন পাথুরে নালাগুলোতেও। ভুল করে সেখানে কোঁচবকের ঝাঁক নেমে পড়ে দেখে কোথাও একবিন্দু জলের চিহ্নমাত্র নেই। নিরাশ হয়ে তারা ডানা মেলে উড়াল দেয় আকাশে। আদিগন্ত জলনিঃস্বতার মাঝে অশ্বত্থতলার শান বাঁধানো প্রাচীন কুয়োটারই শুধু ছুটি মেলেনি এতকাল। বুড়ো-কুয়ো জল জোগাতে হাঁফিয়ে উঠেছে। বসন্তে শুকিয়ে গেছে বুক। তবুও শেষরাতে কোনো এক অজানা রহস্যবলে জীর্ণবুকের হাড়পাঁজর ঠেলে কিছু সময়ের জন্য উঠে আসতো মিঠেজল। কেন তা কেউ জানে না। মানুষের বিশ্বাস কুয়োতে "জলদেওতা"র বাস। শুখা মরশুমেও জলদেবতা বুক ফাটিয়ে পানীয় জলটুকু অন্তত যোগান দিয়ে গেছে। ভোররাতে উঠে মানুষ জল সংগ্রহ করে নিত। কেননা রোদ উঠতেই যে ফের শুকিয়ে যাবে কুয়োর বুক। বুড়ো-কুয়ো এভাবেই জল জুগিয়েছে। তৃষ্ণার্ত রাখেনি কাউকেই এতকাল।

মানুষ কুয়োটাকে তাই পুজো করে। কেউ সেখানে চান করে না, কাপড় ধোয় না, বাসন মাজে না। সেসব সারতে মানুষ যায় টিলার নিচে শীর্ণকায় পাহাড়ি ঝোরার কাছে। এতদিন কুয়ো জলদানে অকৃপণ ছিল বলেই মানুষজন পানীয় জলের জন্য নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু হঠাৎ এক চৈত্রের ভোরে জল আনতে গিয়ে একজন দেখলো কুয়ো শূন্য। একবিন্দু জল নেই তাতে।

খবর ছড়াতেই লাইনের মেয়ে-বৌ সকলে ভীড় জমাতে লাগলো কুয়োর কাছে। বেশ কিছু মরদও জুটে গেলো খবর পেয়ে। উঁকি মেরে কুয়োর ভেতর তাকিয়ে তারা ভেঙে পড়লো হতাশায়। কাছাকাছি বিকল্প পানীয় জলের উৎস বলতে টিলার নিচে একটা কাঁচা কুয়ো আছে বটে, তবে সে কুয়োর জল খেলে মানুষ প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে। সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষজন তাই নিজেদের অসহায় বোধ করতে লাগলো। নিশ্চয়ই কেউ কুয়োর জলে চান করেছে বা বাসন মেজেছে। যে কারণে "জলদেওতা" মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সন্দেহের তিরে বিদ্ধ হতে থাকে অনেকেই। নির্দিষ্ট করে কাউকে বলির পাঁঠা না করা অবধি কারো মনে স্বস্তি হয়না কিছুতেই। ঝোপবুঝে এই মোক্ষম সময়ে চৈতন নাইক তার পুষে রাখা তিরটা ছুঁড়ে দেয়।

"উ-দিনা মোয় দেইখো, রাইত ঘড়ি উইঠকে রোজিঠো ই কুপ কর পানি সে উকর লুলহা ছোউয়াঠোকর হাগল লুগা ধোয়কে লেগলক।" রাতের অন্ধকারে রোজি নাকি কুয়োর

জলে ওর জড়ভরত ছেলেটার বর্জ্য মাখানো কাপড় ধুয়েছে। কথাটা যেন আগুনে ঘি ফেললো। উপস্থিত অনেকেই ক্ষেপে উঠলো নিমেষে। যে ভীড়ে বিনীতাও ছিল। কিন্তু অসন্তোষের স্রোতে ভেসে না গিয়ে চটজলদি পাল্টা প্রশ্ন ছোঁড়ে বিনীতা, "তোঁয় আপন আঁইখসে দেইখিস?" (তুই নিজের চোখে দেখেছিস?)।

দুম করে কেউ কাউন্টার করে দেবে আঁচ করে নি চৈতন। একরোখা বিনীতার সামনে তাই আমতা আমতা করতে থাকে, "মোয় নি দেইখো ... মোকে উ... কে হর জুন বাতালাক..." (আমি দেখিনি, কে যেন বললো আমাকে)।

চৈতুর কথা শুনে যা বোঝার বুঝে নিয়ে ফুঁসে ওঠে বিনীতা,

"ইকরমে রোজি ভৌজি (বৌদি)-কে নি ফাঁসাবে তো! আগে ইসোব কালে নি বাতালে? তাহোর ধান্ধা হামিন নি বুঝোনা সোচোথিস?"

এসবের মধ্যে রোজিকে টেনে আনাটা পছন্দ হয়না বিনীতার। তাছাড়া ওর কথায় যুক্তি ছিল। চৈতু আগে কেন বলেনি। তাল বুঝে এসব তথ্য উত্থাপনের পেছনে নিশ্চয়ই কোনো মতলব আছে!

সমবেত আক্রোশ বিনীতার পাল্টা প্রত্যাঘাতে ধন্ধে পড়ে যেন হঠাৎ থিতিয়ে পড়ে। চৈতু যে রোজিকে ফাঁসানোর তাল করছে না এর বাস্তবতা কেউ একেবারে উড়িয়ে দিতে পারে না। স্টিফানের একদা ঘনিষ্ঠ সহযোগী চৈতু, রোজিকে একলা পেয়ে একদিন মত্ত অবস্থায় ঘরে ঢুকে জবরদস্তি করতে গেছিল। রোজির চিৎকারে আশপাশের দু-একজন ব্যাপারটা জেনে গেলেও তা পাঁচকান হয় নি। অথচ সারা ময়নাধূড়ায় সেটা চাউড় করে দিল স্টিফান নিজেই। একটিলে দুইপাখি মারার এমন সুযোগ সে হাতছাড়া করতে চায়নি। দলবদলু চৈতন আর আশ্রয়দাতা যোহান দুজনকেই বদনাম করে বেকায়দায় ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। খুব একটা সুবিধে হয় নি তাতে। মাঝখান থেকে চৈতুর যাবতীয় রাগ গিয়ে পড়লো রোজির ওপর। রোজিকে বিপাকে ফেলার সুযোগটা ফের ঘেঁটে যাচ্ছে দেখে মরিয়া হয় চৈতু। তড়িঘড়ি ড্যামেজ কন্ট্রোলের লক্ষ্যে জল সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবটা ছুঁড়ে দেয়। প্রথমত, পঞ্চায়েতের কাছে দরখাস্ত করা হবে কুয়ো সংস্কারের জন্য। তাতে সকলকে 'ঠেপা' (টিপছাপ) দিতে হবে। আর সরকারি কল যাতে বসে তার জন্য দরবার করতে হবে জেলা পরিষদের কাছে। দায়িত্বটা আগবাড়িযে চৈতু নিজের কাঁধেই তুলে নেয়। ঘোষণা করে দেয় ডিপালাইনে কল বসবেই। তবে তার জন্য দুটো শর্ত পালন করতে হবে। এক, আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের টিকিট পেলে চৈতন নাইককে জেতানো চাই। দুই, সংস্কারের পর এই অশ্বথতলার "বুড়া-কুপ" থেকে রোজি যেন জল নিতে না পারে, সেটা সবাইকে দেখতে হবে। ও অপয়া। ও থাকলে উপালাইনের কিস্যু হবে না। চৈতনের প্রস্তাব কেউ কেউ মেনে নিলেও বিনীতা বেঁকে বসে। চৈতুর আসল উদ্দেশ্য আঁচ করতে পেরে অধিকাংশ মেয়ে-বৌ বিনীতার দিকে ঝুঁকে থাকে। প্যাঁচে ফেলে

শ-দেড়েক সুপারি গাছ সমেত বাড়ি আর স্বামীত্যক্তা যৌবনবতী রোজিকে দখলে আনার স্বপ্ন চৈতনের অনেকদিনকার। বৌ মরার পর সেই স্বপ্নে যেন ডানা গজিয়েছে। অবশ্য দখলদারীর এই বিদ্যেটা গুরু স্টিফানকে দেখেই ওর শেখা।

(২)

হিসেব মতো দুটো সরকারি কল বসবার কথা ছিল ময়নাধূড়া চা-বাগানের ডিপালাইনের চল্লিশ ঘর বাসিন্দার জন্য। সেগুলো অন্যত্র বসানো হলো। লাইনে ঢোকার কাঁচা রাস্তাটাও আর পাকা হলো না। কাজটা ঝুলে গেছে। বাসিন্দাদের জব-কার্ড থাকলেও শেষ কবে ডিপালাইনে একশো দিনের কাজ হয়েছে মনে পড়ে না কারোর। এ সবই জেলা পরিষদ সদস্য যোহান মুন্ডার সঙ্গে ভূতপূর্ব পঞ্চায়েত প্রধান স্টিফান এক্কার রাজনৈতিক শত্রুতার জের। যেটা সকলেরই জানা। তামাম কার্মাহাটা ব্লকে একসময় স্টিফানদের মৌরসিপাট্টা চলতো। ময়নাধূড়ার লেবার ইউনিয়নও ছিল তাদের দখলে। অফিস চত্বরে একটাই নিশান উড়তো। কেউ বিরোধী দলের নিশান তুললে, কিংবা ভোটের আগে রাতের অন্ধকারে গোপনে দেয়ালে লিখলে পরদিন তাকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না। এমনই এক তুঙ্গ সময়ে ফুটবল খেলা নিয়ে ঝামেলা বাঁধলো। বছর চল্লিশের স্টিফানের দলের সাথে পঁচিশের যুবক জোহানের। মার খেতে হলো যোহানকে। স্টিফান বাহিনীর অত্যাচারে প্রাণ বাঁচাতে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেলো যোহান। শত্রুতার বীজতলাও তৈরি হলো সেইদিন।

এই ছবিটাই একদিন উল্টে গেল। পাল্টে গেল দিন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদের প্রার্থী হয়ে যোহান মুন্ডা জিতলো। জিতলেও পঞ্চায়েত প্রার্থীর ব্যালট কাউন্টিং-এ দেখা গেল ডিপালাইন বুথের ব্যালটে স্টিফানের দলের পক্ষে ভোট পড়েছে বেশি। মার্জিনাল ভোটে যোহানের দল জিতলেও অস্বস্তিটা থেকেই গেলো। এবং তারপর থেকেই কাকতালীয়ভাবে থমকে গেলো ডিপালাইনের উন্নতি। তাতে অবশ্য নিজের উন্নয়ন মোটেই আটকায়নি যোহানের। কার্মাহাটায় পাকা বাড়ি হল। দু-ভাইয়ের নামে দু-দু'টো এইট-সিটার গাড়ি নামলো রাস্তায়। ব্যাংক ব্যালান্স কোলা ব্যাঙের মত লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে লাগলো। স্ত্রীর স্কুলের চাকরিটাও পেকে গেল। শুধু রঙচটা মোটর সাইকেলটাই দীনতার বিজ্ঞাপন হয়ে সর্বক্ষণ ঘুরতে থাকলো জোহানের সাথে সাথে। আর এসব দেখেশুনেই তাল বুঝে চৈতুর মতো বিরোধী চুনোপুটি ঝোঁকবেধে মিশে গেল যোহানের দলে।

হাওয়া মেপে স্টিফান অবশ্য ঢের আগেই ডেরা পেতেছিল মানঝোরার জঙ্গলবস্তিতে। ক্ষমতার শীর্ষে থাকতে যেখানে পাঁচবিঘা ধানি জমি সমেত দলীয় কর্মীর বিধবাকে একদা ফিক্সড ডিপোজিট রেখেছিল। এখন সেই সম্পত্তি ভাঙিয়ে ওর দিন কাটছে। এদিকে ডিপালাইনের "ডিপা" অর্থাৎ উঁচু জমিটার শেষপ্রান্তে বাসক-নিশিন্দার বেড়াঘেরা সুপারি,

নারকেল, সেগুন, গামারের ছায়ায় ঢাকা সেমি-পাকা লেবার-কোয়ার্টারে রোজি তার আট বছরের একমাত্র ছেলেকে নিয়ে নিরালম্ব পড়ে থাকে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মাঝে। যে ছেলের বোধবুদ্ধি স্বাভাবিক নয়। হাতে তুলে খাবার খেতে পারে না। হাঁটতে গেলে পা জড়িয়ে আসে। মুখ দিয়ে লালা ঝরে অবিরত। ভোরে উঠে ছেলের নোংরা করে ফেলা কাপড়-জামা ধুয়ে, গা মুছিয়ে, খাইয়ে তবে কাজে যেতে হয় রোজিকে। কাজে যেতে দেরি হলে হাজিরা কাটা যায়। বাড়ি ফিরে সন্তানকে বুকে জড়িয়ে নানান কাল্পনিক আশংকার জাল বুনতে বুনতে নির্ঘুমে রাত কাটে রোজির।

(৩)

কাজ থেকে ফিরে সেদিন রোজি দেখে বাড়ির সামনে হাতে একটা কাগজ নিয়ে বিনী দাঁড়িয়ে। সঙ্গে আরো কয়েকজন। কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে বলে, "হিনে এগো ঠেপা কইর দে ভৌজি। পঞ্চায়েত বাটে জমা করেক পড়ি।" চৈতু কিছু করার আগেই ওর আইডিয়াটা হাইজ্যাক করে নিয়েছিল বিনীতা। ওর ডাকে গ্রামের আশি শতাংশ মানুষ সাড়া দিয়েছিল। কাজে 'নাগা' (কামাই) করে সইসাবুদ জোগাড় করেছিলো বিনীতা। কুয়ো-সংস্কার, সরকারি কল, সি.সি রোড, একশো দিনের কাজ ইত্যাদি নানা বিষয় উল্লেখ করে দরখাস্তটা লিখে দিয়েছিল বিনীর কলেজে পড়া ছেলে। সেই চিঠির কপি বিডিও, এসডিও, জেলা পরিষদ, ডি.এম এমনকি মেল মারফৎ মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর অবধি পৌঁছলো। পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে স্মারক জমা দিতে রোজিকে সামনে রেখেছিল বিনী। সঙ্গে ছিল গ্রামের আরো জনা পঞ্চাশেক মেয়ে, বৌ, বাচ্চা, মরদ। পঞ্চায়েত অফিসের সামনে মিডিয়াকেও বুদ্ধি করে ডেকে এনেছিল বিনীর ছেলে। প্রধানের কাছে স্মারকপত্র জমা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে সুন্দর করে 'বাইট'দেয় বিনিতা। রোজিকে দিয়েও বলিয়ে নেয় দু চারটে অসহায়তার কথা। বিভিন্ন চ্যানেল সেটা প্রচার হয় সেদিন। চৈতনকে কোণঠাসা করতে রোজিকে শিখন্ডী করে পুরো প্ল্যানিংটা এত সুন্দর করে ছকেছিল বিনীতা যে ম্যাজিকের মতো কিছুদিনের মধ্যেই কুয়ো সংস্কারের কাজ শুরু হয়ে যায়। বুড়ো-কুয়ো জল ফিরে পেয়ে ফের ফোকলা দাঁতে হেসে ওঠে। আর সেই জলে ময়নাধূড়ায় ভেসে ওঠে নতুন মুখ। বিনীতা লোহার।

দেখতে দেখতে এগিয়ে আসে পঞ্চায়েত ভোট। ভোটের আগে নতুন করে দুটো সরকারি কলের শিলান্যাস করে যায় যাহোন মুন্ডা নিজে এসে। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যোহানের পাশে দাঁড়িয়ে ফিতে কাটার কাঁচিটা এগিয়ে দিতে দেখা যায় বিনীতাকে। দুজনের মাঝে কিছুক্ষণ কথাও হয়। দূর থেকে এসব লক্ষ্য করে চৈতু। কাছে আসে না। গাড়িতে ওঠার আগে যোহান শুধু এ পিঠে আলতো হাত রেখে কিছু বলে যায়। সেই স্পর্শে চৈতুর ভেতরের জ্বালা যে তিলমাত্র প্রশমিত হয় না সেটা ওর শরীরী ভাষায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

(৪)

ভোটে জিতে বিনিতা এখন পঞ্চায়েত প্রধান। বাগানের কাজে ইস্তফা দিয়ে সারাদিন মৌয়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের গদিআঁটা চেয়ারে বসে মানুষের অভাব অভিযোগ শোনে। আজ কার্মাহাটার বিডিও অফিস তো কাল সদরে জেলা পরিষদের অফিস...মিটিং মিছিল...সব মিলিয়ে ফুরসত মেলেনা বিনীর। হালে পানি না পেয়ে চৈতু ভোটের অনেক আগেই কাজ জুটিয়ে সটকে পড়েছিল ভীনরাজ্যে। অন্যদিকে ডিপালাইনে নতুন কল বসে গেল। পাকা সড়ক থেকে সি.সি. রোড ঢুকে পড়লো লাইনে। অশ্বথতলার কুয়োতলায় এখন সারাদিন মানুষ জল তোলে। একশো দিনের কাজ হয়। বিজলি বাতি আগেই ছিল। এখন বাড়িতে কম্পিউটার বসিয়ে আধার লিংকে টাকা তোলা, অনলাইনে বিজলি-বিল, বিমার-প্রিমিয়াম, মোবাইল ডিশ টিভি রিচার্জ, অনলাইন ফর্ম ভর্তির ব্যাবসা খুলেছে বিনীতার ছেলে। আধার লিংকে আঙুল ছুঁইয়ে লাইনের মানুষ তলবের (বেতন) টাকা তুলে নিয়ে যায়। হাজারে দশ, বিল পেমেন্টে কুড়ি, রিচার্জে কমিশন, ইনকাম মেরে কেটে মন্দ হয় না। মৌয়াবাড়ি হাটে দোকান সমেত একটা ঘর কিনেছে বিনী। দিনদেখে ছেলেটা সেখানে শিফট করে গেলেই নিশ্চিন্তি। তারপর আস্তে আস্তে পুরনো ঘর ভেঙে মাথা তুলবে দোতলা। ছেলের বিয়ে হবে। মৃত স্বামীর নামে ফলক বসবে বাড়িটার সামনে। স্বপ্নচারায় মাঝে মাঝেই জল ছেটায় বিনীতা।

কেবলমাত্র রোজির জীবনটাই শুধু সেই একই তারে বেজে চলেছে এখনো। অশ্বথতলার কুটোয় এখনো ও জল আনতে যায়। সেখানে গেলেই স্টিফানকে জড়িয়ে বৌগুলো ওকে বাঁকা কথায় বিঁধতে ছাড়ে না। স্বামী ছেড়ে গেলেও তার বদনামটুকু এঁটুলির মতো গায়ে সেঁটে রয়েছে এখনও। ইদানিং কেউ আর খোঁজও করে না রোজির। বর্ষায় ছেলেটা শূলঝাড়ায় (রক্তআমাশায়) মরতে মরতে বেঁচে গেলো। অনেকে মানা করেছিলো টিলার নিচের কাঁচা কুয়োর জল খেতে। রোজি শোনেনি। মানুষের বাক্যবাণের চাইতে ওই বিষ জল হজম করা বোধহয় সহজ। চৈত্রের ঝড়ে গামার গাছ উপড়ে রোজির শোবার ঘরটা ভেঙে গেছে। পাশের রান্নাঘরে দুটো ছেগরি আর লাকড়ি (ছাগল আর জ্বালানি কাঠ)-র পাশে মা-ছেলে কোনোমতে চারপাইতে ঘুমোয়। বাগানের ম্যানেজারকে অনেকবার জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। এখন আশায় শুধু দিনগোনা, বোনাসের টাকাটা কবে হাতে আসবে। হাতে এলে তবেই সারিয়ে তুলতে পারবে ঘরটা।

সেদিন লাইন-মিটিং এ এসে ভাঙা চালাটা হঠাৎ চোখে পড়ে বিনীতার। রাস্তা থেকে সে উঁচু গলায় ডাক পারে রোজিকে। ডাক শুনে উঠোনে এসে দাঁড়ায় রোজি। পেছন পেছন ছায়ার মত ওকে অনুসরন করে ছেলেটা। বিনীতা বেশ জোর দিয়ে শোনায়, "ঘর টুটলাক মোকে কালে নি বাতালে ভৌজি? একদিন পঞ্চায়েত বাটে আয়কে আপ্লিকেশান মে ঠেপা

দেইকে আবে। তোহিন লে পাক্কাঘর বানায় দেবু, সরকার বাট সে।"

ঘর ভাঙার খবরটা না জানানোয় অনুযোগ করে বিনীতা। সেই সাথে সরকারি ঘর পাওয়ার ঘোষণাটা বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে আড়চোখে চারপাশটা একবার দেখে নেয়। দুচারটে চেনা মুখ চোখে পড়ায় উৎসাহিত হয়ে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল বিনীতা ঘটা করে। কিন্তু রোজির নিরুৎসাহিত অভিব্যক্তি ওকে যেন অবাক করে। রোজির ঠোঁটে ম্লান হাসি। কোনো কথা নেই। পেছনে মায়ের শরীর আঁকড়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটা বড় বড় চোখ করে বিনীকে দেখে। ঠোঁট দিয়ে লালা গড়ায়। মুখ বেঁকিয়ে সে-ও কেমন যেন অদ্ভুত ভাবে হাসে। সে হাসির অর্থ বোঝার আপ্রাণ চেষ্টা করে বিনীতা। অদ্ভুত একটা অস্বস্তি ছড়িয়ে পড়তে থাকে বিবেকের শেকড়বাকড়ে। হাসি মুছে গিয়ে ছেলেটার খর চোখ আপাদমস্তক জরিপ করতে থাকে বিনীতাকে। মনে হয় চাহনিটা যেন সাপের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে। অব্যক্ত হিমশীতল একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে শরীর জুড়ে। দৃষ্টি সরিয়ে দ্রুত সরে আসে বিনী। মাটির সরু পথ ছেড়ে নতুন সি. সি রোডটায় ওঠে পড়ে। অদূরে হাইওয়েটা দেখা যাচ্ছে। দ্রুত পা চালায় বিনিতা লোহার। থামলে চলবে না। সামনে আরো অ-নে-ক, অ-নেক, অনেকটা পথ যে যেতে হবে তাকে।

❖❖❖❖❖

করোনার সুফল

মঞ্জু ঠাকুর চৌধুরী

'শুইয়া আছ, ঘুম আইতাছে না?'

'না, প্যাটের টা বড় জ্বালাইতাছে'

'উর আর দোষ কি? খালি প্যাট, ভাত নাই। কি যে আইন দ্যাশে?'

কেউ কামে নেয় না, কি কইরা বাঁচুম 'ক' দেখি। তার উপর তোর.....। সরকারের দেওয়া বিনা পয়সার চাউল কয় দিন আর যায়। সেইটাই কি আর কাঁচা চিবাইয়া খাওয়ন যায়! হ্যারা বোঝে না –।

'হ', ওগো বোঝনের দ্বায় লাগছে! ভুটের সময় আইব নেতা মন্ত্রীরা, তখন কও ভালো ভালো কথা। আমরা তকন হই নিজের লুক, ভুট-মিটলে স্বতালা'–।

'ঠিক কইছিস। ভুটের আগে এ কইল এত দিমু ও কইল আমি অর চ্যায়া বেশি দিমু, কই'!

'আরে আমাগো মতো মানুষ গুলা লইয়া ব্যাবসা কইরা ওরা বড় লুক হইতাছে আর আমরা....! তোর বাসা বাড়িটাও যদি থাকত এই সময়, তাও তো কোন রখমে চলত। অদের যে কি হইল!

'হ', অমন দ্যাবতুল্য দাদা বাবু, হঠাৎ কইরা কুন ম্যায়ার ফ্যান্দে, পরল। আর বউদি মনি আমার এখনো বিশ্বাস হয়না, কিন্তু বউদি মনিরেও তো অবিশ্বাস করতে পারি না! বউদি মনি যে দিন ছাইরা গেল। তার আগের রাইতে মনে হয় সারা রাইত জাইগা খুব কানছিল, সব ছাড়নের জ্বালা তো। নিজের হাতে গড়া সংসার খান এমন কইরা ছাইড়া যাওয়া। চোখ দুইডা টকটকা লাল – চোখের কোল দুইটাত যেন কে কালি ল্যেইপা দিছে। ভগবানের উপর রাগ হইতাছিল এত ভালো মানুষেরে এমন কইরা কষ্ট দেয় এত নিষ্ঠুর কেন হইলা তুমি, মায়া হয় না তোমার! দাদা বাবু ঘরের মধ্যে গোঁড় হইয়া বইসা ছিল, একটা কথা ও কইল না। বৌউদি মনি চইলা যাওনের কতক্ষণ পর ঘরের বাইরে আইসা আমারে কইল – কলমি যা বাড়ি যা আর আসতে হবে না তোকে। যেন আমি-ই কি করছি, কইতে পারলাম না, না দাদাবাবু তোমারে একা রাইখা আমি জামু না, মা উপর থাইকা অভিশাপ দিব আমারে। বড় মায়া হইতাছিল কিন্তু –?

'তর বউ দি-মনির বড় ত্যাজ। একটু মানাইয়া-গুদাইয়া নেওন যাইত না!'

'ক্যান মরদ বইয়া! ম্যায়া মানুষের কুনো দাম নাই তোমাগো কাছে তাই না? তোমরা ম্যায়া মানুষেরে পড়নের কাপড় ভাব না! নুতন কাপড় লইয়া মাতা মাতি করবা, পুরান হইলে ছুঁইরা ফ্যাঁলাইয়া দিবা। কিন্তু ম্যায়া মানুষ পুরান কাপড় টারেই যত্নে রাখে ছিড়া গেলে তালি

দেয়; সহজে ফ্যাঁলাইয়া দেয় না। আমরা যে ঘর বাঁধিতে ভালাবাসি। আর তোমরা নদীর চড়ে বাসা বাঁধ। চড়ে বান আইলে তার চ্যাহ্নও থাকে না। আবার অন্য চড় সেইখানে থাইক্কা আবার অন্য চড় ঘুইড়া বেড়াও। এমন কইরাই তো আমার কাছে আইছ লক্ষ্মী দিরে ছাইড়া। কেন, কেন আইলা! আমি যদি আগে জানতাম.....?

'আইজ তোর কি হইল, এমন কইরা কস। লক্ষ্মীর কথাতো তোরে আমি-ই কইছি পরে, কইনাই?

'হ', কইছ, কিন্তু তত দিনে আমাগো?.....

'আমি কি করুম 'ক' পাড় থাইকা আসলে। সময় কত কইরা সঙ্গে আনতে চাইলাম, আইল না মা-বাপ-দ্যাশ ছাইড়া। ঐ এক কথা-অচিন অকুল পাথারে ডুবন দিমু না। কত বুঝাইলাম, এর চিন্তা নাই গোহিন গাঙ্গেয় মাঝি হইয়া তোরে যত্নে বাঁচাইয়া রাখুম। 'কইল না' মাঝি কাম নাই, তোমার না ভয়ের বাদাম ঝড়ের দাপটে ফ্যাঁলা-ফ্যাঁলা ভয় লাগে। যাইবা যখন একাই যাও, ছাইড়া দিলাম'–। তোরেও তো এত ভালোবাসি তুই কি বুঝস না।'

'বুঝি, কিন্তু বড় ডর লাগে। তুমি আর দাদাবাবু এক হও যখন, ভদ্দর মানুষ আর লেখা পড়া না জানা মুখ্য-সুখ্য মানুষ তখন ভাবি সব পুরুষ মানুষি কি এক! আবার ভাবি না তো কত মানুষিতো সারা জ্যেবন ভালো বাইসা এক লগে কাটাইয়া দেয়।'

মোবাইলটা বেজে উঠল – হৃদ মাঝারে রাখব ছেড়ে দেয় না ......। দয়াল বলল – 'কলমিরে তোর বাসাবাড়ির ফুন, ধর'।

কলমি ফোনটা হাতে নিয়ে বলল – 'হ্যাঁলু।

'কলমি আমি দাদা বাবু, কেমন আছিস, জ্বর টর হয়নি তো!?

'না গো দাদা বাবু, ভালোই আছি'।

'তা হলে কাল সকালে আসতে পারবি'?

'ক্যান পারুম না দাদাবাবু, আসুম। আপনি ভালো আছেন, তো'!

'হ্যা রে, আমি ভালো আছি –। তা হলে কাল সকালে আসিস। কেমন'?

'আইচ্ছা আসুম, রাখি'–?

'রাখ'–।

কলমি দয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল – 'দাদাবাবু ফুন করছিল, কইল কাইল থাইকা যাইতে। একটু আগে-ই কইতা ছিলা না, আমার বাসা বাড়িটা থাকলে বাঁইচা যাইতাম। ভগবান শুনছে আমাগো কথা কও'!

'হ', ঘুমাইয়া পর কাইল আবার সক্কাল-সক্কাল উঠতে হইবো নে আমি তোর মাথাটাত হাত বুলাইয়া দেই, ঘুমা'।

'লাগব না, তুমি ঘুমাও'–।

কলমি খুব ভোরে উঠে, সকালের কাজকর্ম সেরে নিয়ে যাবার সময় দয়ালকে বলল – 'মুড়ির কৌটাত কয়টা মুড়ি আছে, মুখে দিয়া জল খাইও'–।

দয়াল বলল 'তুই তার থাইকা দুইটা খাইয়া যা'।

'না থাক, আমি তো যাইতাছি তুমি খাইও'–

'আচ্ছা, যা, ও শোন মুখের টোপাটা পড়চ্ছস তো'–।

'হ' ঐ ছাতা পড়ছি, ঐ ডা পরলে কেমন দম বন্ধ হইয়া আসে'–।

দয়াল হাসে কলমির কথা শুনে।

কলমি বলল – 'আসি, থাক। মুড়ি টুকু খাইয়ো'–।

কলমি কলিং বেল পুশ করল একবার – দু বার – তিন বারের পর দরজা খুল্ল। এ কি, কলমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, এ কি দেখছে, এ, ও কি সম্ভব! তাইলে যাবার সময় যে কইল আর কোন দিন এ বাড়ি আসবোনা দাদা বাবুর মুখ দ্যেখবোনা তাইলে! নীলাঞ্জনা নিরবতা ভেঙে বলল –। কলমি আয় ভেতরে আয়'–।

'বউদি মনি তুমি'।

'এই তো কাল রাতে এসেছি। ভালো আছিস, এ কি শরীরের হান করেছিল, ডাক্তার দেখিয়েছিস!

'না গো, খাওয়াই জোটে না, তা আবার ডাক্তার'!

'ক' মাস যেন হলো তোর'?

'এই তো পাঁচে পরল'–।

'আর ভাবিস না, আমি তো এসে গেছি'।

'সত্যিই বউদি মনি তুমি আইসা আমার প্যাটের টারে বাঁচাইলা।

না হইলে মরণের কি রোগ আইছে সারা দুনিয়া জুইড়া সব ছাড় খার কইরা দেওনের লাইগা। সেই আর প্রতুম মা হওনের থাইক্কাও মুখ ফিরাইয়া দিত। তারে কেউ কাম দেয় না, কি খাইয়া বাঁচি'–।

'তোরা খুব কষ্ট পেলি এতগুলো দিন। তোর দাদা বাবুর খেয়াল ছিল না, নইলে নিশ্চয়ই মনে করে তোর মাইনে টা পাঠাত। সেই ছোট থেকে বড় হলি বিয়ে হলো একটা মা হবি সবি তো তোর এ বাড়ি থেকেই। সেই দাদা বাবুর মা তোকে নিয়ে এসেছিল শুনেছিলাম তোর মাসির কাছ থেকে। তুই সবে তখন বাংলাদেশ থেকে এসেছিস এ দেশে। আমি বিয়ে হয়ে এসে তোকে পেলাম। সে কি আজকের কথা বল। বছর কুড়ি তো হলোই তোর এ বাড়ি আসার?

'হ্যাঁ গো বউদি মনি, তোমার আসার দশ বছর আগে। যাক তুমি ফিরে আসছ আমার কি ভাগ্নি।'

নীনাঞ্জনা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল – 'জানিস কলমি তুই যাকে মরণ রোগ বললি, সেই আমাদের বাঁচিয়ে দিল রে।

'ক্যমুন কইরা বউদি-মনি, সক্কলিয়ে কয়'....।

'ঠিকি বলে, কিন্তু'....।

'কিন্তু কি বউদি মনি। এইটা কেমন কথা হইল, বাঁচার আগে মারে!

'বুঝলি না'?

'না'–!

'এখানে থেকে যাবার 'ক' দিন পর যখন ভাবলাম ডিভোর্স কেস ফাইল করবো আর থাকবো না তোর দাদাবাবুর সঙ্গে, উকিলের সঙ্গে কথা বলে বাড়ি এসে শুনি কোর্ট বন্ধ করোনার জন্য। মন খারাপ বন্ধু-বান্ধব ফোন করে বোঝাচ্ছে ওদের কাছে সব খবর পাচ্ছি এর মধ্যে তোর দাদাবাবুর সঙ্গে কথা হল। বুঝতে পারলাম না রে আমি-ই তোর দাদা বাবুকে বুঝতে ভুল করে ফেলেছি। ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবোনা বুঝলাম। শেষে সব রাগ অভিমান মিটিয়ে কাল তোর দাদাবাবুর সঙ্গে চলে এলাম। এখন ভাবি যদি করোনাটা না হত তা হলে হয়তো'....!

কলমি কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল – 'জয় বাবা করোনা জয় তোমার পুজা দিমু।'

নীলাঞ্জনা হাসতে হাসতে বলল 'পাগলি একটা। মাস্ক আর সেনিটাইজার নিয়ে যাস সঙ্গে করে। করোনা পুজোয় লাগে কিন্তু ও দুটো, না হলে কোয়ারেনটাইনে ঢুকিয়ে দেবে। যা ফাজলামো করিস না চা নিয়ে আয়, তোর হাতে চা খাইনা কত দিন'–। বলতে বলতে গুনগুন করে এককলি ছড়িয়ে দিতে দিতে নীলাঞ্জনা ঘরে চলে যাচ্ছে। আর কলমি সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ওর সেই কি পরিচিত বউদি মনিকে। বাড়িটা আবার এমন করে কথা গানে যেন জেগে উঠছে। দাদা বাবু ডাকল – 'কলমি চা নিয়ে আয়, আর সঙ্গে বাজারের ব্যাগটা আনিস'–।

'হ' দাদাবাবু আনতাছি'–।

✠✠✠✠✠

ঠিকানা

রুবাইয়া জুঁই

শ্রাবণী বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে সংসার করছিল তুষারের সাথে। কতবার তুষার বলেছে এভাবে বাড়িতে থেকে সময় নষ্ট করো না। নাচের স্কুলটা আবার শুরু করো; এতে ফিগারটাও বেশ টানটান থাকবে। কিন্তু সে শোনেনি! ছেলে আর স্বামী এর বাইরে একমিনিট সময় নষ্ট করতে নারাজ। তুষার নামের যে মানুষটাকে সে ভালোবেসেছে নিজের সবটুকু দিয়ে সে বড্ড অচেনা হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। ঘরের মধ্যে এক বিরাট পাহাড় দাঁড়িয়ে। দুইদিকে দুইজন। ভেদ করবার উপায় নেই। এই সুযোগে কখন তুষারের জীবনে সেবন্তিকা ঢুকে পড়েছে তা খেয়ালই করেনি শ্রাবণী। সেইদিন বালির সাথে ঢেউয়ের লড়াই চরমে। তুষার তাকে ছেড়ে সেবন্তিকার ফ্লাটে গিয়ে উঠল। পাগলের মতো মরিয়া হয়ে ফিরিয়ে আনতে গেল সে তার সন্তানের পিতাকে কিন্তু সেবন্তিকা সামনে দাঁড়াল। সেও তুষারের সন্তানের মা হতে চলেছে। ছেলেকে মানুষ করার জন্য সেলাইয়ের কাজ শুরু করল শ্রাবণী। পেটের দায়ে মানুষ বড় বেশী নির্লজ্জ হয় হয়ত তাই ভাইদের কাছেও হাত পাততে পিছুপা হয়নি সে কিন্তু তারা সব মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

পাঁচ বছর হল শ্রাবণী এই ওল্ড এজ হোমে আছে। ছেলে বৌমা রেখে গেছে। আগে মাঝেমধ্যে নাতিনটাকে নিয়ে আসত কিন্তু তাও প্রায় চার বছর বন্ধ। বেশ মানিয়ে নিয়েছে এখানকার সবার সাথে। কত বিচিত্র মানুষের জীবন-এখানে না এলে হয়ত অজানাই রয়ে যেত তার। তবুও মাঝেমাঝে মন কেঁদে ওঠে বাড়ির জন্য। সারাজীবন সংসারের প্রতি তার মায়া। কোমরের ব্যথাটা বাড়াবাড়ি আজকাল। প্রায় দিন শুয়েই কাটায়।

কালকেই একজন নতুন আবাসিক এসেছে। তিনি নাকি খুব অসুস্থ! দেখা করতে যেতে চেয়েও আর নীচে নামেনি।

সকালে বাগানে হাঁটার জন্য নীচে নেমেছে এমন সময় "দিদি কেমন আছেন?" এই গলার আওয়াজ ভীষণ চেনা তার, মুখ ঘোরাতেই চমকে উঠল। সামনে সাদা শাড়ি পরিহিতা একজন বৃদ্ধা দাঁড়িযে। মূহুর্তেই মনে পড়ে যায় তিরিশ বছর আগের সেবন্তিকাকে।

※※※※※

বড়ি

অতসী বাগচী

আজ মনীষা সকাল থেকেই খুব ব্যস্ত। ব্যস্ত হবেই না কেন আজ একটা বিশেষ দিন। এই দিনেই তো ওর নিজের একটা নতুন পরিচয় হয়েছিল। যে পরিচয়ের জন্য গর্ববোধ করে। সমস্ত মেয়েরাই এই পরিচয়টা পাওয়ার জন্য মনে মনে স্বপ্ন দেখে। '২রা জানুয়ারী', এই দিনেই তো মনীষারও সেই স্বপ্নটা পূরণ হয়েছিল।

কৈ-গো চা দেবে না – দাও

একটু বসো, হাতটা জোড়া আছে, দিচ্ছি –

দেবপ্রিয় মনীষার স্বামী।

চা-টা খেয়েইতো বাজারে বের হতে হবে। আরও অনেক কিছু কেনার আছে। দাও তাড়াতাড়ি।

ও বৌদি কি মশলা দেবে দাও দেখি মিক্সিতে এক্কেবারে ঘষে দিই।

দাঁড়াও লক্ষীর মা, তোমার দাদাবাবু কে আগে চা-টা করে দিই তারপরে। ততক্ষণে তুমি ঐ বাসনগুলো ধুয়ে দাও তো। আজ লাগবে।

মনীষা চা নিয়ে দেবপ্রিয়কে জানিয়ে দেয় আর বলে, চা-টা খেয়ে ছেলেটাকে ডাকো, অনেক বেলা হলো, কখন ঘুম থেকে উঠবে? আজ আমার কত কাজ। আর শোনো, তুমি ওই আলমারী থেকে বিছানার চাদরগুলো বের করে বিছানাতে একটু পেতে দিও। আমার সময় আর হবে না। বেলা অনেক হলো। একে ছোট দিনের বেলা। আর বলি, তোমার উপরেও আমার খুব রাগ হয় বাপু। কবে থেকে বাজারের জিনিসগুলো আনতে বলেছি তুমি ভুলেই যাচ্ছো। একটা আনছো তো আর একটা ভুলছো। আমাকে রান্নাগুলো সারতে হবেতো?

এমন সময় রিজু ঘুম থেকে উঠে এসেই, মা - ওমা - রিজু দেবপ্রিয় আর মনীষার একমাত্র সন্তান। যাকে বলে নয়নের মনি। ঘুম থেকে উঠেই মা-মা করার অভ্যাসটা ছোট থেকেই। কোথাও যাবার আগে, মা কোন জামাটা পড়বো। সেটাও বলে দিতে হয় মনীষাকে। এত বড় হয়ে গেল ছেলেটা তবুও সারাক্ষণ মা-আর মা–। মা ছাড়া কিছুই যেন বোঝে না। কেবল রিজু কেন? দেবপ্রিয় ও কম যায়না এ ব্যাপারে।

দেবপ্রিয় ব্যাংকে চাকরি করে। বাড়ি ফিরেই কলিং বেলটা চাপতে দেরি, শুরু হয়ে গেলো মনা আজ এটা হয়েছে অফিসে ওটা হয়েছে। গোপালবাবুকে না আজ খুব চটিয়ে দিয়েছি ইত্যাদি ইত্যাদি।

মনীষাকে দেবপ্রিয় মনা বলে ডাকে।

মনীষা মাঝে মাঝে বিরক্তি হয়ে বলে – ছেলেটা সবসময় মা-মা করেই চলেছে। ঠিক

তার বাবাও বাড়িতে এলেই মনা আর মনা। সারাক্ষণ বাবা আর ছেলেতে ম্যা-ম্যা করে যায় ছাগলের বাচ্চার মতো।

মনীষা মুখে বিরক্তির কথা বল্লেও মনে মনে বেশ জানে এই দুটো ডাকে তার যে কতো মধুর অনুভূতি হয় সেটা একমাত্র সে নিজেই জানে। একদিকে স্বামীর অফুরন্ত ভালোবাসা অন্যদিকে নতুন করে বাঁচার রসদ খুঁজে পায়।

রিজু রান্না ঘরে গিয়ে পেছন থেকে মাকে জড়িয়ে ধরে বলে – ওমা – ওমা আজ মেনু কি?

মনীষা বলে – যাই হোক না কেন তোমার মটর পনির থাকছে বাবা। ওটা বাদ যাবে না। ও হ্যাঁ তুই তো তোর বন্ধুদের ঠিকমতো বলেছিস তো আসার জন্য।

হ্যাঁ-হ্যাঁ প্রতিবছর ওরা আসে। ওরা ঠিক সময় মতো চলে আসবে। ও নিয়ে তুমি ভেবো না। ও-মা ওমা শোনো না বলছি কি আমার বন্ধুদের সন্ধ্যে বেলা আসতে বলেছি। ওরা সন্ধ্যের টিফিনটা করে রাতের ডিনার খেয়ে বাড়ি যাবে। তাই বলেছিলাম তুমি যদি সন্ধ্যের জলখাবার কিছু বানিয়ে দাও।

ঠিক আছে বাবা ঠিক আছে। সব হবে। তুই এখন যা – তো এই রান্নাঘর থেকে। আমার রাজ্যের কাজ বাকি পরে আছে। ও লক্ষ্মীর মা হাত চালাও না-গো। ঠিক সময় মতো ছেলেটাকে খেতে দিতে হবে তো। অবেলায় ছেলেটার মুখের সামনে পায়েস দেব।

আজ রিজুর জন্মদিন। রিজু সতেরো পেরিয়ে আঠারোতে পড়ল।

(২)

রাতের খাবার খেয়ে রিজুর বন্ধুরা চলে যায়। সারাদিন খুব খাটুনি ছিল মনীষার। এক হাতে সমস্ত রান্না করা আবার সবাইকে খেতে দেওয়া, সবটাই সে হাসি মুখে করেছে।

আজ খুব ঠান্ডা পড়েছে সেই সাথে জোড়ে জোড়ে বাতাসও বইছে। মনীষা আর দেবপ্রিয়ও রাতে অল্প করে খেয়ে বাকি খাবারগুলো ফ্রিজে তুলে রাখে। রিজুর ঘরে রিজু ঘুমোতে চলে যায়। মনীষা আর দেবপ্রিয় শুয়ে পড়ে।

শুয়ে শুয়ে দেবপ্রিয় বলে বুঝলে মনা আজকের রান্না গুলো করেছিলে বটে। দা-রু-ন হয়েছে। টিভিতে কোন চ্যানেলে যেন রান্না করা দেখায়, তুমি কিন্তু যেতে পারো।

মনীষা বলে ধুর, ছাড়ো তো ওসব কথা। আমি তোমাদের জন্য ভালবেসে রান্না করি। এই শোনো না রিজুটা কত বড় হয়ে গেল তাই না। দেখতে দেখতে আঠারো বছরের পড়ে গেল। মনে হচ্ছে এই তো সেদিনকে কথা।

দেবপ্রিয় বলে – ও.টি. থেকে ওকে বাইরে নিয়ে এসে আমাদের সামনে রাখা দোলনাটায় শুইয়ে দিলো যখন, ওর গায়ে জড়ানো কাপড়টাকে হাত দিয়ে ধরে মুখে দেওয়ার কি চেষ্টা

করছিল। যেন কত খিদে পেয়েছে। আর ওই আয়নাটা তো বলেই দিল শাহরুখ খান হয়েছে গো তোমাদের ছেলে। সত্যি রিজুটা দেখার মতো হয়েছিল। এখন কেমন যেন হয়ে গেছে। খায় না কিছুই। রোগা প্যাকাঠি একটা। মনা তুমি চুপ করে আছো যে, –

না-গো-না আমি শুনছি। প্রতিবার এই দিনেই তো আমরা একি গল্প করি। আর প্রতিবার যেন নতুন করে নতুন মনে হয়। আমার শুনতে খুব ভাল লাগে। আর এই দিনেই তো প্রথম ধরা পড়েছিল তোমার হার্টের অসুখ আছে। আমার সিজার হয়, এমন কি আই.সি.ইউ.-তে আমায় ঢুকতে হয়েছিল। এক একটা যুদ্ধ করে ফিরে এসেছিলাম।

মনা তুমি আবার ওই কথাগুলো তুলছো বাদ দাও না। তোমার কিছু হবে না।

মনীষা বলে – এটাওতো একটা সত্যি বলো। তোমার শুনতে ভালো না লাগলেও সত্যি। ঠিক আছে, ওসব কথা এখন বাদ দাও, ঘুমাও অনেক রাত হয়েছে।

খানিক বাদেই মনীষা আর শুয়ে থাকতে পারছিল না। বুকে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল। পাশে শুয়ে দেবপ্রিয় অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ডাকতে ইচ্ছে করছেনা না। না কিছুতেই ব্যাথা কমছে না। ব্যথা বেড়েই চলেছে। আরও বাড়ছে। কথা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। বুকের বাম দিকটা ভেঙে যাচ্ছে। ভীষণ ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আর নয়। মনীষা দেবপ্রিয়কে ধাক্কা দিতে থাকে। কথা বলার ক্ষমতা নেই। দেবপ্রিয়র ঘুম ভেঙে যায়।

কি হয়েছে, কি হয়েছে মনা। জল খাবে? শরীর খারাপ করছে। মনীষা কিছুই বলতে পারে না, দু'টো চোখ দিয়ে কেবল জল গড়িয়ে পড়ছে আর ইশারায় কি যেন বলার চেষ্টা করছে।

দেবপ্রিয় ঘরের লাইট কটা জ্বালায় দেখে ওই প্রচন্ড শীতের মধ্যেও মনীষা ঘেমে স্নান করছে। বড় বড় করে তাকিয়ে মুখ দিয়ে শ্বাস নেবার চেষ্টা করছে। মনীষার এরকম অবস্থায় এর আগে সে কোনও দিনও দেখেনি। ভয় পেয়ে যায়। পাশের ঘরে গিয়ে রিজুকে ডাকে। রিজু ও রিজু ওঠ তাড়াতাড়ি। দেখ তোর মা কেমন যেন করছে।

রিজু বাবার ডাকে এক লাফে বিছানা থেকে নেমে দৌড়ে আসে মার কাছে। মার অবস্থা দেখে সে ও খুব ভয় পেয়ে যায়। মশারি খুলে দিয়ে ঘরের পাখাটা চালিয়ে দেয়। মার বুক পিঠে নাড়তে থাকে। কিছুতে কিছুই হয় না।

অবশেষে এম্বুলেন্স ডাকা হয় আরও কিছুক্ষণ বাদে এম্বুলেন্স আসে। মনীষা কে নিয়ে দেবপ্রিয় আর রিজু হাসপাতালে যায়। ডাক্তার ওদের বাইরে দাঁড়াতে বলে। মনীষা কে নিয়ে এমার্জেন্সি রুমে ঢুকে পড়ে। বাইরে বাবা ছেলে টেনসনে পায়চারি করতে থাকে। দশ মিনিট বাদে ডাক্তার বাইরে আসে দৌড়ে যায় বাবা ও ছেলে। তাদের চোখে মুখে একটাই প্রশ্ন; কেমন আছে? ডাক্তার একটাই উত্তর দেন – সি এইজ নো মোর।

কি? এ হতে পারেনা – দেবপ্রিয় বলে।

রিজু চিৎকার করে বলে না – ডাক্তার বলেন সবশেষ করে নিয়ে এসেছেন কিছুই করার ছিল না। আপনারা ভেতরে জান।

বাবা-ছেলে ভেতরে গিয়ে মনীষার বুকের উপর পড়ে কাঁদতে থাকে।

মনা তুমি কথা দিয়ে রাখলে না। তুমি বলেছিলে, আমায় ছেড়ে আগে যাবে না। তুমিই চলে গেলে –। রিজুতো কেবল মা–মা করে কেঁদেই চলেছে।

(৩)

সকাল হয়ে গেছে মনীষা দেখে একি এতক্ষণ ধরে সে ঘুমোচ্ছে। এত যে বেলা হয়ে গেলো। ঘড়িটা কোথায়? চারদিকে তাকায়, একি আমি এখানে কেন? কখন এলাম এখানে। রিজু আর রিজুর বাবা কোথায়? ওরা আমাকে না দেখতে পেয়ে একজন মা–মা করছে আর একজন তো মনা – মনা করে সারা বাড়িটা মাথায় তুলে তুলেছে এতক্ষণে। এই ডাক গুলোই তো বাঁচিয়ে রেখেছে আমায়। কিন্তু ওরা কোথায়?

মনীষার আত্মা বাড়ির সামনে আসে। একি বাড়ির সামনে এতো ভিড় কেন? কি হয়েছে? বাড়ির ভেতরে বড়দি কাঁদছে আরো অনেকে আছে। কি হয়েছে রিজু আর রিজুর বাবা কোথায় গেলো, ওরা কৈ? ওদের কিছু হয়নিতো?

বাবা, কাকু ফোন করছিল হাসপাতাল থেকে বডি আনতে আর কত দেরী আছে, জিজ্ঞাসা করছিলো।

এতো রিজুর গলা –। ঐতো রিজু।

দেবপ্রিয় বলে – বলে দে, আর আধঘন্টার মধ্যে বডি চলে আসবে। হ্যাঁ, লক্ষীর মা বডিটা এই বারান্দায় রাখা হবে। তুমি তুলসী গাছের টবটা ছাদ থেকে নামিয়ে আনো।

বডি! কে বডি! কাকে ওরা বডি বলছে? কেন বলছে? মনীষার মনে ঝড় ওঠে। মনে পড়ে যায় কাল রাতের ঘটনা –। আমি মৃত। তাই আমি বডি। ওরে রিজু তোর বাবার কাছে আর তোর কাছে আমি এখন কেবল বডি। আর কেউ নইরে। একবার মা বলতে পারছিস না। মা ডাকটা শোনার জন্যই তো ছুটে এলাম রে। ওরে একবার মা বলনা বাবা। আমি যে, তোর মা রে মা –।

মনীষা দেবপ্রিয়র কাছে গিয়ে বলে – আমি তোমার মনা – গো মনা। দেখো আমি ফিরে এসেছি। তোমার মনা। তোমার ভালোবাসা। একবার শুধু একবার মনা বলে ডাকো না গো –

ঠিক আছে, আমি চলেই যাবো। আমি যখন শুধুই তোমাদের কাছে বডি, আমি চলে যাবো। আর কোনও দিন ফিরে আসবোনা। আর কোনও দিনও না – আর কোনও দিন না। আমিতো বডি –

গিরগিটি

চন্দন দাশগুপ্ত

অফিস ছুটির পর বাড়ি ফিরছিলাম। পাড়ার মোড়ে এসে আটকে গেলাম। বিরাট মিছিল যাচ্ছে রাস্তা জুড়ে। আজপা (আমজনতার পার্টি)-র হলুদ পতাকার স্রোত চলেছে। মহুর্মুহ শ্লোগান উঠছে "দলত্যাগী গদ্দার .... দূর হঠো" .... "জবাফুলে ভোট দিন"। হঠাৎ একটা জবাফুল আঁকা হলুদ জামা পরা যুবক আমার কাছে ছিটকে এলো। আরে, এ তো আমাদের পাড়ার ছেলে ফটিক!

– কিরে, তুই আজকাল আজপা করছিস নাকি? আমি বললাম।
– দাদা, একটু সাইডে আসেন।

আমাকে হাত ধরে পাশের গলিটায় টেনে আনলো ফটিক। ফিসফিস করে বলল, ... বলেছে তো ভোটে জিতলে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেবে। তবে....

– তবে কি? আমি অবাক।
– আমিও রেডি আছি দাদা। এই দেখুন। স্পেশাল অর্ডার দিয়ে বানিয়েছি।

গায়ের জবাফুলের আঁকা হলুদ জামাটার উল্টো পিঠটা তুলে দেখালো ফটিক।
চমকে গেলাম।
জামাটার উল্টো দিকটা হাল্কা গোলাপি। তার ওপর বিরাট একটা লাল গোলাপের ছবি।

– ইলেকশনে আজপা হারলে এই জামাটাই উল্টে পরে নেব।
একথা বলে ফটিক আবার দৌড়ে মিছিলে ঢুকে যায়।

আমার মনে পড়ে, এবারের নির্বাচনে 'আজপা'র প্রধান প্রতিপক্ষ হল 'মভাপা' (মহাভারত পার্টি), যাদের পতাকা গোলাপি আর প্রতীক গোলাপফুল।

✠✠✠✠✠